আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস এর কবিতায় "যুহদিয়াত": একটি বিশ্লেষণ

(Asceticism in the poetry of Abu'l - Atahiya & Abu Nuwas: an Analysis)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক

মুহাম্মদ সিরাজুল মাওলা

এম.ফিল গবেষক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস এর কবিতায় "যুহদিয়াত": একটি বিশ্লেষণ

(Asceticism in the poetry of Abu'l - Atahiya & Abu Nuwas: an Analysis)

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মুহাম্মদ সিরাজুল মাওলা

এম.ফিল গবেষক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ-এর অধীনে এম.ফিল গবেষক মুহাম্মদ সিরাজুল মাওলা (রেজি: নং-১২২, শিক্ষাবর্ষ ২০১৬-১৭) কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস এর কবিতায় "যুহদিয়াত": একটি বিশ্লেষণ (**Asceticism in the poetry of Abu'l-Atahiya & Abu Nuwas: an Analysis**)"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধীনে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

(অধ্যাপক ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস এর কবিতায় "যুহদিয়াত": একটি বিশ্লেষণ** (Asceticism in the poetry of Abu'l-Atahiya & Abu Nuwas: an Analysis)**"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমি এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

গবেষক

(মুহাম্মদ সিরাজুল মাওলা)
রেজি: নং ১২২
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭
যোগদান: ২৩/০৮/২০১৭ খ্রি.
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত বিবরণী

সংকেত	বিবরণ
অনু	অনুবাদ
খ্রি.	খ্রিস্টীয় সন
হি.	হিজরি সন
আ.	আলাইহিস্ সালাম
র.	রাহ্মাতুল্লাহি ‘আলায়হি
রা.	রাদিয়াল্লাহু আন্হু
স.	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মৃ.	মৃত/মৃত্যু
জ.	জন্ম
ইং	ইংরেজি
পৃ.	পৃষ্ঠা
খ.	খণ্ড
সং	সংস্করণ
খ্রি. পূ.	খ্রিস্টপূর্ব
তা. বি.	তারিখ বিহীন
ড.	ডক্টর
দ্র.	দ্রষ্টব্য
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সম্পা.	সম্পাদনা/সম্পাদক
বাং	বাংলা
Adi	Adition
Ed.	Edited by
OP. Cit.	Oper Citao
P.	Page
Trs.	Translation
Vol.	Volume
Pub.	Publisher

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা

বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বহুল প্রচলিত আরবী শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বাংলা বানান রীতিতে লেখা হয়েছে।

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
أ	আ, া	ص	স.
إ	ই, ি	ض	দ.
أ	উ, ু	ط	ত.
أو	ঊ, ূ	ظ	জ.
إى	ঈ, ী	ع	‘–
ب	ব	غ	ঘ
ت	ত	ف	ফ
ث	ছ.	ق	ক.
ج	জ	ك	ক
ح	হ.	ل	ল
خ	খ	م	ম
د	দ	ن	ন
ذ	য.	و	ওয়া/ও/ত
ر	র	ه	হ
ز	য	ى	য়/ইয়া/ী
س	স.	ٶ	আ
ش	শ		

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তিদূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর প্রিয় সাহাবীদের প্রতি।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামীর প্রতি, যিনি ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস, উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মূল্যবান অভিমত ও পরামর্শ এটিকে মানসম্পন্ন করে তুলেছে। যিনি এ অভিসন্দর্ভটি ধৈর্য্যের সাথে দেখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবদুল কাদির ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ এবং অধ্যাপক ড. আবু বকর সিদ্দীক-এর প্রতি; যাঁরা গবেষণার কাজে আমাকে সার্বিকভাবে পরামর্শ, সহযোগিতা ও অনুপ্রাণিত করে আমার কাজটিকে সহজতর করে দিয়েছেন। এছাড়া আরবী বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাঁদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পরামর্শের কারণে আমি এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের সুযোগ পয়েছি।

আমি গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে বহু লাইব্রেরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা পেয়েছি। এসবের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি-লাইব্রেরি ও পাবলিক লাইব্রেরি উল্লেখযোগ্য। এসকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে সহযোগিতা করেছেন হেতু তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ ছাড়াও যারা থিসিসটি কম্পোজ, বাইন্ডিং ও অন্যান্য কাজে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

পাঠশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সকলের সহযোগিতাকে কবুল করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম বিনিময় ও কল্যাণ দান করেন। (আমিন)

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা
		প্রত্যয়ন পত্র	**I**
		ঘোষণা পত্র	**II**
		সংকেত বিবরণী	**III**
		প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা	**IV**
		কৃতজ্ঞতা স্বীকার	**V**
ভূমিকা	:		**১-৩**
প্রথম অধ্যায়	:	**আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা**	**৩-৩০**
		• রাজনৈতিক অবস্থা	**৪**
		• সামাজিক অবস্থা	**৯**
		• ধর্মীয় অবস্থা	**১৪**
		• শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	**১৬**
		• বাগদাদ, কুফা ও বসরার অবস্থা	**২৬**
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	**কবি আবুল আতাহিয়া-এর জীবনধারা**	**৩১-৬২**
		• জন্ম ও বংশ পরিচয়	**৩১**
		• শিক্ষাজীবন	**৩৩**
		• কর্ম জীবন	**৩৪**
		• কারাবরণ	**৩৮**
		• সূফিবাদ অবলম্বন	**৪২**
		• কবির মৃত্যু	**৪৪**
		• স্বভাব-চরিত্র	**৪৫**
		• ধর্মদর্শন	**৪৮**
		• যিন্দিকতার অভিযোগ	**৫০**
		• আবুল ‘আতাহিয়ার রচনাবলী	**৫৩**
		• কবিতার বিষয়বস্তু	**৫৪**
		• কবিতার বৈশিষ্ট্য	**৫৮**
তৃতীয় অধ্যায়	:	**কবি আবু নুয়াসের জীবন পরিক্রমা**	**৬৩-৮৬**
		• জন্ম ও শৈশবকাল	**৬৩**
		• শিক্ষা জীবন	**৬৪**
		• কর্মজীবন	**৬৭**

Dhaka University Institutional Repository

- ধর্ম বিশ্বাস ৬৯
- কারাবরণ ৭২
- কবিতার বিষয়বস্তু ৭৩
- দীওয়ান ৮২
- গুণাবলী ও চরিত্র ৮৩
- আবু নুয়াসের মৃত্যু ৮৪
- আব্বাসী যুগের কবিগণের মধ্যে তাঁর অবস্থান ৮৪

চতুর্থ অধ্যায় : যুহদ কবিতার পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৮৭-১২৬

- যুহদ-এর সংজ্ঞা ও পরিচয় ৮৭
- আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে যুহদ ৯১
- যুহদ কবিতার প্রেক্ষাপট ও উৎপত্তি ৯৫
- প্রাক-ইসলামী যুগে যুহদ কবিতা ৯৭
- ইসলামী যুগে যুহদ কবিতা ১০৩
- উমাইয়া যুগে যুহদ কবিতা ১১৬
- আব্বাসী যুগে যুহদ কবিতা ১১৯

পঞ্চম অধ্যায় : আবুল আতাহিয়া বিরচিত যুহদিয়াত কবিতা ১২৭-১৫২

- আবুল আতাহিয়ার যুহদিয়াত রচনার প্রেক্ষাপট ১২৭
- আবুল আতাহিয়ার একগুচ্ছ যুহদিয়াত কবিতা ১২৯
- আল্লাহর একত্ববাদ ১২৯
- আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ১৩০
- সবর ও সহনশীলতা ১৩১
- তাকওয়া অবলম্বন ১৩২
- ইবলিসের প্রবঞ্চনা ১৩৪
- কানা'আত বা অল্পে তুষ্টি ১৩৪
- দুনিয়ার প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন ১৩৬
- দুনিয়া-প্রীতি ১৩৬
- নশ্বর পৃথিবী ১৩৮
- পার্থিব জীবন ১৩৯
- পৃথিবী ধ্বংসশীল ১৪০
- পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ১৪১
- নির্জনতা অবলম্বন ১৪২
- পরকাল ১৪৩
- আখেরাতের প্রস্তুতি ১৪৪
- মৃত্যু সম্পর্কিত কবিতা ১৪৪
- মৃত্যু নিকটবর্তী ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

- কবর সম্পর্কিত কবিতা **১৪৭**
- তাওবা **১৪৮**
- পুনরুত্থান ও হাশর-নশর **১৫০**
- নিজেকে সতর্ক করা **১৫০**
- কৃপ্রবৃত্তির অনুসরণকারীর প্রতি উপদেশ **১৫১**
- আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা **১৫১**

ষষ্ঠ অধ্যায় : আবু নুয়াস বিরচিত যুহদিয়াত কবিতা ১৫৩-১৭০

কবি আবু নুয়াসের যুহদ কবিতার প্রেক্ষাপট **১৫৩**
অতীত অনুশোচনা **১৫৪**
তাওবা **১৫৫**
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা **১৫৭**
আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া **১৫৮**
পৃথিবী পরীক্ষাগার **১৫৮**
দুনিয়ার জীবন **১৫৯**
দুনিয়া অন্বেষণকারীদের প্রতি উপদেশ **১৬১**
আত্মসমালোচনা **১৬২**
তাওয়াক্কুল **১৬২**
মৃত্যু **১৬৪**
কবর **১৬৬**
কিয়ামত **১৬৬**
বিচার দিবসের হিসাব **১৬৭**
মুনাজাত **১৬৮**
ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রত্যাশা **১৬৯**

সপ্তম অধ্যায় : কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতার তুলনামূলক আলোচনা ১৭১-১৯০

আবুল আতাহিয়ার যুহদ কবিতার বিষয়বস্তু **১৭১**
আবুল আতাহিয়ার যুহদ কবিতার বৈশিষ্ট্য **১৭২**
সমকালীন যুহদ কবিদের মাঝে আবুল আতাহিয়ার স্থান নিরূপণ **১৭৪**
আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতার বিষয়বস্তু **১৭৬**
কবি আবু নুয়াসের কবিতার বৈশিষ্ট্য **১৭৭**
সমকালীন কবিদের মাঝে আবু নুয়াসের স্থান **১৭৮**
আবু আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের কবিতার সাদৃশ্য **১৭৯**
কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের যুহদ কবিতার বিষয়বস্তুর ধারা **১৮০**

: উপসংহার ১৯১-১৯২

: গ্রন্থপঞ্জি ১৯৩-২০৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আরবী সাহিত্যের পণ্ডিত ও গবেষকগণ সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই বিশাল সাহিত্যাঙ্গনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে সবিস্তার আলোকপাত করেছেন। বিশেষতঃ এর কাব্য সাহিত্য এবং কবিগণকে উপজীব্য করে বিভিন্নভাবে (various dimensions) আলোচনা-সমালোচনা ও গবেষণা করেছেন এবং নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। ইসলামের আবির্ভাব থেকে হিজরী তৃতীয় শতক অবধি আরবী কাব্য সাহিত্যের একটি নবতর সংযোজন হলো- 'যুহদিয়াত' বা (Asceticism)। এই সময়ে এই ভাবধারার কবিতাসমূহ গণসঙ্গীতের ন্যায় জনসাধারণের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। ফলে নিস্তেজ হয়ে পড়া অনুভূতিতে জাগরণ এবং সচেতন অন্তরে নতুন শিহরণ সঞ্চারিত হতো। ঈমানী চেতনা অধিকতর শানিত হতো আর বিভ্রান্ত ও সংশয়বাদীদের সামনে তৈরি করত এক অদৃশ্য অচলায়তন। এ যেন এক নব চেতনা বা রেনেসাঁর সূচনা। কাব্য সাহিত্যের অপরাপর শ্রেণিবিভাগের ওপর এর বিশেষ প্রাধান্য এ যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই কবিতার মর্মস্পর্শী ভাবদ্যোতনা ও এর সুর ঝংকার গণমানুষের হৃদয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন গেঁড়ে বসে এবং এ ধরণের আধ্যাত্মবাদী কবিগণের কদরও তদানীন্তন সমাজে আকাশচুম্বী ছিল।

মানবীয় গুণাবলীর সৌকর্যবৃদ্ধি, অন্তরাত্মার পরিশীলন এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে সুশোভিত করণার্থে যুহদ বা যুহদিয়াত এর ভূমিকা অপরিসীম। ফলে ইসলামে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। লোভ-লালসা, মোহ-পরশ্রীকাতরতা, পার্থিব ভোগ-বিলাস, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, চাকচিক্য প্রভৃতি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য মানবীয় মর্যাদার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে। তাই আত্মার পরিশুদ্ধি ও মানোন্নয়নের জন্য যুহদিয়াত এর বিকল্প নেই। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভেজাল ভালবাসা ও প্রেম নিবেদন এবং তাঁর অপার সন্তুষ্টি অর্জনে ধন্য হওয়া।

আল্লাহ-প্রেমে আত্মনিবেদনকারীদের মধ্যে একটি শ্রেণি শরীয়াত এবং বিবেকের সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁর বিধানসমূহ পালনপূর্বক স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আল্লাহর প্রেমসুধা পান করে। অপর শ্রেণি আত্মভোলা হয়ে বিশেষ আবহে বুঁদ হয়ে থাকে। যারা আল্লাহর মহান সত্ত্বায় লীন হয়ে যাবার জন্য পাগলপারা (মাজনুন) হয়ে পড়ে। এরা বিবেকের সীমারেখা অতিক্রম করে ফেলে। এ ধরণের কবিদের মধ্যে প্রথম সত্যিকারের যুহদিয়াতসম্পন্ন কবিরা বিবেকের সীমা লঙ্ঘন না

Dhaka University Institutional Repository

করে শরী'আতের বিধি নিষেধের মধ্যে অবস্থান পূর্বক নিজেদের কথা ও কাজে সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট থাকেন এবং দুনিয়াতে পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করেন। অপর শ্রেণি যুহদিয়াতের প্রতি ঠিকই প্রেরণা যোগান, কিন্তু নিজেদের কথা ও কাজের মিল রাখতে পারেননা। তবে যুহদিয়াত ভাবধারার সুবিশাল ঐতিহ্যবাহী কবিতা ও কবিদের নিয়ে তথা এর শৈল্পিক উন্মেষ ও বিকাশ সম্পর্কিত গবেষণাকর্ম নিতান্তই অপ্রতুল।

দেহ-মনের অপূর্ব সমন্বয়ই মানব জীবন। অশরীরি আত্মার অনুপস্থিতি যেমন দেহকে অসাড় করে দেয়, পঁচন ধরায়, তেমনি দেহ থেকে বিযুক্ত এবং নিষ্ক্রান্ত আত্মাও জাগতিক বাস্তবতায় মূল্যহীন। নির্দিষ্ট কাল বেঁচে থাকার জন্য, কর্মক্ষম ও সচল থাকার নিমিত্তে উভয়েরই পুষ্টি ও খাদ্যোপাদান অপরিহার্য। দেহের খাদ্য বাজারে বিকায়, কিন্তু মন বা আত্মার খাদ্য তার ধ্যান-জ্ঞান, বিনোদন, পরমাত্মীয়ের সাথে অদৃশ্য সেতু বন্ধনের উপর নির্ভরশীল। গান, কবিতা, নাটক-সিনেমা, রসাত্মক আলোচনা, বই-পুস্তক, হৃদয়ের তন্তুতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোনো কোনো আধ্যাত্মিক বা মহাজাগতিক চিন্তা- চেতনা মানুষকে নশ্বর জগতের মোহমায়া থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় ভোগ-বিলাসের ঊর্ধ্বে, ভাব-লেশহীন এক ভিন্ন জগতে। অনেক বিত্ত-বৈভবের মাঝেও অতৃপ্তির শূণ্যতা গ্রাস করে কোনো কোনো মানুষকে। ভোগে নয় ত্যাগেই যেন তারা পরমানন্দ উপভোগ করে। যাপিত জীবনে ভোগের প্রতি নিরাসক্তি এবং অবিনশ্বর জীবন ও জগতের প্রতি এক অপার্থিব অনুরাগই যেন শান্তির একমাত্র ঋজু পথ। দৈহিক সুখ শান্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আত্মার প্রশান্তি অর্জনই এ পথের পরম প্রাপ্তি। অতিসংক্ষিপ্ত ও অনিশ্চিত জীবনের জন্য ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর সুখ-সম্পদ এবং ধনৈশ্বর্য একেবারেই অর্থহীন। বরং এই অর্থই যেন সকল অনর্থের মূল। অবিনশ্বর আত্মার খোরাক জোগানোই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটিই আমাদের পরবর্তী আলোচনার মূল উপজীব্য। আব্বাসীয় খিলাফতকালের দু'জন বিখ্যাত দিকপাল মরমী কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস-এর কালজয়ী কবিতায় এই মহাসত্যটি কীভাবে বিধৃত হয়েছে, তার সুনিপুণ উপস্থাপনাই আমার কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা।

"আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস এর কবিতায় "যুহদিয়াত"-এ অভিসন্দর্ভটিতে কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস-এর কবিতায় যুহদিয়াত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভটি ৭ (সাত) টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়: প্রথম অধ্যায়ে কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস -এর সমকালীন শিক্ষা-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনামূলক আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়ে কবি আবুল আতাহিয়া-এর জীবন পরিক্রমা সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়, কর্মজীবন, স্বভাব-চরিত্র, ধর্মদর্শন, রচনাবলী, কবিতার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: উক্ত অধ্যায়ে কবি আবু নুয়াস-এর জীবনালেখ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে কবির জন্ম ও শৈশবকাল, শিক্ষা ও বর্ণাঢ্য কর্মজীবন, ধর্মবিশ্বাস, কবিতার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু এবং গুণাবলী, আব্বাসী কবিদের মধ্যে তাঁর অবস্থান ইত্যাদি আলোচনা স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: এতে যুহদ কবিতার সংজ্ঞা ও পরিচয়, পবিত্র আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে যুহদ, যুহদ কবিতার প্রেক্ষাপট ও উৎপত্তি, বিভিন্ন যুগ অর্থাৎ ইসলামী যুগ, উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে যুহদ কবিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: আবুল আতাহিয়া বিরচিত যুহদিয়াত কবিতা এ শিরোনাম অধ্যায়ে আবুল আতাহিয়ার যুহদিয়াত রচনার প্রেক্ষাপট এবং তাঁর যুহদিয়াত কবিতার বিষয়বস্তু উদাহরণসহ আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: আবু নুয়াস বিরচিত যুহদিয়াত কবিতা, কবির যুহদ কবিতার প্রেক্ষাপট ও যুহদ কবিতা উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতার বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য, সমকালীন কবিদের মাঝে আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের স্থান নিরূপণ, তাঁদের কবিতার সাদৃশ্য এবং উভয় কবির যুহদিয়াত কবিতার তুলনামূলক পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে। পরিশেষে, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিসহ অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

উমাইয়্যা বংশের ধ্বংস্তুপের উপর আব্বাসীয় খিলাফাতের প্রতিষ্ঠা হয়। আব্বাসীয় খিলাফাতের মাধ্যমে আরব জাতি ইসলামের ইতিহাসে এক নবতর গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে। এই বংশের ৩৭ জন খলিফা দীর্ঘ (১৩২-৬৫৬ হি./৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) ৫০৮ বছর খিলাফাতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১] আব্বাসীয় শাসন মুসলিম সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশে এক নবতর গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে। আব্বাসীয় যুগে সামাজিক স্থিতিশীলতার সুবাদে সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের পারস্পরিক মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার কারণে মুসলিম সাম্রাজ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি উন্নতরূপ পরিগ্রহ করে। খলিফা ও শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং কবি সাহিত্যিকদের ঐকান্তিক সাধনা সভ্যতা-সংস্কৃতির এই বিকাশ ধারাকে আরো ত্বরান্বিত করে। এভাবে আব্বাসী যুগে (৭৫০ খ্রি.-১২৫৮ খ্রি) বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ধারার সূচনা হয়। এ যুগে কবি আবুল আতাহিয়া (৭৪৮-৮২৬খ্রি.) ও আবু নুয়াস হাসান ইবনু হানী (১৪৫ হি:/৭৬৩ খ্রি.-১৯৯ হি:/৮১৩ খ্রি.)-এ বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, যারা স্বীয় কাব্য প্রতিভার মাধ্যমে যুগ চিত্রের সঠিক রূপকার হিসেবে আবির্ভূত হন। এই কবিদ্বয় আব্বাসীয় খিলাফতের প্রাথমিককালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আব্বাসীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগ[২] প্রত্যক্ষ করেন। নিম্নে আলোচ্য সময়ের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ তুলে ধরা হলো।

রাজনৈতিক অবস্থা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আব্বাস (রা)-এর বংশধরগণ উমাইয়্যাদের উৎখাত করার জন্য একটি রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন। জনসাধারণও আহলে বাইতদের ক্ষমতায়

---

১ শায়খ মুহাম্মাদ খুদরী বেগ, মুহাদ্বারাত তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ 'আদ্-দাওলাতুল 'আব্বাসিয়্যাহ' (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ্, তা.বি.), পৃ. ৪৮৪; মূসা আনসারী, মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.), ১ম প্রকাশ, পৃ. ১৯; ইবনে খালদুন, আল মুকাদ্দিমা (বৈরুত: দারুল কলম, লেবানন ১৯৮১খ্রি.), পৃ. ১৭০-১৭১; P.K. Hitti, History of the Arabs (London: 1951), p. 617; Masudul Hasan, History of Islam [Classical Period 571-1258 C.E] (Dehli: 1995), Vol.-1, p. 395.

২ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আব্বসীয় বংশের রাজত্বকালকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত রয়েছে, যথা- প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও পতন যুগ। ইতিহাসবিদগণ আব্বাসী খিলাফাতের প্রথম ৯ জন খলিফার যুগকে আব্বাসীয় খিলাফাতের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করেন। (দ্র. P.K. Hitti : History of the Arabs, ibid, p. 617; Masudul Hasan : History of Islam, ibid, Vol.-1, p. 395; আবুল ফিদা, কিতাবুল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার (বৈরুত: তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১৩৩; আল-খুদরী বেগ, মুহাদ্বারাত তারিখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।)

অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে উমাইয়্যাদের উৎখাতে সংঘবদ্ধ হয়। উমাইয়া শাসনের কুপ্রভাব, কারবালার ঘটনা, আরব-অনারব বৈষম্য, গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে জনমনে বীতশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। তারা এই শাসনের সমাপ্তি কামনা করে। সাধারণ জনগণ উমাইয়াদের নৈতিক অধঃপতন, ইসলাম হতে বিচ্যুতি ও বৈষম্যমূলক আচরণ হতে পরিত্রাণ পাবার আশায় এই আব্বাসীয় আন্দোলনকে স্বাগত জানায়। উমাইয়া বংশের পতনের পর আব্বাসীয়দের উত্থানের সাথে সাথে কেবল শাসক শ্রেণিরই পরিবর্তন ঘটেনি প্রশাসনেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আবুল আব্বাস (১৩২হি./৭৫০খ্রি.-১৩৬হি./৭৫৪খ্রি.)[৩] জাবের যুদ্ধে[৪] উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করে নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। কুফার মসজিদে প্রথম ভাষণে আবুল আব্বাস নিজেকে আস-সাফফাহ্ (রক্ত-পিপাসু) বলে ঘোষণা দেন। আস-সাফফাহ্ প্রথমেই উমাইয়্যাদের সমূলে ধ্বংস করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি যে মির্মম হত্যাকাণ্ড করেছেন তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। উমাইয়্যা বংশের রক্ত যাদের ধমনিতে প্রবাহমান সকলেই তাদের এই হত্যাকাণ্ডের শিকারে পরিণত হয়েছিল। আবুল আব্বাস খলীফা হওয়ার পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর নিকটাত্মীয় ও সমর্থকদের নিয়োগ করেন। এতে তাঁর প্রশাসনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। চার বছর তিন মাস রাজত্ব করার পর ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ ৩০ বছর বয়সে গুটি বসন্ত রোগে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ভ্রাতা আবু জা'ফরকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।[৫]

---

৩ তাঁর নাম 'আব্দুল্লাহ, কুনিয়াত আবুল 'আব্বাস, উপাধি আস্-সাফ্ফাহ্। তাঁকে আল-মুরতাযী আল-কাসিমও বলা হত। তাঁর বংশ পরিক্রমা হল, 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন 'আব্বাস ইবন 'আব্দিল মুত্তালিব আল-কুরাইশী আল-হাশিমী। সিরিয়ার বালক প্রদেশের আল-শিরা অঞ্চলের আল-হামীমা নামক স্থানে আস্-সাফ্ফাহ্ ১০৮ হিজরি সালে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাটে। তিনি ১৩২ হিজরি ১২ রবী'উল আওয়াল/২০ অক্টোবর ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে কূফায় খিলাফাতের বায়'আত গ্রহণ করেন। কারও কারও মতে ১৩ বরি'উস্-সানীতে তিনি বায়'আত গ্রহণ করেন। (আল-মাস'উদী, মুরূজুয্-যাহাব, ৩য় খণ্ড, (বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৬৬-২৯৩; জালাল উদ্দিন আস্-সুয়ূতী, তারিখুল খুলাফা (দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুত্ থানূভী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২০৬-২০৮; Encyclopedia Britannica, Vol-4, (London :William Benton Publisher, First Published, 1968), p. 649).

৪ উমাইয়্যা খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান সর্বশক্তি নিয়োগ করে আব্বাসীয়দের প্রতিহত করতে করতে ১,২০,০০০ সৈন্য সমেত টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করে জাব নদীর তীরে অগ্রসর হন। আব্বাসীয় বাহিনী আবুল আব্বাসের পিতৃব্য আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে সমবেত হয়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জাব নদীর তীরে কুসাফ নামক গ্রামে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মারওয়ান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং মসুল, হাররান হয়ে দামেস্কে পলায়ন করেন। সেখান হতে প্যালেস্টাইন হয়ে মিসরের দিকে পলায়ন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি ধৃত এবং নিহত হন। তাঁর মস্তক কুফায় আবুল আব্বাসের নিকট প্রেরণ করা হয়। খলীফা মারওয়ানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উমাইয়া বংশ বিলুপ্ত হয় এবং আব্বাসীয়গণ খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। (দ্র. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, আরব জাতির ইতিহাস (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯ খ্রি.), ৪র্থ সং, পৃ. ১৮৮-১৯০)

৫ S.M. Immamuddin, A political History of the Muslims (Dhaka: Najmah sons, 1970), Part-1, p. 101-105.

আস-সাফফাহ্‌র মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা আবু জা'ফর 'আল-মানসুর'[৬] (বিজয়ী) উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে (১৩৬হি./৭৫৪খ্রি.- ১৫৮হি./৭৭৫খ্রি.) আরোহণ করেন এবং দীর্ঘ ২২ বছর রাজত্ব করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আব্বাসীয় খেলাফতকে মজবুত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ শাসন কাঠামো তৈরি করে যেতে পারেননি। কিন্তু আল-মানসুর সিংহাসনে আরোহন করে অভ্যন্তরীন বিদ্রোহসমূহ দমন করেন, আব্বাসীয় খিলাফতের সম্ভাব্য হুমকি ও সমস্যাগুলোকে প্রতিহত করেন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য সিংহাসন নিষ্কন্টক করেন। মানসুর পারসিক প্রভাবে শংকিত হয়ে আবু মুসলিম খোরাসানীকে হত্যা করেন।[৭] আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠায় পারসিক এবং আলী বংশীয়গণের অবদান ছিল বেশি। ফলে খিলাফতে পারসিক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অধিক।[৮] আব্বাসীয় প্রথম খলিফাগণ পারসিক ও আলী বংশীয়দের প্রভাবে শংকিত ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করেন।[৯] এজন্য আব্বাসীয়গণের সাথে আলী বংশীয়গণের শত্রুতার সূত্রপাত ঘটে। এ সময় হযরত আলী (রা.)-এর প্রপৌত্র আব্দুল্লাহর দুই সন্তান মুহাম্মদ এবং ইব্রাহীম খিলাফতের দাবী করেন। মুহাম্মদ আন-নাফস-আযযাকিয়্যা বা পবিত্র আত্মা নামে তাঁর অনুসারীদের নিকট অধিক সম্মানিত ছিলেন। মদিনায় তাঁর সমর্থনে বিদ্রোহ দেখা দিল। মক্কা, সিরিয়া ও কুফায়ও তাঁর বহু সমর্থক ছিল। অপরদিকে ইব্রাহীমের সমর্থনে ফারস, আহওয়াজ, ওয়াসিত ও বসরায় বিদ্রোহ দেখা দিল। খলিফা মনসুর মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে হত্যা করে তাঁর খিলাফতকে নিষ্কণ্টক করেন। মনসুর তাঁর বংশের জন্য একটি নিরাপদ আবাসস্থল খুঁজতে থাকেন এবং পারস্য সম্রাট কিসরার গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল বাগদাদকে মনোনীত করেন। এটি দজলা বা ট্রাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। অবশেষে তিনি ৭৭৫ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[১০]

---

৬ আব্বাসীয় দ্বিতীয় খলিফা আল-মানসুর (মৃ. ১৫৮হি./৭৭৫খ্রি.) স্বীয় ভ্রাতার ইন্তিকালের পর খিলাফতে আরোহন করেন এবং ৭৬২ খ্রি. বাগদাদ নগরী পত্তন করেছিলেন। তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রশাসন সুশৃঙ্খল করেন। (দ্র. ফার্দিনান্দ তোতাল, আল-মুনজিদ ফিল আ'লাম, পৃ. ৫৪৯)

৭ আবু মুসলিম খোরাসানী আরব বংশোদ্ভূত ইস্পাহানবাসী ছিলেন। আবু মুসলিমের সহায়তার ফলে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল এবং বিপদকালে তিনিই এ শাসনকে রক্ষা করেছিলেন। কথিত আছে যে, আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ছয় লক্ষ উমাইয়ার প্রাণনাশ করেন। (দ্র. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, আরব জাতির, ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬; ইয়াকুব, আত্-তারীখুল ইয়াকুবী (বৈরুত: দারুস ছাদের, ১৯৬০খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৬৮; আল-মাসউদী, মুরুজুয্-যাহাব (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ৬, পৃ. ১৮১-৮২।)

৮ শিবলি নুমানি, আল মামুন (লাহোর : শেখ মোবারক আলি তাজের কুতুব, তা.বি), পৃ. ১৩৫; জুরজি যায়দান, তারিখুত-তামাদ্দুনিল ইসলাম, (মিসর : মুআস-সাসাতু দারিল হিলাল, ১৯৬৮), খ. ১, পৃ. ৯৪।

৯ ইবনুল আছির, আল-কামিল ফীত তারিখ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরাবি, ১৯৮৩/১৪০৩), খ.৫, পৃ. ২০২।

১০ মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, আরব জাতির, ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

খলীফা আবু জাফর আল-মানসুরের পুত্র মুহাম্মদ ৭৭৫ খ্রি: আল-মাহদী[১১] উপাধি নিয়ে বাগদাদের আব্বাসীয় সিংহাসনে (১৫৮হি./৭৭৫খ্রি.- ১৬৯হি./৭৮৫খ্রি.) আরোহণ করেন। শাসনপ্রণালীর ক্ষেত্রে আল-মাহদী ছিলেন তাঁর পিতার বিপরীত। তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তাঁর শাসনকাল আস্-সাফ্ফাহ ও মনসুরের কঠোর শাসন ও পরবর্তী খলিফাগণের সুশাসনের সেতুবন্ধন ছিল।[১২] তিনি অযথা রক্তপাত ও কঠোরতা পরিহার করে উদার ও সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও গুরুতর অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণকে মুক্তি দেন। এবং হজ্ব পালনের জন্য ৭৭৬-৭৭ খ্রি: মক্কা ও মদীনাবাসীর মাঝে ৩ কোটি দিরহাম দান করেন।[১৩] খলিফা মাহদির শাসনকাল থেকেই খলিফাপত্নীদের রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার পরিলক্ষিত হয়।[১৪] আল-মাহদী ১০ বছর শাসন করেন। এই সময় আব্বাসীয় সাম্রাজ্য সুসংহত ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। আল-মাহদী ৭৮৫ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর দুই পুত্র মুসা ও হারুনকে পর পর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।[১৫]

আল-মাহদীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুসা 'আল-হাদী' [পথ প্রদর্শক] (১৬৯হি./৭৮৫ খ্রি.- ১৭০হি./৭৮৬খ্রি.) উপাধি নিয়ে ৭৮৫ খ্রি. বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলিফা হাদীর সময়ে মদিনায় ইমাম হাসান (রা)-এর প্রপৌত্র হুসায়ন ইবন আলীর নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। উক্ত বিদ্রোহ দমন করতে হুসাইন ইবন আলীসহ বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়।[১৬] এমতাবস্থায় ইদ্রিস ইবন আবদিল্লাহ ইবন হাসান[১৭] আত্মরক্ষার্থে মৌরিতানিয়ায় গমন করেন। সেখানে তিনি বার্বারদের সহযোগিতায় আল-ইদ্রিসী রাজবংশ নামে একটি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮] আল-হাদীর স্বল্পকালীন রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ইরাক ও খোরাসানে খারিজী বিদ্রোহ ও যিন্দিকীয় বিদ্রোহ। তিনি এই বিদ্রোহ দমন

---

১১ আব্বাসীয় তৃতীয় খলিফা আল-মাহদী বাইজান্টাইনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সাধারণের চলাচলের জন্য রাজপথ নির্মাণ করেন। ডাক বিভাগকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। তাঁর সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছিল। (দ্র. ফার্দিনান্দ তোতাল, আল-মুনজিদ ফিল আ'লাম, পৃ. ৫৫২)

১২ আল-মাসউদী, মুরুজুয্-যাহাব (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ৬, পৃ. ২২৩; Sayed Ameer Ali, A Short History of the saracens (London: Mcmillan Co. Ltd. 1899), p. 225.

১৩ ইয়াকুব, আত-তারীখুল ইয়াকুবী, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫।

১৪ মাওলানা আকবর শাহ নজিবাবাদী, তারিখে ইসলাম (দিল্লি: তাজ কোম্পানি, ১৯৯২খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৭৫-৪৭৬; Amir Ali, A Short History of the saracens, ibid, p. 23; P.K. Hitti, History of the Arabs, ibid, p. 332.

১৫ সৈয়দ আমীর আলী, আরব জাতির ইতিহাস (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ১৬৮-১৬৯।

১৬ আল-মাসউদী, মুরুজুয-যাহাব, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

১৭ তাঁর পূর্ণ নাম ইদ্রিস ইবন আবদিল্লাহ ইবন হাসান ইবন আলী ইবন আবী তালিব। তিনি মরক্কোর মৌরিতানিয়ায় ইদ্রিসিয়্যা নামে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত রাজবংশ বংশ পরম্পরায় প্রায় দুইশত বৎসর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। (দ্র. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪০৭/১৯৮৭খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪০৮)

১৮ ইবনুল আছির, আল-কামিল ফিত-তারিখ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৯৮৩খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩১।

করতে সক্ষম হন। তিনি ৭৮৬ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন এবং পিতার ইচ্ছানুসারে তাঁর ভ্রাতা হারুনকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন।[১৯]

ভ্রাতা আল-হাদীর মৃত্যুর পর ৭৮৬ খ্রি: ২৫ বছর বয়সে হারুন-অর-রশীদ বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় সূচনা করে।[২০] তাঁর খিলাফতের প্রথমভাগে খারেজি সম্প্রদায়ের উপদ্রব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তিনি কঠোর হস্তে খারিজী বিদ্রোহ, হিময়ারীয় মুদারীয় দ্বন্দ্ব ও মসুলের বিদ্রোহ দমন করেন।[২১] আলীপন্থীদের প্রতিও তিনি তাঁর কঠোর অবস্থান নেন। আলী বংশীয়গণের পুনরুত্থানের আশংকায় ইয়াইয়া ইব্ন আব্দিল্লাহ ও জ্ঞানতাপস মুসা আল-কাজিমকে বন্দী করেন। তাঁরা উভয়েই কারাগরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর শাসনকার্যে ক্রমে পারসিক বার্মাকী পরিবারের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। খলীফা হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা প্রকৃত অর্থে বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। অবশেষে ৮০৯ খ্রি. তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২২]

৮১৩ খ্রি: হারুনের জ্যেষ্ঠপুত্র খলীফা আল-আমিন পরাজিত হলে কনিষ্ঠপুত্র মামুন খিলাফত লাভ করেন ও বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরবর্তী ১৪ বছর বছর মামুন (৮১৯-৩৩ খ্রি.) স্বহস্তে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। খলিফা মামুনের সময় পুনরায় পারসিক প্রভাব সুদৃঢ় হয়। খলিফা মামুন খিলাফতের প্রথম অধ্যায়ে (৮১৩-৮১৯খ্রি.) উজির ফযল ইবন সাহল-এর উপর নির্ভর করেন। উজিরের কুশাসনে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিশ্বস্ত সেনাপতি হায়সামা সাম্রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা খলিফাকে অবহিত করার মনস্থ করলে তাঁকে হত্যা করা হয়। হায়সামার হত্যার সংবাদে বাগদাদে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে অপরদিকে আল-মানুনের অত্যধিক শিয়া প্রবণতা ও ইমাম আলী রেজাকে খিলাফাতের উত্তরাধিকারী মনোনয়নকে কেন্দ্র করে (২০১হি./৮১৬খ্রি.) বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।[২৩] খলিফা মামুনের সেনাপতি তাহির কর্তৃক তাহেরিয়্যা খুরাসান, রায়, পূর্বে সিন্ধুনদ পর্যন্ত স্বাধীন রাষ্ট্র সাফাবিয়্যা প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। সাফারিয়্যাগণ সিজিস্তান, কিরমান, পারস্য খুরাসান প্রভৃতি স্বাধীন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেন।[২৪] অবশেষে এশিয়া

---

১৯ মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, আরব জাতির, ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩।

২০ ইবনুল আছির, আল-কামিল ফিত-তারিখ, খ. ৫, পৃ. ৯৮।

২১ ইবনুল আছির, আল-কামিল ফিত-তারিখ, খ. ৫, পৃ. ৯৮।

২২ মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, আরব জাতির, ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

২৩ ইব্ন কাছির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪/খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ২০৪-৭; আল-কামিল, খ. ৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

২৪ আল-কামিল, খ. ৫, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, খ. ১১, পৃ. ৩২।

মাইনরের অভিযান হতে বাগদাদে ফেরার পথে পথিমধ্যে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ৮৩৩ খ্রি. তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২৫]

মোটকথা আব্বাসী খেলাফতের প্রাথমিককালে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ। খলিফা মামুন, আল-মানসুর ও হারুনুর রশিদের যুগ ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগ। তারপর এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটতে থাকে। শুরু হয় 'আব্বাসীয় শাসনামলের অবনতি ও পতনের যুগ। পরবর্তী খলিফাগণ বিভিন্ন বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনে লিপ্ত ছিলেন। খলিফা মুতামিদের খিলাফতকালে (২৫৬/৮৬৯-২৭৯/৮৯২) খিলাফতের সর্বত্র বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সাম্রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটতে থাকে।

সামাজিক অবস্থা

মানুষ সামাজিক জীব। বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণির লোকদের সমাহারই হলো সমাজ। সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে।[২৬] কোনো সমাজের অবস্থা বর্ণনা করতে হলে সেই সমাজের বসবাসকারীদের প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। গোত্র প্রথা প্রাচীন আরবদের সমাজ-ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।[২৭] উমাইয়া রাজবংশ আরবীয় গোত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল;[২৮] কিন্তু বৈদেশিক প্রভাবে আব্বাসী যুগে সকল আরব আভিজাত্যের অবসান ঘটে। আব্বাসীয় বংশের মাঝে আস-সাফ্ফাহ, আল-মাহদি, হারুনুর রশিদ এবং আল-আমিন প্রমুখের বাহুতে আরবি শোণিতধারা প্রবহমান ছিল। অপরাপর খলিফাগণ অনারবীয় মাতৃগর্ভজাত ছিলেন। আরবদের গোত্রপ্রথাকে দূর করার জন্য আব্বাসীয় আমলে বহু বিবাহ, উপপত্নী রাখার প্রথা এবং দাস ব্যবসা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। এই যুগে আরবগণ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক মিশ্র জাতিতে পরিণত হয়েছিল। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণির লোকদের বসবাস ছিল, আরবি, পারসিক, তুর্কি, নিবর্তি, আর্মেনীয়, জার্কাস, কুর্দি, জার্জিয়ানি, বার্বার প্রভৃতি।[২৯] আব্বাসীয় শাসনামলের প্রথম দিকে পারসিক ও খোরাসানিদের প্রাধান্য ছিল বেশি। খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ্-এর মন্ত্রী ছিলেন খালিদ বারমাকি। খলিফাগণ পারসিকদের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েন; তাঁদের মধ্য থেকে উজির, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ

---

২৫ সৈয়দ আমীর আলী, আরবজাতির ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

২৬ ইবন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ্ (বৈরুত: দারুল কলম, ৪র্থ সং. ১৯৮১), খ.১, পৃ.৩৪-৩৫; Encyclopedia of Social Science, Vol-13 (New York: The Macmillan Company, 1963), P. 255.

২৭ মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, আরব জাতির, ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

২৮ জুরজী যায়দান, তারিখু আত্-তামাদ্দুনিল ইসলামি (মু'আস্সাতু দারিল হিলাল, ১৯৬৮খৃ.), খ. ১, পৃ. ৭০-৭১।

২৯ ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারিখুল ইসলাম (বৈরুত: দারুল জিল, ১৩শ সং ১৪১১ হি./১৯৯১ খৃ.), খ. ৪, পৃ. ৫৮৬।

করেন। এমন কি তারা আব্বাসীয় খেলাফাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৩০] অবশ্য খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর শামনামলে তুর্কিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।[৩১] আব্বাসীয় শাসনামলে দাস-ব্যবসা প্রচলিত ছিল। এ সময় জীবিকা অর্জনের জন্য একশ্রেণির মানুষ দাস-দাসীর ব্যবসা করত। তুর্কিস্তান, মধ্য আফ্রিকা, ইরান, স্পেন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকা থেকে দাস-দাসী আমদানী করা হতো।[৩২] তারা গায়িকা, নর্তকি ও উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তখন সুন্দরি ও সুশিক্ষিত দাসীদের মর্যাদা ছিল বেশি। আর তাই মনিবরা দাস-দাসীদেরও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতেন। নাচ-গান শিক্ষার প্রতি তাদের ঝোঁক ছিল বেশি। এ ধরনের শিক্ষিত দাসীর মর্যাদা ও মূল্য অন্য দাসীদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি ছিলো।[৩৩]

দাস-দাসীর সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, খলিফা হারুনুর রশিদের হেরেমে নর্তকী, গায়িকা ও পরিবেশনকারী দাসীর সংখ্যা ছিল ২০০০ এবং খলিফা মুতাওয়াক্কিলের হেরেমে ৪০০০ দাসীর সমাবেশ ঘটেছিল।[৩৪] খলিফা মুকতাদিরের প্রসাদে ১১,০০০ খোজা ক্রীতদাস রক্ষিত ছিল। উম্মু ওয়ালাদের (যেসব দাসীর গর্ভে মনিবের সন্তান জন্ম নিতো) মর্যাদা ছিল সাধারণ দাসীদের চেয়ে অনেক বেশি।[৩৫] তৎকালীন সমাজে অধিকহারে তুর্কি, ফার্সি এবং রোমীয় দাসীদের আগমনের ফলে পুরুষরা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি উদাসীন এবং দাসীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।[৩৬] এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ কারদ বলেন, আব্বাসীয়রা তাদের মাঝে বিদেশি রক্তের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের আরবি রক্ত নষ্ট করে দেয়। তারা নিজস্ব শ্রেণিকে পরিত্যাগ করে এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অন্যদের সাহায্য নিয়ে স্বজাতীয়দের মনোভাব নষ্ট করে ফেলে। যার ফলশ্রুতিতে অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তিরা মূলের মর্যাদা লাভ করে আর মূল প্রত্যাখ্যাত হয় এবং মহৎ সম্মানী ব্যক্তিবর্গ লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হতে থাকে।[৩৭]

---

৩০ শায়খ মুহাম্মদ খুদরি বেগ, মুহাদ্বারাতু তারিখিল উমাম আল-ইসলামিয়্যাহ্ ওয়াদ্-দাওলাতুল 'আব্বাসিয়্যাহ্ (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.), পৃ. ১১১।

৩১ তারিখুল ইসলাম, খ. ৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৬।

৩২ ড. ইনামুল হক, মধ্যপ্রাচ্য: অতীত ও বর্তমান (ঢাকা: বাংলা একাডেমি ১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ৯২।

৩৩ ড. আহমাদ আমীন, দুহা আল-ইসলাম, (কায়রো: মাকতাবাতু নাহদ্বাহ্ আল-মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪ খৃ.), খ. ১, পৃ. ৮৩।

৩৪ আল-মাসউদী, কিতাবুল তানবীহ ওয়াল আশরাফ (বৈরুত: মাকতাবাতু খাইয়্যাত, ১৯৬৫ খৃ.), খ৩, পৃ.৩০৮; দুহা আল-ইসলাম, খ.১, পৃ. ৯।

৩৫ দুহা আল-ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২।

৩৬ ড. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ, ইমাম ইবন মাজাহ হাদিস চর্চায় তার অবদান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৯হি./২০০৮ খৃ.) পৃ. ৪০; জুরজী যায়দান, তারীখু আত্-তামাদ্দুনিল ইসলামি (মু'আস্সাসাতু দারিল হিলাল, ১৯৬৮ খৃ.), খ. ৫, পৃ.৭৭, দুহা আল-ইসলাম, খ.১, পৃ. ৮১।

৩৭ আল-ইসলাম ওয়াল হাদ্বারাত আল-'আরাবিয়্যাহ (মিসর: মাতবাআতি দারিল কুতুবিল মিসরিইয়াহ, ১৩৫৮ হি./১৯৩৬ খৃ.), খ. ১, পৃ.৮।

উমাইয়া যুগের ন্যায় আব্বাসী যুগেও নারীদের উচ্চ মর্যাদা ছিল। তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। খলিফা মাহদীর স্ত্রী খাইজুরান, মাহদী-তনয়া উলাইয়্যা ও খলিফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী যুবায়দা প্রমুখ নারীগণ রাজকার্যে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সুখ্যাতি অর্জন করে।[৩৮]

খলিফাদের কেউ কেউ মহিলাদের ক্ষমতায়ন পছন্দ করতেন, আবার অনেকে পছন্দ করতেন না। এমনকি বিভিন্ন কাজে কর্মে মহিলাদের সাথে আলোচনা বা পরামর্শের ক্ষেত্রেও নিরুৎসাহ বোধ করতেন। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মনোভাব দেখা যায়। নারীরা ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। কতিপয় নারী রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন।[৩৯]

প্রথমদিকের আব্বাসীয় খলিফাগণ ধর্মপরায়ণ ও সুদক্ষ হলেও আমাদের আলোচ্য যুগের খলিফাগণ সামাজিক উৎসবে মদ্যপানের আয়োজন করত।[৪০] মদ্যপান ইসলাম বিরোধী হলেও প্রশাসনিকভাবে প্রায়শই এটাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নি। মদের প্রশংসায় বিভিন্ন কবিতা রচনা এবং 'কিতাবুল আগানী'[৪১] গ্রন্থেও 'আরব্য উপন্যাসে মাতলামির যে সব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা হতে 'আব্বাসীয় যুগে মদ্যপানের বিস্তৃতি এবং পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এ প্রথা পারস্য রাজ দরবারে উৎপন্ন হয়ে মুসলিম খলিফাদের দরবারের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে প্রসার লাভ করেছিল।[৪২] অনেকে আঙ্গুরের রস ও বাদাম প্রভৃতি হতে উৎপন্ন নাবিয পান করতো।[৪৩] ইবন খালদুন বলেছেন যে, খলিফা হারুন এবং মামুন নাবিয পান করতেন। সাময়িক আনন্দমেলা এবং গানের আসর সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। মূলত: মাতাল মেলাই এর প্রকৃত নাম। এ সমস্ত মেলায় যে সকল গায়িকা অংশগ্রহণ করতো, তাদের প্রভাবে তৎকালীন যুবকদের যে নৈতিক স্খলন দেখা দিয়েছিল–এর পরিচয় সে যুগের সাহিত্যে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। আব্বাসীয় যুগে গান, বাদ্য ও বিনোদনের আসর বসত যেখানে কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, সংগীত বিশেষজ্ঞ, ক্রীড়াবিদগণ উপস্থিত হতেন।[৪৪] নর্তকীরা

---

৩৮ P.K. Hitti, History of the Arabs, p.333.

৩৯ মফীজুল্লাহ কবীর, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৭ খ্রি.) পৃ. ১৩৩-১৩৪।

৪০ আবুল কাসিম মুহাম্মদ কারক, শাখসীয়্যাতু আদাবীয়্যাহ মিনাল মাশরিক ওয়াল মাগরিব বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৬ খৃ.), পৃ. ৭১; হাসান খামীস, আল-আদাবু ওয়ান-নুসূখ (সৌদি আরব : ১৪১০ হি./১৯৮৯খৃ.), পৃ. ১৪৩; History of the Arabs, p. 338.

৪১ আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন আরবী কাব্যের এক অনন্য সংকলন 'কিতাবুল আগানী'। এটিকে প্রাচীন আরবীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত ও ইতিহাসের একটি সুবৃহৎ কোষগ্রন্থ বলা যায়। স্বীয় বর্ণনা মতে তিনি গ্রন্থটি রচনা করতে ৫০ বছর নিরলসভাবে ব্যয় করেন। (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯খ্রি.), খ.২, পৃ. ৩০)

৪২ আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, আল-আগানী (বৈরুত: মুওয়াসসাসাহ মামলাকাহ রিসালাহ, তা.বি.), খ. ১১, পৃ. ৯৩০; History of the Arabs, p.337.

৪৩ ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৪৪ তারিখুল ইসলাম, খ ৩, পৃ. ৪৩৮; জালাল উদ্দিন আস-সুয়ুতি, তারিখুল খুলাফা (দেওবন্দ : মাকতাবাতুত থানবি, ১৯৯৬ খৃ.), খ. ৩, পৃ. ৪৩৯।

নাচ এবং গায়িকারা গান পরিবেশন করে সভাকে প্রাণবন্ত করে রাখতো। খলিফা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসী জীবন কাটাত। তখনকার সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উদযাপিত হতো। অভিজাত শ্রেণির বিয়েতে প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে জাঁকজমকপূর্ণ করা হতো।[৪৫]

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস প্রতিটি মুসলমানের মুখে প্রতিধ্বনিত হয়। সম্ভবত হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের পূর্বে আরব দেশে সাধারণের জন্য কোন গোসলখানা ছিল না। কিন্তু আব্বাসীয় শাসনামলে গোসল করা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, শুধু প্রয়োজনবোধেই নয়, বরং আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন পরিভ্রমণকারী ও লেখকের বর্ণনা মতে, এক বাগদাদ নগরীতেই অসংখ্য স্নানাগার বিদ্যমান ছিল।[৪৬]

আব্বাসীয় যুগে খেলাধুলার প্রচলন ছিল। ঘরোয়া খেলার মধ্যে, দাবা এবং পাশাই প্রধান ছিল। তাছাড়া ধনুকবিদ্যা, অসি চালনা, বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড় এবং সর্বোপরি শিকার-যাত্রা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তখন শিকার করা ছিল খলিফা ও শাহজাদাগণের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। পারসিকদের অনুকরণে পোষাপাখি ও কুকুরের সাহায্যে বন্যপাখি শিকার আরবদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। শিকারযাত্রা আব্বাসীয় আমলে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৪৭]

আব্বাসীয় আমলে সমাজের গঠন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন খলিফা, তাঁর পরিবারবর্গ, রাজকর্মচারী, হাশেমী বংশের লোক এবং সর্বনিম্নে ছিলেন দাস-দাসী। ভৃত্যগণ সাধারণত অমুসলিম সম্প্রদায় হতে এবং যুদ্ধের সময় বন্দীদের মধ্য থেকে সংগৃহীত হত।[৪৮] সব জাতির জীবনযাত্রার মান বিবেচনায় জনগণকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমত: খাসসা (خاصة) বা বিশেষ শ্রেণি বা অভিজাত শ্রেণি। এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন খলিফার পরিবার, আত্মীয় স্বজন, উযির, সেনাপতি ও রাজকীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। খলিফার সাথে সাক্ষাতের জন্য বাবুল খাসসা নামে বিশেষ ফটক ছিল; যে ফটক দিয়ে তারা খলিফার সাথে সাক্ষাত করত।[৪৯] দ্বিতীয়ত, 'আম্মা (عامة) বা সাধারণ শ্রেণি। সাধারণ শ্রেণির জনসাধারণ আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, উচ্চ শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণি। উচ্চ শ্রেণির লোকেরা অভিজাত শ্রেণির কাছাকাছি স্থান দখল করত। যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আলিম, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, সেনাবাহিনী ও দাস-দাসী প্রভৃতি। আর জাতির বৃহত্তর

---

৪৫ তারিখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.৭, পৃ. ১৪৯।

৪৬ তারিখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩২।

৪৭ মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, আরব জাতির, ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

৪৮ মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, আরব জাতির, ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

৪৯ তারিখুল ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৬।

অংশ ছিল নিম্ন শ্রেণির লোক। এদের মধ্যে ছিল কৃষক, পশুপালক, গেঁয়ো মানুষ ও দাস-দাসী। তারা নিম্নমানের জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। তবে সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল তাদের সাথে সদাচরণ করা হতো। এই যুগে সর্বশ্রেণির অমুসলিম পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত।[৫০] আলিমগণ সাধারণত দু'শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথমত এ শ্রেণির আলিম রাষ্ট্রীয় কার্যের বিভিন্ন দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। যেমন, বিচারক ও খতিব ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, যে সকল আলিমগণ শাহি দরবার থেকে দূরে অবস্থান করতেন।

বিশেষ শ্রেণির লোক জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। খলিফা ও অভিজাত শ্রেণির লোকেরা মণিমুক্তা খচিত পোশাকাদি[৫১] মোজা, টুপি, শার্ট, ফতুয়া ইত্যাদি পরিধান করত। সুফি সাধক ও দরবেশগণ পশম ও মোটা কাপড়ের পোশাক পরিধান করত। এছাড়া তারা ঢিলেঢালা পায়জামা, কামিজ, দিতরাআহ সিতরাহ বা ছোট আঁট সাঁট জামা, কুফতান বা লম্বা হাতাযুক্ত ঢিলা জুব্বা, চোগা, গাউন, কোবা ও টুপি ইত্যাদি, আর সাধারণ শ্রেণিরা সাধারণ পোশাক তথা লুঙ্গি, কামিস, দিরাআহ লম্বা সিতরাহ, বেল্ট, জুতা ও মোজা পরিধান করত।[৫২] আব্বাসীয় সমাজে পুরুষদের বিশেষ পোশাক হিসেবে মাথায় পাগড়ি ব্যবহার হতো। কালো রং আব্বাসীয়দের সরকারী প্রতীক ছিল।

নারীদের পোশাক ছিল ঢিলেঢালা বোরকা, কামিস ও তার উপর শীতকালে ছোট আঁটসাঁট চাদর পরত। আর ঘরের বাইরে বের হলে লম্বা চাদর পরত যা তাদের দেহ সম্পূর্ণ আবৃত করত। পৃথক ছোট আকৃতির কাপড় দিয়ে নারীরা মাথা ঢেকে দিয়ে ঘাড়ের উপর বাঁধত।[৫৩]

বিশেষ বা অভিজাত শ্রেণির নারীরা স্বর্ণের চেইন, মুক্তা দ্বারা সজ্জিত ও সুন্দর পাখির পালক জড়ানো বুরুনুস নামক টুপি মাথায় পরত। অধিক বর্ষা কবলিত অঞ্চলের লোকজন মোম প্রলেপবিশিষ্ট কাপড়ের কোট ব্যবহার করত। জাতীয় খাবারের তালিকায় ছিলো গোশত, রুটি, পনির, সিরকা আবার এগুলো ভুনা, ভাজী ইত্যাদি। বিশেষ শ্রেণির খাবার ছিল মুরগি, কারণ এর মূল্য ছিল বেশি, মুরগির মাংস বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করা হতো। তাছাড়া পাখির মাংস, মাছ, চিনি, মধু, ফল-ফলাদি ও উপাদেয় খাদ্য। আর সাধারণ শ্রেণিরা শুকনো রুটি, লবণসহ সাধারণ খাবার।[৫৪]

খলিফাদের রাজপ্রাসাদ ছিল বিস্তৃত, প্রাসাদের ওপরে ছিল গম্বুজ। সামনে ছিল ফুলের বাগান। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে প্রাসাদের পাশ দিয়ে তৈরি করা হতো পুকুর ও লেক। খলিফা মুস্তাঈনের

---

৫০ আহমদ আমিন, যুহরুল ইসলাম, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪; ; তারিখুল ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৬।

৫১ History of the Arabs, p. 334.

৫২ তারিখুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯; আল-মাসউদি, মুরুজুয যাহাব, বৈরুত: দারুস সদর, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯।

৫৩ তারিখুল ইসলাম, খ. ৪, পৃ. ৬০০।

৫৪ তারিখুল ইসলাম, খ. ২, পৃ.৩৪৭।

পিতার খাস কামরায় একটি ফরাস/ বিছানা ছিল দিনার দ্বারা কারুকার্যমণ্ডিত। তাতে সোনা দ্বারা তৈরি পশুর ছবি ছিলো। আর তার চোখ জহরত দ্বারা তৈরি ছিলো।[৫৫]

ধর্মীয় অবস্থা

তৎকালীন সময়ে শিক্ষার চর্চা, হাদিস থেকে রসদ সংগ্রহ, কামিল ব্যক্তিবর্গের বিদ্যমান থাকা, অনেক দ্বীনদার মুসলিম শাসকের বর্তমান থাকা, ইসলামি আক্বীদা, কর্ম ও বহু শাখা এবং পারিবারিক বিধিবিধান শরীয়াতের উপর থাকা, মাদ্‌রাসা ও মসজিদসমূহ আবাদ থাকা, সাধারণ জনগণ ইসলাম প্রিয় হওয়া, জনগণ ওলামা-মাশায়িখদের সম্মানদানকারী ও অনুসারী হওয়া, দ্বীনের আরকান ও ফরজসমূহ প্রতিপালন সত্ত্বেও স্থবিরতা ও অধঃগতি লক্ষ্য করা যায়। নেতৃস্থানীয় ও ধনিক শ্রেণি ইসলামের মূলনীতিসমূহ ছেড়ে ক্ষমতা ও সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন ছিল এবং বিলাসিতা ও ভোগ-সম্ভোগে বিভোর ছিল।

শিয়া, রাফেদি, খারেজি, বাতেনি, মু'তাযিলা ও জাহমিয়াহ সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের দ্বন্দ্ব ছিল তখন একেবারে তুঙ্গে। বিশেষ করে আব্বাসি খিলাফাতে মুতাজিলা ও শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক লোক উচ্চপদস্থ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তারা তাদের এই প্রভাবকেও নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। বিশেষ করে এসময় ইসলামি আকিদাহ সংক্রান্ত বিষয়গুলো যেমন, কুরআন আল্লাহর কালাম না কি আল্লাহর সৃষ্টি (خلق القرآن) , আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সত্ত্বা ও সিফাত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদই ছিল যেন মুসলিমদের নিত্যদিনের প্রধান কাজ এবং সাধারণ জনগণ এর ফলে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছিল দারুণভাবে।[৫৬] জ্যোতিষী, ভেলকীবাজ ও গণকদের দৌরাত্ম্যও এসময় খুব ব্যাপৃতি লাভ করে।[৫৭] সভা-সমাবেশ ও ধর্মীয় আসরে অলীক ও কল্পিত বিষয়াদির প্রাবল্য, খাঁটি তাওহিদের সীমালংঘন, ইসলাম আকিদা বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম প্রভৃতি সে সময়ে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।[৫৮]

আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ শিয়া, সুন্নি ও বিভিন্ন ধর্মীয় দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার ফলে ইসলামী সমাজ বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এ বিরোধ শুধুমাত্র শিয়া, সুন্নিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা এবং এর ফলে পরবর্তীতে সুন্নিদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।[৫৯] এছাড়াও

---

৫৫ তারীখু আত-তামাদ্দুনিল ইসলামি, খ. ২, পৃ. ১৮৭-১৮৯।

৫৬ ইবনে কাছীর, আল বিদাইয়াহ ওয়া আন্ নিহাইয়াহ, (দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ , বৈরুত প্রথম সংস্করণ ১৪০৫ হি.), খ. ১৩, পৃ. ১৫৯।

৫৭ জামাল বিন মুহাম্মাদ আস্‌সাইয়েদ, ইবনু কাইয়্যেম আল্ জাওযিয়াহ ওয়া জুহুদুহু ফী খিদমাতিস্ সুন্নাহ , খণ্ড ১, পৃ. ৪৩-৫৭।

৫৮ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভি, তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত (লক্ষ্ণৌ) : মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, ২০০০ইং) খ. ৫, পৃ. ৩৮-৩৯।

৫৯ ইবনুল আসীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

বিভিন্ন দল অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা ছিল তেরটি, খারেজি সম্প্রদায়ের প্রায় বিশটি, মুরজিয়া সম্প্রদায়ের সাতটি আর শিয়া সম্প্রদায়ের ত্রিশটি। এছাড়াও ইসলামি সালতানাতে ছিল যথারীতি অসংখ্য ফিরকা উপ-ফিরকায় বিভক্ত। এসব ফিরকাবাজির সমান্তরালে ছিলো সংশয়বাদী দল। তারা বিভিন্ন মাযহাব এবং পরস্পর বিরোধী মতামত ও যুক্তি প্রমাণ দেখে বিভিন্ন দল সম্পর্কে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো এবং যুক্তি-তর্কের প্রতিই আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলো। তারা শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলো যে, যুক্তি-তর্ক ঈমানের সোপান হতে পারে না। কেননা যুক্তি দিয়ে যা প্রমাণ করা যায়, যুক্তি দিয়েই তা খণ্ডন করা যায়।

আব্বাসীয় যুগের আরেকটি ফিতনা হলো শুউবিয়া আন্দোলনের বিকাশ।[৬০] এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যার সূচনা আব্বাসীয় পূর্ববর্তী সময়ে ঘটলেও এটি মহীরূহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে আব্বাসীয় যুগে। পারসিক বংশোদ্ভূত একদল ধূর্ত বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতাকে শুউবিয়া আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়।[৬১] ইসলামের সাম্যবাদী চেতনাকে পুঁজি করে এটির সূচনা হলেও বাস্তবে একটি বর্ণবাদী ও ইসলাম বিরোধী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। কেননা শুউবীয়গণ এক পর্যায়ে আরবদের হেয় প্রতিপন্ন করার পাশাপাশি তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এমনকি তাদের ধর্ম ইসলামকেও হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পায়।[৬২] শুউবীয়দের মধ্যে মূলত দু'টো শ্রেণি লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণির যারা আরব ও ইসলামকে ভিন্ন করে ক্ষেত্রবিশেষে কেবল আরবদেরকেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে; এ ক্ষেত্রে তারা ইসলামকে সযত্নে রক্ষা করেছে। সাম্যবাদী এই গোষ্ঠী নিয়ে কারো কোনো বিতর্ক নেই। আরেক শ্রেণির যারা আরব ও ইসলামকে ভিন্ন করে দেখতে রাজি নয়; এবং তারা আরবদের মর্যাদায় বিশ্বাস করে না। শেষোক্ত শ্রেণির লোকেরা আরব-বিদ্বেষ লালন করত এবং তারা আরব-বিদ্বেষকে ইসলাম-বিদ্বেষে রূপান্তর করেছিল।[৬৩] আমাদের আলোচ্য যুগে শুউবীয় আন্দোলন শক্তিশালী সংগঠনের পরিচিতি পায়। এ সময় শুউবীয় আন্দোলনের কর্ণধাররা স্থুল আক্রমনের পরিবর্তে তারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সাহিত্যিক পথ ধরে আধিপত্য বিস্তার করে। তবে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে

---

৬০ ড. ইউসুফ খালিফ, তারীখুশ শি'র ফিল 'আসরিল আব্বাসী (কায়রো: দারুস সাকাফাহ, ১৯৮১খ্রি.), পৃ. ১৮।

৬১ ইবন মানযুর শুউবীয়দের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "আরবদের অবস্থান ও মর্যাদাকে যারা হেয় প্রতিপন্ন করে এবং অনারবদের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না তাদেরকে শুউবীয় বলা হয়। (ইবন মানযুর, লিসানুল আরব (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৩খ্রি.), সংশোধিত সংস্করণ, খ. ৫, পৃ. ১২১।

৬২ ড. ইউসুফ খালিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২৩।

৬৩ ড. আহমাদ আমীন, দুহাল ইসলাম, অনু. মাও. আবু তাহের মেসবাহ (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১৯৯৪খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৩।

ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে শুউবিয়া আন্দোলনের বেশকিছু ইতিবাচক ভূমিকাও লক্ষ্য করা যায়।

মোটকথা, তৎকালীন সময়ে হাজারো পথ-মত ও ফিরকার উদ্ভব হয়েছিল এবং প্রতিটির সাথে অপরাপর ফিরকার অবিরল যুদ্ধ চলছিলো। যুগটি মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের মধ্যাহ্নকাল। জ্ঞানে-প্রাচুর্যে, দৃষ্টি প্রসারতায় এ যুগ আলোক উদ্ভাসিত। পরবর্তীতে ধর্মীয় ফিতনা ও অনৈক্যের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও উত্থানের সাথে সাথে মুসলিম ঐক্যের ক্রমেই পতন ঘটেছে।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

আব্বাসী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং জ্ঞানানুশীলনে বিশ্বসভ্যতায় নবযুগের সূচনা হয়।[৬৪] এজন্য ঐতিহাসিগণ এ যুগকে 'স্বর্ণযুগ' (Golden Age of Muslim Civilization) বলে অভিহিত করেছেন। আব্বাসীয় খলিফাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আব্বাসীয়দের রাজধানী বাগদাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূতিকাগারে পরিণত হয়। এ সময় কুফা, বসরা, কায়রো, কর্ডোভা, টলেডো, সিসিলি শহর সমূহে গড়ে ওঠে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রাচ্যে শিরাজ, মারগা, ইস্পাহান, গজনি, মার্ভ, নিশাপুর, বুখারা, রায়, সমরকন্দসহ অনেক শহর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের ফলে গ্রীক, পারস্য, ল্যাটিন, ইরানী, সিরীয় ও ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অনুবাদের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করে আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধির দিকে আরো এগিয়ে দেয়। [৬৫] এ যুগে সংকলন ও গ্রন্থ রচনার ধুম পড়ে যায়। ফলে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়। খলিফাদের নির্দেশে গ্রিক, পারসিক ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাদি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়।[৬৬] যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধশালী হয়। খলিফা আল-মানসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাখার অনেক গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করা হয়।[৬৭]

---

৬৪ William Muir, The Caliphate (London : Oxford University Press), 1891), p. 431; ইব্রাহীম খাঁ, আরবজাতির ইতিকথা (ঢাকা : বুক ভিলা, ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ৯১; কে.আলী : মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

৬৫ সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংরক্ষণে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে জনৈক ঐতিহাসিক বলেন- "The researches of Aristotle, Galen and Ptolemy would have been lost from the world, if the Muslims had not kept them preserved by translation." (দ্র. Prof. Rafique Uddin Ahmad, Islamic History and Culture"(Dacca: 1964), p. 186).

৬৬ আনওয়ার আর-রিফা'ঈ, আল-ইসলাম ফী হাদারাতিহি ওয়া নুযুমিহি (বৈরূত : দারুল ফিকরি মা'আসির, ৩য় সং, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৫৩০-৫৩১; Francesco Gabrieli : The Arabs (America : Green Wood Press, 1963), p. 107.

৬৭ S.M Imamuddin, A Political History of Muslim, Vol. II (Dacca : Nazmah & Sons, 1963), p. 119; R.L. Gulick, Muhammad the Educater (Institute of Islamic Culture, Lahore, 1961), p. 45-114.

খলিফা হারুন-উর-রশীদ ও আল-মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গ্রিক, পাহলভি, ল্যাটিন, সংস্কৃত ও নাবাতিয়ান প্রভৃতি ভাষায় লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অনুদিত হয়।[৬৮] খলিফা আল-মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল-হিকমাহ' (বিজ্ঞান ভবন) জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সার্বজনীন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।[৬৯] ঐতিহাসিকগণ মামুনের রাজত্বকালকে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগাস্টন যুগ বলে অভিহিত করেন।[৭০] আব্বাসীয় যুগে নিযামিয়া, আযামিয়্যা এবং আল-মুস্ত ানসিরিয়া মাদ্‌রাসা 'দারুল উলূম' নামে খ্যাত ছিল। রাজধানী শহর ছাড়াও অন্যান্য শহরে দারগাহ বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে আব্বাসী খলিফাদের অবদান নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

'ইলমুত-তাফসীর: 'আব্বাসীয় খিলাফাতকাল তাফসীর চর্চার স্বর্ণযুগ। এ সময় মুসলিম সমাজে বাতিল চিন্তাধারা ও নানা মতবাদের উদ্ভব হয়। বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের প্রবল প্রবণতা দেখা দেয়। এ সমস্ত বাতিল চিন্তাধারার প্রভাব থেকে 'ইলমুত্-তাফসীর'কে মুক্ত করণের লক্ষ্যে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদের মাধ্যমে তাফসীর চর্চার অনুসৃত ধারা অনুযায়ী আলেমগণ তাফসীর চর্চায় অবদান রেখেছেন। আব্বাসী আমলে বিখ্যাত অনেক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়– আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইসহাক আন্-নায়সাপুরী কর্তৃক তাফসীরুন নাসায়ী।[৭১] মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী (মৃ. হি. ৩১০/৯২২খ্রি.) তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থ 'জামিউল বায়ান 'আন তা'বীলে 'আইল কুর'আন (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) অনবদ্য রচনা।[৭২]

---

৬৮ ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখুল ইসলাম, খ.৩, পৃ. ২৮৩; Reuber Levy, The Social Structure of Islam (Cambridge: Cambridge University Press, 1962), pp. 145; Francesco Gabrieli, The Arabs (America Greenwood Press, 1963), p. 107.

৬৯ উচ্চতর মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা গবেষণাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য 'বাইতুল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুবাদ কেন্দ্র ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্র ও পাঠাগার হিসেবে কাজ করত। এর সঙ্গে একটি মানমন্দিরও ছিল। বায়তুল হিকমাহ মধ্য ও আধুনিক বিশ্বের প্রথম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব দাবী করতে পেরেছিল। কারণ এটি বলোনিয়া, প্যারিস, ফ্রান্স, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজের অনেক পূর্বে আলোক বিতরণ করেছিল। (দ্র. মুসা আনসারী, মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ২৬৩); ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান : বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা (ঢাকা : ই.ফা.বা, ১ম সং. ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.) পৃ. ২; Sayyid Fayyaz Mahmud, A Short History of Islam (Pakistan : Oxford University Press, 1960), p. 144-45.

৭০ রোমান সম্রাট অগাস্টনের রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব ৩০-১৪) রোমান সাম্রাজ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। তেমনি খলীফা আল-মামুনের খিলাফাতকালে 'আরব সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল বলে ইতিহাসে 'অগাস্টন' যুগ বলে অভিহিত করা হয়। (দ্র. ড. এ.কে.এম.আব্দুল লতিফ : ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান, পৃ. ৫১)।

৭১ দুই খণ্ডে রচিত এই তাফসীর গ্রন্থে ৭৬৬টি বর্ণনা স্থান পেয়েছে। মূল তাফসীরে ৭৩৫টি আর বাকিগুলো পরিশিষ্ট। মূল তাফসীরে ৯টি সূরা ব্যতীত সকল সূরার তাফসীরী রেওয়ায়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবি'ঈদের তাফসীর সনদসহ উল্লেখ করা হয়েছে। রিওয়ায়াত মূল তাফসীর গ্রন্থ হওয়ায় এ গ্রন্থের গুরুত্ব 'উলামায়ে কেরামের কাছে অনেক বেশি। (দ্র. তাফসীর নাসাঈ (বৈরুত : মু'আস্‌সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৫৮-১৫৯; ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

৭২ মুহাম্মদ ইব্‌ন জারির আত-তাবারী সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত কঠোর পরিশ্রম করে এ তাফসীর গ্রন্থটি সংকলন করেন। মুসলিম জগতে হাদীসের ভিত্তিতে যত প্রামাণ্য তাফসীর রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে এটি মর্যাদাগত ও মানগত দিক দিয়ে

ইলমুল হাদিস: আব্বাসীয় খিলাফাতকালকে হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। মুহাদ্দিসগণ হাদিস অনুসন্ধানে মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে, প্রতিটি শহরে ও গ্রামে পৌঁছে বিক্ষিপ্ত হাদিস সমূহকে একত্রিত করেন। তাঁরা পূর্ণ সনদ সম্পন্ন হাদিস সমূহ স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেন এবং সনদের বিশুদ্ধতার ওপর পূর্ণমাত্রায় গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় হাদিসের সত্যতা যাচাই, বস্তুনিষ্ঠতা, সনদের বলিষ্ঠতা যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্তে হাদিসের মূলনীতির উদ্ভব হয় এবং 'আসমাউর রিজাল' রচিত হয়। এ বিষয়ে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম হচ্ছে, ইব্ন আবী হাতীম (মৃ. ৯৩৯ খ্রি.) রচিত 'কিতাব আল-জরহ ওয়া আল-তাদীল', যা ছয় খণ্ডে রচিত; আবুল কাসেম সুলাইমান তাবারানীর (মৃ. ৯৭১ খ্রি.) 'মুজাম'; আবূ নাসর আহমদ আল কালাবাদীর (মৃ. ৩৯৮/১০০৮খ্রি.) 'হুফ্ফাজ' ইত্যাদি। প্রখ্যাত সিহাহ্ সিত্তাহও এসময় সংকলিত হয়। এ সময় একদিকে যেমন হাদিস সংগ্রহ, সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও হাদিস সম্পর্কিত জরুরী জ্ঞানের অপূর্ব উদ্ভব হয়, অপর দিকে মুসলিম জনগণের মধ্যে হাদিস শিক্ষা ও চর্চার অদম্য উৎসাহ এবং বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

এ যুগে হাদিস সংগ্রহের কাজ শেষ হয় এবং সহিহ, গায়রে সহিহসহ সকল হাদিস সনদসহ চিহ্নিত করে দেয়া হয়। আসমাউর রিজাল শাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে। হাদিসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের নীতিমালা ও নির্ধারণ করা হয়। 'উলুমুল হাদিসকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। 'ইলমুল হাদিসের উপর ন্যূনতম মৌলিক কোন গ্রন্থ রচনা করার প্রয়োজনীয়তাও লোপ পায়। কেননা তখন হাদিস সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়।

ইলমুল ফিকহ: আব্বাসীয় যুগে ইলমুল ফিকহের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইতোপূর্বে ইলমুল ফিকহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা রূপ ছিল না। এ যুগে কুরআন ও হাদিসকে ভিত্তি করে ফিকহশাস্ত্র গ্রন্থাকারে রচনা শুরু হয়। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চলে ফাতাওয়া কেন্দ্র গড়ে উঠে।[৭৩] তন্মধ্যে সাতটি কেন্দ্র প্রসিদ্ধ ছিল। যথা– মদিনা, মক্কা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর এবং বাগদাদ। ইরাকে ইমাম আবু হানিফা (৮০-১৫০হি.)-এর মাধ্যমে হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সময়ে হানাফী মাযহাব সারাবিশ্বে ব্যাপক বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ফিকহশাস্ত্র লিপিবদ্ধ গ্রন্থকারে রচিত হয়। ইমাম মালিক ইবন আনাস (৯৩হি.-১৭৯হি.)-এর

সর্বোৎকৃষ্ট তাফসীর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন, তাফসীর ইব্ন জারীর তাবারীর মত আর কোন তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি। 'আব্দুল হামিদ সিফারায়ীনীর মতে, যদি কোন ব্যক্তি শুধু তাফসীর ইব্ন জারীর অধ্যয়নের জন্য চীন সফর করে তবে এটা তার জন্য বাড়াবাড়ি কিছু হবে না। (দ্র. ড. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন, ২য় খন্ড, (বৈরুত : দারু ইহ্য়াইল 'উলুম ১৪০৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৫৪০; ই'য়াকুত আল হামাভী, মু'জামুল উদাবা, ১৮ খণ্ড, পৃ. ২৩৫-৩৭; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন : মুফাসসির পরিচিতি ও তাফসীর পর্যালোচনা (রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৭৫।

৭৩ আবু সা'ঈদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ : ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সং. ১৪১৮হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৬।

মাধ্যমে হিজাযে মালেকী মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (১৫০হি.-২০৪হি.)-এর নেতৃত্বে শাফেয়ী মাযহাবের আবির্ভাব ঘটে।[৭৪] তারপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪হি.-২৪১হি.)-এর নেতৃত্বে হাম্বলী মাযহাব প্রবর্তিত হয় এছাড়াও আরো মাযহাবপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৫]

ভাষা ও সাহিত্য: প্রাচীন যুগেই আরবি কবিতার উৎপত্তি ঘটে। জাহেলী যুগে (৪৭৫-৬২২ খ্রি.) আরবি কাব্যচর্চা তার স্বর্ণ যুগ অতিক্রম করে। ইসলামি যুগে (৬২২-৬৬১ খ্রি.) আল-কুরআন, আল-হাদিস ও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে আরবি কাব্যে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেয়। এরপরে উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে (৬৬১-১২৫৮ খ্রি.) আবার নবোদ্যমে আরবি কবিতা চর্চা হতে থাকে। আব্বাসী যুগকে আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়।[৭৬] এ যুগে আরবি ও ফার্সি সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।[৭৭] উমাইয়া যুগের ন্যায় আব্বাসী যুগেও কবিরা রাজা-বাদশাহদের সাহচর্য অবলম্বন করে কাব্য চর্চায় নিয়োজিত হতো। রাজা-বাদশাহদের সাথে উঠা-বসা, তাদের দান কবিদের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ এনে দিয়েছিল। ফলে কবিতা মরুভূমির পাথর খণ্ড ও তাদের জীবন তথা ভবঘুরে জীবন পেরিয়ে প্রাসাদ, বাগ-বাগিচা ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য বর্ণনা সম্বলিত চাকচিক্যময় জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে কবিতার রচনাশৈলী, অর্থ, বিষয়বস্তু, ভাব-গঠন ও ছন্দ সম্ভার বিস্তার লাভ করে। আরবরা সবসময়ই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। আব্বাসী যুগে সাহিত্য চর্চার উন্মুক্ত চিন্তা মননশীল পরিবেশে সাহিত্যিকরা আপন গতিতে সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। এযুগে শাসকদের সার্বিক সহায়তায় আরবী ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির শীর্ষে আরোহন করে। এ সময়ে গদ্য লেখকদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেন- আব্দুল হামিদ আল-কাতেব[৭৮], আল-জাহিয[৭৯], ইবনুল মুকাফ্ফা।[৮০]

---

৭৪ উমার রিযা কাহ্হালাহ : মু'জামুল মুআল্লিফীন, ২য় খণ্ড (বৈরূত : মু'আস্সাসাতু রিসালাহ, ১ম সং. ১৪১৪হি./১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ১১৬; ইবন হাজার আসকালানী : তাহযীবুত তাহযীব, ৯ম খণ্ড, (বৈরূত : দারুল-ফিকর, ১ম সং. ১৪১৬/১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ২৩; আহমদ হাসান আয-যাইয়াত : তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ২৮৩।

৭৫ ইব্ন আবী হাতিম : আল-জারহ্ ওয়াত্-তা'দিল, ২য় খণ্ড, (বৈরূত : দারূল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২০৯; তারীখুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩।

৭৬ আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ১৯৪; জুরজী যায়দান, তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮; হাসান যায়্যাত, তারীখ, পৃ. ২১০।

৭৭ আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৪৮-৪৯।

৭৮ আবদুল হামিদ আল-কাতিব (মৃ. ৭৫০খ্রি.) যিনি আরবী সাহিত্যে রিসালা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। উমাইয়্যা রাজপ্রসাদের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর ছয়টি রিসালাহ ছিল। প্রসিদ্ধ রিসালাটি হলো- আল-রিসালাতু ইলাল কুত্তাব। (দ্র. ফার্দিনান্দ তোতাল, আল-মুনজিদ ফিল আলাম (বৈরুত: দারুল মাশরিক, ১৯৮৮খ্রি.), ১৬তম সং, পৃ. ৪৩১)।

৭৯ আল-জাহিয আবু ওসমান (৭৭৫-৮৬৮খ্রি.) আব্বাসীয় খেলাফতের বিশিষ্ট সাহিত্যিক। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুতাযিলা ছিলেন। তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, কৌতুক ও রসিকতাপূর্ণ লেখক। স্বীয় যুগের অবস্থা, সে যুগের মানুষের জীবন প্রণালী, তাদের আচার-আচরণ, হাস্যরসিকতা ও কৌতুকের ভেতর দিয়ে চিত্রিত করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো-

এ সময়ের খ্যাতিমান কবিদের অন্যতম ছিলেন- বাশ্‌শার ইবনু বুরদ[৮১] (৯৬-১৬৮হি./৭১৪-৭৮৪খ্রি.), আবু তাম্মাম (৭৮৮-৮৪৫খ্রি.)[৮২], আল-বুহতরী[৮৩] (২০৬-২৮৪হি./৮২১-৮৯৭খ্রি.), আল-মুতানাব্বী[৮৪] (৩০৩-৩৪৫হি./৯১৫-৯৫৫খ্রি.), আবুল 'আলা মা'আররী[৮৫] (৩৬৩-৪৪৯হি./৯৭৩-১০৫৮খ্রি.) অন্যতম।

আল-হাইওয়ান, আল-বায়ান ওয়াততিবয়ান, আল-বুখালা ও আত-তাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (দ্র. ফার্দিনান্দ তোতাল, আল-মুনজিদ ফিল আলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪)।

৮০ **ইবনুল মুকাফফা' (মৃ. ৭৫৭খ্রি.):** তিনি আব্বাসীয় খলীফা সাফ্‌ফাহ ও মানসুরের চাচা ঈসা বিন আলী বিন আব্বাসের কাতিব ছিলেন। আরবী সাহিত্য জগতে তিনি ছিলেন বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক বিরল প্রতিভা। খলীফা আবু জাফর আল-মানসুর আব্দুল্লাহ বিন আলীর 'নিরাপত্তা' সম্পর্কিত চুক্তির মুসাবিদা তৈরী করে অনুমোদনের জন্য তিনি আবূ জাফর আল-মানসুরের বরাবরে পেশ করে ছিলেন। মুসাবিদার শব্দ চয়ন এমনি নিশ্ছিদ্র ছিলো যে পরবর্তীতে মানসূরের পক্ষে 'প্রতিশ্রুতি' প্রত্যাহার করার উপায় ছিল না। ইবনুল মুকাফ্‌ফার এই লেখনী চাতুর্যে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আল-মানসুর তাকে হত্যার ব্যবস্থা করেন। ১৪২ কিংবা ১৪৩ হিজরীতে তিনি নিহত হন। তার অনূদিত গ্রন্থাবলীর অন্যতম হল- ১) আল-আদাবুস্-সগীর ২) আল-আদাবুল কবীর ওয়াল ইয়াতিমা ৩) রিসালাতুস সাহাবাহ ৪) কালীলা ওয়া দিমনা ইত্যাদি। (দ্র. ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম (অনুবাদ), (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৮১-৮৫)

৮১ **বাশ্‌শার ইবনু বুরদ:** প্রসিদ্ধ কবি বাশ্‌শার উমাইয়া ও আব্বাসী উভয় যুগই পেয়েছেন। তাঁর শৈশবকাল ইরাকের বসরায় কাটে। সুন্দর পরিবেশে শৈশবেই তিনি স্বভাজাত ও স্বাধীনচেতা হয়ে হঠেন। তিনি জন্মান্ধ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভাবলে বসরার অনেক পণ্ডিতদের পাঠচক্রে যোগদান করে বিবিধ জ্ঞান শুধু শ্রবণের মাধ্যমে অকল্পনীয় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তৎকালীন কবিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তদানীন্তন কাব্য সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই তার পদচারণা রয়েছে। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীনের অনুকরণের ধারা সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করেছিলেন। (দ্র. ড. ওমর ফাররুখ, তারীখু আদাবিল আরাবী (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৬ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২-৯৪; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ (কায়রো: দারুল হিলাল, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৫৬-৬০; ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫খ্রি.), খ. ১৬ (ভাগ-১), পৃ. ১০৮।

৮২ **আবু তাম্মামের** পূর্ণনাম হাবীব ইবনু আউস আততা-ই (৭৮৮-৮৪৫খ্রি.) দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খলিফাদের প্রশংসাগাঁথা রচনা করতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল- আল-হামাসাহ, যার মধ্যে স্বীয় যুগ পর্যন্ত মূল্যবান আরবী কবিতা সংকলন করেছেন। হামাসার সাহিত্য সৌন্দর্য ও রচনাশৈলীর অভিনবত্ব আরবী সাহিত্যে অনন্য-সাহিত্য সম্পদ বলে গণ্য। তাঁর একটি দীওয়ানও রয়েছে। (দ্র. আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবী, উর্দু অনুবাদ, আবদুর রহমান তারি সুরতী (লাহোর: ১৯৬১খ্রি.), পৃ. ২১২-২১৪)

৮৩ **আল-বুহতুরী** ইরাকের মানবাজ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কবি আবু তাম্মামের ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর স্থান দখল করেন। তিনি একজন স্তুতিকার কবি ছিলেন, সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রশংসা করে অর্থ উর্পাজন করতেন। তিনি শোকগাঁথা কবিতায় পারদর্শীতা অর্জন করেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে-ওয়াছ্‌ফ, 'ইতাব, গাযাল, রিছা, ফাখর, মাদ্‌হ, হিজা ইত্যাদি। (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ১৬ (ভাগ-১), পৃ. ৪৮৮; আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫, জুরজি যায়দান, তারিখ, খ.২, পৃ. ১৬২-৬৪)

৮৪ আরবী সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী কবি মুতানাব্বী কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি প্রাচীন রীতির পরিবর্তে নব্যধারায় কবিতা রচনা করতেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল- মাদ্‌হ, রিছা', হিজা', ফখর, গাযল, হিকমাহ, ওয়াছ্‌ফ ইত্যাদি। (দ্র. মাওলানা নিজাম উদ্দিন, শারদী দীওয়ানে মুতানাব্বী (দেওবন্দ: কুতুবখানা হুসায়নিয়া, তা.বি.), পৃ. ৬-১০; ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২০, পৃ. ৩৯)

৮৫ **আবুল 'আলা আল-মা'আররী:** আব্বাসীয় যুগের দার্শনিক ও মুক্তচিন্তার অধিকারী খ্যাতিমান কবি। সাহিত্য ও দর্শনে তাঁর সমকক্ষ যে যুগে খুব বেশি ছিল না। শৈশবে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। আরবী সাহিত্যে তিনিই প্রথম কবি যিনি দর্শনের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ দীওয়ান রচনা করেন। সভ্যতা, ধর্ম ও মানবসমাজ নিয়ে কবির স্বতন্ত্র দর্শন ছিল। তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় নৈরাশ্যবাদী বা

আমাদের আলোচ্য যুগে আরব জাতিসত্তার বিরুদ্ধে শুউবীয়দের সমাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যবৃত্তির উন্নয়নে তাদের অনেক ভূমিকা রয়েছে। শুউবীয়রা তাদের স্বজাতির ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে যেমন ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল, তেমনি ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে আরবীও ভালোভাবে আত্মস্থ করেছিল। ফলে তাদের মধ্য হতেই সৃষ্টি হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক ও কবি-সাহিত্যিক। সেই সাথে পারসিক ধ্যান-ধারণা ও কলাকৌশল আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অবারিতভাবে প্রবেশ করে; যা আরবী সাহিত্যকে পরিপুষ্টি দানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।[৮৬] শুউবিয়রা আরবী সাহিত্যজগতে এমন বহু বিষয়ের আমদানি করে যার সাথে আরব-সংস্কৃতি ইতোপূর্বে পরিচিত ছিল না। শুউঅবীয় লেখকদের প্রভাবে সাহিত্যে বেদুঈন আরবের মরুপ্রীতি ও গোত্রপ্রীতির পরিবর্তে নগর জীবনের কোলাহল স্থান করে নেয়। শুউবীয় কবিগণ তাদের কবিতায় প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটায় রোদন করার বেদুঈনী নীতি পরিহার করে নগর রীতি প্রবর্তন করেন। শুউবীয় সাহিত্যিকদের অন্যতম ছিলেন- পারসিক সংস্কৃতির সন্তান ইবনুল মুকাফ্ফা' ও আবু উবায়দা মা'মার ইবনুল মুছান্না (মৃ. ২০৯হি./৮২৫খ্রি.)। শুউবীয় কবিদের অন্যতম ছিলেন- আবু নুয়াস, সারী' আল-গাওয়ানী (মৃ. ২০৮হি./৮২৩খ্রি.), সালিহ ইবন আবদুল কুদ্দুস (মৃ. ১৬৭./৭৭৭খ্রি.), বাশ্শার ইবন বুরদ (মৃ. ১৬৮ হি./৭৮৪খ্রি.), দীকুল-জিন্ন (২৩৫হি./৮৪৯খ্রি.) ও হাম্মাদ 'আজরাদ (মৃ. ১৬১হি./৭৭৮খ্রি.) প্রমুখ।[৮৭] মূলত: এসব কবিই আব্বাসীয় সাহিত্যের গতিধারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। আরবী কাব্যে বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তনে তাঁরা প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখেন।

আলোচ্য যুগে আরবি ব্যাকরণ তথা 'ইলমুন নাহু ও 'ইলমুস-সারফের বিকাশ সাধিত হয়। বসরা, কুফা ও বাগদাদসহ ইসলামী বিশ্বের বিভিন্নস্থানে আরবী ব্যাকরণ 'ইলমুন নাহু ও সারফ চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠে।[৮৮]

পেসিমিস্ট (Passimist)। কবির বিপুল রচনাসম্ভার রয়েছে। কবিতার পাশাপাশি গদ্য রচনার সংখ্যাও অনেক। তাঁর গ্রন্থগুলোর উল্লেখ্যযোগ্য- আল-লুযুমিয়্যাত, সিক্তুয যান্দ, যিক্‌রা হাবীব, আল-ফুসুল ওয়াল গায়াত, আবসুল ওয়ালীদ ইত্যাদি। এছাড়া আল-লুযুমিয়্যার মত তাঁর অপর দুটি গ্রন্থ 'রিসালাতুল মালা'ইকা' ও 'রিসালাতুল গুফরান' তাঁর ব্যতিক্রমি সৃষ্টি। (দ্র. The Encyclopedia of Islam, Vol. V. (Leiden, E.J. Brill, 1986), p. 927; আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী (বৈরুত: দার আল-সাক্বাফা, তা.বি.), পৃ. ৩৪৭; হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, খ. ১, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৮১-৮৮২)

৮৬ ড. আলী মুহাম্মদ হাসান ও যাকী আলী সুওয়ায়লাম, আল-আবদু ওয়া তারীখুহু ফিল-'আসরায়ন: আল-উমাভী ওয়াল-আব্বাসী (কায়রো: জমহুরিয়্যাতু মিসর আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৯০খ্রি.), পৃ. ৫৪।

৮৭ শাওকী দ্বায়ফ, আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফিন্ নাছরিল আরাবী (মিসর: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৩৫।

৮৮ জুরযী যায়দান : তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯।

চিকিৎসা বিজ্ঞান: আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। মুসলমানগণ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রীক পুস্তকসমূহ আরবীতে অনুবাদ করে এর ওপর গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে চিকিৎসা শাস্ত্রে নব নব দিগন্ত উন্মোচন করে। আব্বাসী খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়।[৮৯] আব্বাসী খিলাফতের প্রথম দিকের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদদের অন্যতম হলেন- জার্জিস ইবন জিব্রাইল যিনি 'কানাশাতু আল-মাশহুর' নামক চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খলীফা হারুন আল রশীদ, আমীন ও মামুনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক জিবরীল ইবন বাখতিশু (মৃ. ৮২৮ খ্রি.) চিকিৎসা বিষয়ে তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। তন্মধ্যে 'রিসালাহ ফী আল-মাতআম ওয়া আল-মাশরাব', ও 'রিসালাতুন মুখতাসিরাতুন ফী আল-তিব্বি' উল্লেখযোগ্য। তাঁর ছেলে বখতিশু ইবন জিব্রাইলও (মৃ. ৮৬৯ খ্রি.) খলিফা মাহদী ও মুতাওয়াক্কিলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর রচিত চিকিৎসা গ্রন্থের নাম 'কিতাব ফী আল-জেমায়া'। ইয়াহইয়া আল-রাযী (মৃ. ৩২০/৯২৩) বাগদাদ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি খলিফা মুতাওয়াক্কিলের গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি গ্রিক, পারসিক এবং ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হুনায়ন ইবন ইসহাকের শিষ্য ছিলেন। তাঁর অমূল্য রচনাবলীর মধ্যে 'কিতাবুল হাভী'[৯০], 'কিতাবুল তিব আল-মানসূরী'[৯১] উল্লেখ্যযোগ্য। আবূ ইসহাক ইবন হুনাইনকে (মৃ. ২৯৯ হি.) খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনার অনুরোধ করলে তিনি এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। উক্ত গ্রন্থে খাদ্য, পুষ্টি, বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও রোগের ঔষধসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৯২] খলিফাগণ চিকিৎসাক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করতেন। এছাড়াও গ্রিক ভাষায় রচিত চিকিৎসা পদ্ধতির কিতাবসমূহ আরবী ভাষায় অনুবাদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ইবনু নাদীম বলেন, চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ হয়েছিল। তার

---

৮৯ আল-মুনতাখাব, পৃ. ১৫৬-৫৭।

৯০ এটি ৩০ খণ্ডে রচিত বিশাল গ্রন্থ। চিকিসকগণের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ। ইবনুন নাদীম এ গ্রন্থের ১২টি অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করেন। এ গ্রন্থের একটি হস্তলিপি ব্রিটিশ যাদুঘরে, অন্য কপিগুলো মূনীখ, অক্সফোর্ড ও ইসকুলিয়াল গ্রন্থাগারে মওজুদ রয়েছে। ফারাগুত এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এটা দু'বার মুদ্রিত হয়। একাধিক ব্যক্তি এটিকে সংক্ষিপ্ত করেন।

(দ্র. জুরজী যায়দান : তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৭; ড. রশীদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৬শ সং. ২০০৯খ্রি.) পৃ. ৩০৫-৬)।

৯১ এ গ্রন্থের কপি প্যারিসের আল-মাকতাবাতুল আহলিয়্যাহ, অক্সফোর্ড, ইসকুলিয়াল লাইব্রেরিতে মওজুদ আছে। আল-কারীসূনী এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পরে মুদ্রিত হয়।

(দ্র. জুরজী যায়দান : তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৭; ড. রশীদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৬শ সং. ২০০৯খ্রি.) পৃ. ৩০৫-৬)।

৯২ আল-মাস'উদী : মরুজুয্-যাহাব, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল-'আসাবিয়্যাহ, ১ম সং. ১৪২৫হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৬৭।

মধ্যে গ্রিক ভাষায় রচিত আরবি ভাষায় অনুবাদ হয়নি এমন গ্রন্থ হল- 'কিতাবুল আওদিয়াতিল মুফরাদাতি 'আলাল-হুরুফি', 'কিতাবু তারীখুল আতিব্বা'।[৯৩] চিকিৎসক হিসেবে ইবন সীনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রিঃ) বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত "আল কানুন" গ্রন্থটিকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল বলা হতো। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার গ্রন্থখানা ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন হলে আজও আল রাজি ও ইবনে সিনার প্রতিমূর্তি বিদ্যমান আছে।[৯৪]

দর্শন শাস্ত্র: আব্বাসীয় যুগে আরবগণ দর্শন ও অধিবিদ্যা চর্চা করতেন।[৯৫] খলিফা মামুন নিজেও দর্শনে একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। যুক্তির মাধ্যমে সত্যে ও তত্ত্বে উপনীত হওয়ার পন্থাকেই দর্শন বলা হয়। ইসলামের দর্শনের মূল ভিত্তি কুর'আন ও হাদীস হলেও পরবর্তীতে পারস্য ও গ্রিক চিন্তাধারায় প্রাচ্যের প্রভাব মুসলমানদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৯৬] আল কিন্দি (৮১৩-৮৭৩খ্রি.) ও আল ফারাবি (৮৭০-৯৫০খ্রি.) এ শাস্ত্রের দিকপাল ছিলেন। আল কিন্দী মুসলিম দর্শণের সঙ্গে গ্রিক দর্শনের সামঞ্জস্য বিধান করেন। তিনি একাধারে রসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ ও চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ২৬৫ টি গ্রন্থের রচয়িতা।[৯৭] এ সময়ে যাঁরা শুধুমাত্র দর্শনের আলোচনা করতেন তাঁদেরকে 'ফাইলসুফ' বা দার্শনিক বলা হতো। কিন্তু যারা দর্শনের সাথে ধর্মের সংযোজন করেন তাদেরকে মুতাকাল্লিমিন (তার্কিক) বলা হতো।[৯৮] আবুল হুযায়ল হামদান (মৃ. ২৩৫ হি.) আবুল আলী মুহাম্মদ আল-জুব্বাই (২৩৫হি.-৩০৩হি.) প্রমুখ মুতাযিলা পণ্ডিতগণ গ্রিক দর্শনকে মুসলমানদের দার্শনিক চিন্তার সাথে সংযোজন করেন। ফলে 'ইলমুল কালাম' নামে এক নতুন ধরনের বিজ্ঞান জন্ম লাভ করে।[৯৯]

গণিতশাস্ত্র : গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অতুলনীয়। মুসলমানরাই সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় গণিতের প্রতি। এ বিদ্যা তাদেরকে জীবনের বহু সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, রাজস্ব ও কর আদায়, উত্তরাধিকার বন্টন, ক্ষতিপূরণের হিসাব

---

৯৩ ইবনু নাদীম : আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ৪১৫; তারীখুল ইসলাম, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪০৫-৪০৬।

৯৪ G.E. Von Grunebaum : Classical Islam A History, Katherine watson, trans. (London : George Allen and Uncien Ltd) p. 134; Ignaze Goldzihers : A short History of Arabic Literature (Hyderabad : The Islamic Culture Board, 1958, p. 78.

৯৫ W. Montgomery Watt : Islamic Philosophy and Theology, P. 41; History of the Arabs, P- 370.

৯৬ Sayeed Abdul Hai : Muslim Philosophy (Dhaka : Islamic Foundation of Bangladesh, 1982), p. 192; A short History of Islam, pp. 124-125.

৯৭ ড. রশীদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৬শ সং. ২০০৯খ্রি.) পৃ. ৩১০; Dr. M. Ahmed : An Introduction to Islamic culture and Philosophy, Part-II, (Dacca : Mullick Brothers, 1963), pp. 50-53; C.F. Manzoor Ahmad Hanifi : Short History of The Arabic LLiterature, (Lahore : SH. Muhammad Ashraf, 1964), pp. 71-72;

৯৮ History of the Arabs, ibid, p. 370.

৯৯ Sayed Amir Ali, The Spirit of Islam, p. 531-532.

ইত্যাদি। বীজ গণিতের উদ্ভাবনকারী আল-খাওয়ারিজমী (৭৮০-৮৪৭খ্রি.) রচিত 'হিসাবুল জাবর ওয়াল মুকাবালা' গ্রন্থটি বীজ গণিতের উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সারাবিশ্বে স্বীকৃত। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই ইউরোপসহ সারাবিশ্বে Algebra (বীজগণিত)-এর পাঠ প্রবর্তিত হয় এবং এ বিদ্যা এ্যালজেব্রা[১০০] নামে পরিচিতি লাভ করে। আল-কিন্দি মুহাম্মদ ইবন্ ঈসা আল-মাহানী। সাবিত ইব্ন কুররাহ আল-হাররানী (মৃ. ২৮৮ হি.)। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা হচ্ছে 'কিতাব হিসাব আল-আহিল্লাহ', 'কিতাব ফী ইসতেখরাজ আল-মাসায়িল আল-হিনদিসিয়্যাহ', 'কিতাব আল-আদাদ' ও 'কিতাব শিকল আল-কাতা'। এছাড়া আবুল ওয়াফা মুহম্মদ ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আব্বাস নিশাপুরী (মৃ. ৩২৮ হি.)-এ শাস্ত্রে অপরিসীম অবদান রেখেছিলেন।[১০১]

ইতিহাসশাস্ত্র: ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আব্বাসী যুগ নবযুগের সূচনা করেছিল। ইতিহাসের উপর লিখিত গ্রন্থাদি বিস্তার লাভ করে। সে সময়ের ঐতিহাসিকগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন চরিত, সাহাবা-ই-কিরাম, তাবি'ঈ, তাবি-তাবি'ঈ ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকিহ, আদিব ও ঐতিহাসিকদের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।[১০২] এ যুগে ইতিহাস রচনায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- পারস্যের অধিবাসী আহমদ ইবন ইয়াইয়া আল-বালাযুরী (মৃ. ২৭৯হি.), আল-ইয়াকুবী (মৃ. ৮৯১খ্রি.), আবু হানিফা আহমাদ আল-দিনাওয়ারি (মৃ. ৮৯৫ খ্রি.), ইবন জারির তাবারী (৮৩৮-৯২৩খ্রি.) ও মাসউদি (মৃ. ৯৫০ খ্রি.) প্রমুখ।[১০৩]

ভূগোলশাস্ত্র: ভূগোল শাস্ত্রে এ যুগে ভৌগোলিক অনন্য অবদান রাখেন।[১০৪] হজ্জ্ব যাত্রা, নৌবাণিজ্য এবং বিভিন্ন কারণে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার প্রয়োজনেই মুসলমানদের ভূগোল শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। তারা সর্বপ্রথম দিগ-দর্শন ও দূরবীণ যন্ত্রের আবিষ্কার করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। আল-খাওয়ারিজমী (৭৮০-৮৪৭খ্রি.) একশজন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় পৃথিবীর একটি মানচিত্র অংকন করেন। ভূগোলবিদ ইয়াকূবী কিতাবুল বুলদান প্রণয়ন করে মুসলিম ভূগোলের

---

১০০ আল-জাবর শব্দ হতে এ্যালজেব্রা নামের উৎপত্তি। আল-জাবর শব্দের অর্থ ভগ্নবস্তু জোড়া লাগানো অথবা অসম্পূর্ণ কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ করা, নতুন বিদ্যায় এর সমীকরণের উভয় পার্শ্বকে এমনভাবে সাজানো যাতে সংখ্যাগুলো সবই ধনাত্মক হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থে দ্বিতীয় নাম আল-মুকাবালা যার অর্থ এক জাতীয় সংখ্যাকে কমিয়ে দেয়া।

১০১ Reuber Levy : The Social Structure of Islam (Cambridge : Cambridge University Press, 1962), PP. 477.

১০২ ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখুল ইসলাম, খ.৩, পৃ. ২৮৬।

১০৩ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০৬।

১০৪ C.F. Manzoor Ahmad Hanifi, Short History of The Arabic Literature, Ibid, pp. 71-72. John P-MacGragor : Muslim Institutions, p. 196.

জনক উপাধিতে বিভূষিত হন। এ যুগের মুসলমানগণ নৌবিদ্যায় বিশেষ উন্নতি সাধন করেছিলেন।[১০৫]

মোদ্দাকথা, আব্বাসীয় শাসনের প্রাথমিক যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করে এ সময়ের মুসলমানগণ সমগ্র বিশ্বকে মুখরিত ও সঞ্জীবিত করে তুলে হতবাক করে দিয়েছিলেন।[১০৬] শিক্ষা বিস্তারের প্রতি এ যুগে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছিল এবং শিক্ষার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। এ সময় মসজিদ থেকে পৃথক স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। উলামায়ে কেরাম এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাই এ যুগকে শিক্ষা বিপ্লবের যুগ বলেও অভিহিত করা হয়।

বাগদাদ, কুফা ও বসরার অবস্থা

কবি আবুল আতাহিয়া কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। অপরদিকে কবি আবু নুওয়াস ইরাকের আহওয়ায-এ জন্মগ্রহণ করলেও ছোটবেলায়ই তিনি প্রথমে বসরায় এবং পরে কুফায় গমন করেন। নিম্নে তৎকালীন ইরাক, কুফা, বাগদাদ ও বসরার অবস্থা তুলে ধরা হলো।

ইরাক

আদিকাল থেকেই বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার আগমন ঘটেছে ইরাকে। বহুজাতির সংগমস্থল হিসেবে ইরাকের পরিচিতি ছিল। ইসলামের প্রাথমিককাল থেকেই ইরাক রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। উমাইয়া সালতানাত পতনের পর আব্বাসীয়দের অভ্যুদয়ের ঊষালগ্নে অর্থ, বিত্ত ও প্রতিষ্ঠা/ক্ষমতা পারসিকদের দখলে চলে গিয়েছিল, যাদের অবস্থান ছিল ইরাকে। তখন থেকে ইরাককে কেন্দ্র করেই রাজনীতি, অর্থ-বিত্ত, বিলাস-প্রাচুর্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিল্পকলা পরিচালিত হতো। আব্বাসীয় যুগে ইরাক ছিল বিভিন্ন জ্ঞান ও শিল্পচর্চা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ধারার প্রধান কেন্দ্র। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ভাষা, সাহিত্য এবং ব্যাকরণ চর্চা, একনিষ্ঠ দর্শন সাধনা, দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাবলীর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, কালামশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও অংক শাস্ত্রের উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধন; এছাড়া গান, সংগীত ও চিত্রাঙ্কন চর্চার প্রাণ কেন্দ্র ছিল ইরাক। ইরাক সম্পর্কে আল-মুকাদ্দাসীর মন্তব্য হলো, এটা বিশুদ্ধতম ও মনোরম জলবায়ুর দেশ। চৌকস রসিকের দেশ, জ্ঞানীগুণীদের জন্মভূমি এবং খলিফাদের প্রিয় ভূমি। এখানেই জন্ম নিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ ফকিহ আবু হানিফা (র) এবং ক্বারীশ্রেষ্ঠ সুফইয়ান (র)। আবু উবায়দা, আলফাররা, আবু আমর, হামস ও আল-কিসাঈ

---

১০৫ Huda Al-Alam, The Religions of the World (London : Minorsky, 1973), p. 9; History of Arabs, p. 379;

১০৬ প্রফেসর মো: হাসান আলী চৌধুরী , ইসলামের ইতিহাস, (আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, জানু. ১৯৮৬), পৃ. ৫২১-৫২৮।

ইরাকের সন্তান ছিলেন। তখনকার সময়ে সেরা ফকিহ, ক্বারী, সাহিত্যিক, জ্ঞানী, গুণী, চৌকস, অভিজাত, যাহিদ আর আবিদ-সবাই ইরাকের সন্তান ছিলেন। সারা দুনিয়ার সাথে পাল্লা দিতে পারে যে বসরা, গোটা জগতের প্রশংসা কুড়ায় যে বাগদাদ, যাবতীয় মহত্বের আধার যে কুফা এবং মন কাড়ে যে সামিরারা এগুলো ইরাকেরই অংশ।"[১০৭]

বাগদাদ: আব্বাসীয় খলিফা মানসুর (১৩৬হি./৭৫৪খ্রি.-১৫৮হি./৭৭৫খ্রি.) ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসী খিলাফতের রাজধানী হিসেবে বাগদাদ নগরী নির্মাণ করেন।[১০৮] এটি ইরাকের দজলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। ৮ম শতাব্দীতে এটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আব্বাসী খিলাফতের পতন পর্যন্ত মুসলিম দুনিয়ার তামাদ্দুনিক রাজধানী ছিল। খলিফা হারুনুর রশিদের আমলে এটি ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী ও কেন্দ্রস্থলরূপে গৌরবের শীর্ষে উন্নীত হয়। হারুনের মৃত্যুর পর খলিফার দুইপুত্র আমীন ও মামুনের মধ্যে গৃহবিবাদ ও যুদ্ধের ফলে এটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মামুনের সেনাপতি তাহেরের হাতে আমীন নিহত হন। পরর্তীতে মামুনের আমলে বাগদাদের হৃত গৌরব ফিরে আসে।[১০৯]

এই শহরই হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের বড় কেন্দ্র ছিল। খলিফা মামুনের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র 'বাইতুল হিকমা' এ শহরেই অবস্থিত ছিল। এখানকার মসজিদগুলি বিশেষতঃ আল-মানসুর এর 'জামি' ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র। আব্বাসী আমলের বাগদাদ ইমারত সৌন্দর্যে, জীবন জৌলুসে এবং আয়তনের বিশালত্বে পৃথিবীর পূর্বে কিংবা পশ্চিমে এর তুল্য কোন শহর ছিল না। সে যুগে বাগদাদ স্বপ্নের শহর ছিল। কেননা বিলাসী জীবনের সব উপায়-উপকরণ এখানে সহজলভ্য ছিল। কবিদের মতে[১১০]:

أعاينت في طول من الارض والعرض ** كبغداد دار انها جنة الأرض؟

صفا العيش أن بغداد واخضر عوده ** وعيش سواها غير صاف ولا غض

"এ বিশাল পৃথিবীর কোথাও বাগদাদের মতো শহর দেখেছো তুমি? এ-তো ভূ-স্বর্গ! জীবন এখানে স্বচ্ছ নির্মল ও সজীব-শ্যামল। অন্যত্র গিয়ে দেখো, জীবন কতো কঠিন ও কত দুর্বিসহ।"

তখনকার সময় পৃথিবীর সকল দেশের জ্ঞানী-গুণী ও বিচিত্র জাতির লোক এখানে বাস করতো। এটা ছিল হাশিমীদের শহর এবং তাদের সুলতানদের বাসভূমি। তখনকার সময়

---

১০৭ ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, অনুবাদ মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০২খ্রি.), খ. ২, ১ম প্রকাশ, পৃ. ৮১।

১০৮ মুহাম্মদ রেজা-ই করীম, আরব জাতির ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

১০৯ ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১৬, পৃ. ১৭৩।

১১০ ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, খ.১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

শ্রেষ্ঠ আলিম-উলামা, সূফি-দরবেশ, ক্বারী, কবি, ফকীহ, গায়ক, চিকিৎসক, কারিগর সবাই বাগদাদে বাস করতো।"[১১১] তৎকালীন বাগদাদকে Queen of the world বলা হতো।

কুফা: আব্বাসীয় রাজধানীর দীপ্তিতে স্নাত হবার আগ পর্যন্ত আরব উপদ্বীপের বাইরে কুফা ও বসরা এ দু'টি শহরই ছিল আরবীয় জীবন ও চিন্তা-ভাবনার প্রাণকেন্দ্র। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর ওফাতের পর যখন ইসলামী খেলাফতের পরিধি বিস্তৃত হতে লাগল এবং নতুন নতুন অঞ্চল বিজিত হল তখন সাহাবায়ে ক্বেরাম দ্বীন ও ঈমানের তা'লীমের জন্য দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। খলিফায়ে রাশেদ হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর আমলে ১৭হি./৬৩৮খ্রিস্টাব্দে কাদেসিয়া যুদ্ধ বিজয়ী সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা) এ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রসারে এটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং ১ম/৭ম শতকের সমগ্রকালব্যাপী এটি গুরুত্বপূর্ণ সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল। ইসলামী যুগে আন্ত:কলহজাত বড় দুই যুদ্ধ আল-জামাল (৩৬হি./৬৫৬খ্রি.) ও সিফ্ফীন (৩৬হি./৬৫৭খ্রি.) কুফাতেই সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে খারেজীদের উদ্ভব, শোকাবহ কারবালার ঘটনা (৬০-৬১হি./৬৮০-৮১খ্রি.) এবং মুখতারের বিদ্রোহ (৬৬-৬৭হি./৬৮৫-৮৬খ্রি.) এ শহরেই ঘটেছিল। খুলাফায়ে রাশেদুনের সময়কাল থেকেই রাজনীতি এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কুফা হতে আবর্তিত হয়।[১১২] উমাইয়া আমলে এটি কর্মব্যস্ত নগরীরূপে রূপান্ত রিত হয়েছিল। আব্বাসী আমলে কুফা নগরীর বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। আব্বাসী খেলাফতের প্রাথমিক যুগে কিছুকাল কুফা নগরী রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু আলীপন্থিদের উপস্থিতি ও সহানুভূতিশীলতা এ শহরে প্রবল থাকার দরুন খলিফা হারুনুর রশীদ বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং কুফা হতে বায়তুল মাল ও দাওয়াবীন সেখানে স্থানান্তরিত করেন।[১১৩]

কুফা নগরী শতাব্দীকালব্যাপী ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র ছিল। কুফা নগরীর গোড়াপত্তনের পর এ অঞ্চলে দ্বীন ও শরীয়ত এবং কুরআন ও সুন্নাহর তালিমের জন্য ওমর (রা) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে পাঠান। তিনি কুফাবাসীকে পত্র লিখলেন যে, "আমি আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে (রা) তোমাদের আমীর হিসেবে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) উযীর ও মু'আল্লিম হিসেবে প্রেরণ করছি। এঁরা দুজনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর মনীষী সাহাবীদের অন্যতম এবং ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তোমরা তাঁদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তাঁদের অনুসরণ করবে। মনে রাখবে,

---

১১১ মুহাম্মদ রেজা-ই করীম, আরব জাতির ইতিহাস, পৃ. ২১৮।

১১২ ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ২৪৫।

১১৩ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৪৩।

আব্দুল্লাহকে আমার নিজের প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমি তোমাদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য তাকে পছন্দ করেছি।"[১১৪] এই দুই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কুফাতেই আরো পনেরো শত সাহাবী অবস্থান করেছিলেন। যাঁদের মধ্যে সত্তর জন ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা), সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা), হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) সালমান ফারেসী (রা), আবু মুসা আশআরী (রা) প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবী সবাই কুফাতেই ছিলেন। হাদীস ও তারীখের ইমাম আবুল হাসান ইজলী (রাহ.) "তারিখ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'কুফাতে দেড় হাজার সাহাবী এসে বসতি স্থাপন করেন'।[১১৫]

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা) কুফা নগরীকে তাঁর 'দারুল খিলাফা' বানিয়েছিলেন।[১১৬] হাসান (রা) নিজ পিতার সাথে কুফায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। হযরত আলী (রা) এর আগমনের কারণে কুফার ইলমী উন্নয়ন এবং প্রসিদ্ধি আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ এ দু'জনই ছিলেন সাহাবায়ে ক্বেরামের ইলমের নির্যাস। এ প্রসঙ্গে। হযরত মাসরুক ইবনে আজদা' (রাহ.) বলেন:

درت فى الصحابة فوجدت علمهم ينتهى الى ستة ثم نظرت فوجدت علمهم ينتهى الى اثنين على وعبد الله –

অর্থ্যাৎ, 'আমি সাহাবীদের মাঝে ঘুরেছি। দেখলাম তাদের ইলম সমাপ্ত হয়েছে ছয়জনের মধ্যে, অতঃপর দেখলাম এই ছয়জনের ইলম আলী (রা) ও আব্দুল্লাহ (রাহ.) এ দুজনের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।[১১৭] আলী বিন আবু তালিব ইরাকবাসীর জন্য রেখে গিয়েছিলেন বহু বিচার ও ফাতওয়া যা তার ছাত্রদের মাধ্যমে যথাযথভাবে সংরক্ষিত সংবিধানরূপে বিবেচিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে ফিকহশাস্ত্রের অগ্রনায়ক ইমাম আযম আবু হানিফা (মৃ. ১৫০ হি./৭৭২খ্রি.), আরব ঐতিহাসিক আবু মিখনাফ (মৃ. ১৫৭ হি./৭৭৩খ্রি.), প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ রচয়িতা আররুআসী ইবন বাহদালা (মৃ. ১৩১হি./৭৪৮খ্রি.), ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. ১৮২/৭৯৮খ্রি.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল শায়বানী (মৃ. ১৮৯/৮০৪খ্রি.), হিশাম ইবন মুহাম্মদ আল-কালবী (মৃ. ২০৬/৮২১খ্রি.), কুফার ব্যাকরণ শিক্ষালয়ের সর্বাধ্যক্ষ আল-কিসা'ঈ (মৃ. ১৭৯/৭৯৫খ্রি.) তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র আল-ফাররা (মৃ. ৮২২ খ্রি.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এ কুফার সন্তান ছিলেন। ব্যাকরণ, ভাষা, সাহিত্য, কালাম ও অন্যান্য শাস্ত্র ছিল কুফা, বসরা ও বাগদাদ এই ত্রিমুখী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। বসরা ও কুফা ঘরানার চিন্তাবিদদের মধ্যকার বহু মুনাযারা বা বিতর্কের গল্প ইতিহাসশাস্ত্রে প্রচলিত আছে। পরিবেশের দিক থেকেই কুফা ছিল উর্বরা, প্রাকৃতিক

---

১১৪ ইবন সাদ, আত্ তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৬. পৃ. ৩৬৮।

১১৫ ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ৯১।

১১৬ হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইবনু কাসির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮২খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৩৩।

১১৭ ইবনুল কাইয়্যিম, ইলমূল মুয়াক্কীঈন(মিসর: তা.বি.), খ.১, পৃ. ৬।

সৌন্দর্যময় উর্বর মরুভূমির সান্নিধ্য। কুফার পানি যেমন সুপেয় তার জমিনও ছিল তেমনি সবুজ-শ্যামল। ফোরাত নদীর ডান তীরে অবস্থিত, নুড়ি পাথর মিশ্রিত শুষ্ক, মেটে বালুকা ভূমির বর্ধিত প্রান্তে অবস্থিত কুফা পানির সমতল হতে সামান্য উঁচুতে অবস্থিত ছিল বিধায় এখানে বন্যার পানি প্রবেশ করতো না। পানির সরবরাহ ভালো ছিল এবং আবহাওয়া ছিল স্বাস্থ্যকর।[১১৮]

বসরা

বসরা ইরাকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর। ইসলামের বিজয়ের পূর্বে এটি সাসানীদের কেন্দ্রস্থল ছিল। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর আমলে ১৪-১৫হি./৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে ওতবা ইবনে গাজওয়ান (মৃ. ১৭হিজরি) সাসানীয় বাহিনীকে পরাজিত করে এটি বিজয় লাভ করেন। বিখ্যাত সাহাবী আবু মুসা আশআরী (রা) এ শহরের প্রথম গভর্নর হিসেবে ৬৩৯-৬৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন। খিলাফতে রাশিদা ও উমাইয়া আমলে এটি রাজনীতি ও তামাদ্দুনিক কেন্দ্রস্থল ছিল। আব্বাসীয় আমলে এটি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ শহরকে কেন্দ্র করে ব্যাকরণ চর্চার অনেক স্কুল স্থাপিত হয়। উসমান (রা)-এর হত্যার পর উম্মুল মুমেনিন আয়েশা (রা) এখানে অবস্থান করেছিলেন। রাসূল (সা.)-এর খাদিম আনাস বিন মালিক, তাবেয়ী হাসান বসরী, ইবন সীরিন ও রাবেয়া বসরী এ বসরারই সন্তান ছিলেন। এছাড়া সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণের প্রবর্তক আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালী (মৃ. ৬৮৮/৮৯খ্রি.), বসরার ব্যাকরণবিদদের নেতা সিবাওয়েহ, বিজ্ঞানী ইবনে আল-হাইতাম, সাহিত্যিক আল-জাহিয, আরবি ছন্দশাস্ত্রের আবিষ্কর্তা ও প্রথম আরবি অভিধান (কিতাবুল আইন) এর রচয়িতা খলিল ইবনে আহমদ, কুরআন গবেষক আবু আমর বিন আল-আলা (মৃ: ৭৭০ খ্রি:), বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ইবন দুরাইদ (মৃ. ৯৩৪ খ্রি.) প্রমুখ বসরার অধিবাসী ছিলেন।[১১৯]

খুলাফায়ে রাশিদা ও উমাইয়া আমলে বসরার আল-মিরবাদ ছিল রাজনীতি ও সাহিত্য চর্চার আখড়া।[১২০] বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ধারায় বিশেষ করে ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে আল-মিরদাদের বিশেষ প্রভাব ও ভূমিকা ছিল। আব্বাসী আমলেও তা পুর্ণভাবে অক্ষুন্ন ছিল। কবি ফারাযদাক, ইবন জারির ও আখতাল-এর নিন্দা-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ছিল আল-মিরবাদ। এখানে তখন নিন্দা

---

১১৮ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৪১।

১১৯ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ, ১৬, পৃ. ১৪২।

১২০ আল-মিরবাদ হলো বসরার পশ্চিম দিকের উপকণ্ঠ, যা বেদুঈন পল্লীর সাথে সংলগ্ন। মূল বসরা শহর থেকে এর দূরত্ব তিন মাইলের মত। আরবরা বেদুঈন পল্লীর কোল ঘেঁষে সূক (বাজার) হিসেবে আল-মিরবাদের গোড়াপত্তন করেছিল। শহরে প্রবেশ করার পূর্বে কিংবা শহর থেকে যাওয়ার মূহূর্তে এই সূক থেকে তারা যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতো। মূলত ইসলামী যুগের আল-মিরবাদ ছিল জাহেলী যুগের 'উকায' মেলারই সংশোধিত রূপ। এটা ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের আরবদের মিলনক্ষেত্র। এখানে কবিরা কবিতা পাঠের আসর জমাতো। (দ্র. ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।)

কাব্যের উন্নত, ক্ষুরধার ও রসোত্তীর্ণ একটি শ্রেণি তৈরি হয়েছিল। কবিদের প্রত্যেকেরই ছিল স্বতন্ত্র হালকা। ভক্ত অনুরক্ত ও সমর্থক পরিবেষ্টিত হয়ে তারা নিজ নিজ হালকায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। আব্বাসী আমলে নামী-দামী কবিরা মিরবাদের প্রতিবেশী আরব বেদুঈনদের কাছ থেকে কাব্য বোধ ও শৈলী রপ্ত করার জন্য নিজেদের কাব্যকাঠামোকে তাদের অনুকরণে গড়ে তোলার জন্য যেতেন। এ উদ্দেশ্যেই কবি বাশ্‌শার, আবু নুওয়াসের মত কবিরা মিরবাদে হাজিরা দিতেন। তেমনি আরবী ভাষাবিদরাও মিরবাদবাসী বেদুঈনদের কাছ থেকে ভাষাজ্ঞান সঞ্চয় করা এবং তাদের থেকে শ্রুত ভাষা বিষয়ক নতুন তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য মিরবাদে যেতেন। এ সম্পর্কে আসমাঈ বলেন, "আমর ইবনুল 'আলা-এর কাছে একবার গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোথা থেকে এলেন? বললাম, আল-মিরবাদ থেকে। তখন তিনি আমাকে বললেন, নতুন কি এনেছেন-শোনান। আমি খাতায় যা লিখে এনেছিলাম তা থেকে পড়ে শোনালাম। তাতে ছয়টি শব্দ প্রয়োগ এমন ছিল যা তার জানা ছিল না। সেগুলো শুনে তিনি বললেন, তুমি আমাকে হারিয়ে দিলে।"[১২১]

মোটকথা আমাদের আলোচ্য যুগে ইরাকের বাগদাদ, কুফা ও বসরা ইসলামী শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য চর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। উমাইয়া আমলে ইরাকের প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র ছিল বসরা ও কুফা। আব্বাসী যুগে এসে তার সাথে নতুনভাবে যোগ হয় বাগদাদ। একাডেমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও প্রসারের কারণে আব্বাসী আমলে উপরোক্ত শহরত্রয়ের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিযোগিতাও ছিল তীব্র। ব্যাকরণ, ভাষা, সাহিত্য, কালাম ও অন্যান্য শাস্ত্র ছিল-কুফা, বসরা ও বাগদাদ এ ত্রিমুখী প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র।

---

১২১ ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কবি আবুল আতাহিয়া-এর জীবনধারা

আরবী পদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে আবুল আতাহিয়া (১৩০-২১১হি./৭৪৭-৮২৬খ্রি.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি তাঁর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। দরিদ্র পরিবারে জন্ম হওয়ার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তিনি জীবন ও জগৎ থেকে ব্যাপক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্র্যের কাছে তিনি হার মানেননি। তাঁর ছিল অনন্য সাধারণ কাব্যপ্রতিভা। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে তিনি তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। নিম্নে আবুল আতাহিয়ার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

জন্ম ও বংশ পরিচয়

কবি আবুল আতাহিয়ার প্রকৃত নাম ইসমা'ঈল, উপনাম বা কুনিয়াত আবু ইসহাক। আবুল 'আতাহিয়া'[১] তাঁর উপাধী।[২] তাঁর মাঝে বোকামীর ছাপ ছিল বিধায় এ নামেই তিনি কাব্য জগতে অমর হয়ে আছেন। কবির পিতার নাম আল-কাসিম। তাঁর উর্ধ্বক্রম বংশধারা হলো, আবু ইসহাক ইসমাঈল ইব্নুল কাসিম ইব্ন সুয়াইদ ইব্ন কায়সান আল আনাযী (ابو اسحاق اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي)।[৩] কবির মাতার নাম উম্মু যায়িদ বিনতু যিয়াদ

---

১ ابو العتاهية অর্থ ভ্রান্তি, নির্বুদ্ধিতা, গর্ব বা উন্মত্ততার জনক। তাঁর জীবন ও কাব্যে তাঁর নামের স্বার্থকতা প্রমাণিত হয়। কারণ, এ নাম দ্বারাই তিনি সাহিত্য জগতে অমর হয়ে রয়েছেন। মোহাম্মদ ইয়াহইয়া আলসী বলেন, আব্বাসী খলিফা মাহদী একবার তাকে انت انسان متحذلق معته তুমি অস্থিরচিত্ত ও উন্মত্ত লোক। খলিফার এ উক্তির পর তিনি লোকসমাজে 'আবুল আতাহিয়া' (ابو العتاهية) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনেকের মতে عتاهية নামে তার একটি ছেলে ছিল বলে তাকে ابو العتاهية বলে ডাকা হতো। (দ্র., হাফেয আবু বকর আহমদ বিন আলী আল-খতিব আল-বাগদাদী, তারিখু বাগদাদ (কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৩১ খ্রি.), পৃ. ২৫০; আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, আল আগানী (কায়রো : ১৩৪৫হি.) খ. ৪, পার্শ্বটীকা, পৃ. ২)

২ আহমদ হাসান যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুত: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ২৬৮; আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয্ যামান (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাহ: ১৯৪৮খ্রি.), সং. ১, খ. ১, পৃ. ১৯৮

৩ আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, আল আগানী (কায়রো : ১৩৪৫হি.), পৃ. ১

আল-মুহারিবী (أم زيد بنت زياد المحاربي)। যিনি বনী যুহরা গোত্রের একজন মিত্র যিয়াদুল মুহারিবীর কন্যা ছিলেন।[৪] কবির পরিবার 'আনাযা'গোত্রের মিত্র বা মাওয়ালী ছিল। ফলে তাকে আনাযী বলা হতো।[৫] কারো কারো মতে, তাঁর পিতা আল-কাসিম নাবাত্বী বংশোদ্ভূত ছিলেন।[৬] কবি আবুল আতাহিয়া ১৩০ হি./৭৪৭ খ্রি. কুফার নিকটস্থ আনবারের 'আয়নুত তামার'[৭] নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবেই পরিবার-পরিজনের সাথে আয়নুত তামার অঞ্চল থেকে কুফা চলে আসেন।[৮]

প্রাথমিক জীবন

আবুল আতাহিয়ার বংশীয় পেশা ছিল নিম্ন মানের। মৃৎপাত্রপাত্র তৈরি করা পারিবারিক পেশা ছিল। অনেকের মতে, তাঁর পিতা হাজ্জাম (রক্তমোক্ষক) ছিলেন অর্থাৎ তিনি শিঙ্গা লাগাতেন। কবি নিজে পারিবারিক কুম্ভকারশালায় আপন ভাই ও অন্যদের সাথে মটকা তৈরির কাজ করতেন। এজন্য তাকে 'আল-জার্‌রার' বা কুম্ভকার বলা হতো। বংশীয় পেশা নিম্ন শ্রেণির হওয়ায় তিনি সামাজিকভাবে উপেক্ষার পাত্র ছিলেন যা তাঁর জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম জীবনে কবি নিজেও পথে পথে ঘুরে মৃৎপাত্র বিক্রয় করেছেন।[৯] মৃৎপাত্র তৈরি করার বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন:[১০]

أنا جرار القوافي، وأخي جرار التجارة

"আমি ছন্দের কারিগর আর আমার ভাই মৃৎপাত্রের কারিগর।"

---

৪ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান (বৈরুত: দারু বৈরুত, ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.), পৃ. ৫।

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৭ আইনুত তামার (Ayn al-Tamr) ওয়েস্ট কুফার আনবারের পার্শ্ববর্তী পুরাতন ছোট শহর। এটি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে ১২শ হিজরীতে বিজিত হয়। বর্তমানে এটি মধ্য ইরাকের একটি শহর। কারবালা থেকে ৬৭ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। এটি খেজুর বাগান ও খনিজ পানির জন্য বিখ্যাত। আহমদ হাসান যাইয়্যাত বলেন, আইনুত তামার হিজাযের একটি গ্রাম যা মদীনা বা আনবারের নিকটবর্তী। আবুল আতাহিয়া সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন এবং কুফায় বড় হয়। (দ্র. মু'জাম আল-বুলদান, খ. ৩, পৃ. ৭৫৯; আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৯৫; https:\\en.wikipedia.org/wiki/Ayn_al-Tamr)

৮ উমর ফররুখ, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী (বৈরুত : দারু আল-ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৯ খ্রি.), খ.২, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৯০; সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৮

৯ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখ, পৃ. ১৯৫।

১০ ইস্পাহানী, কিতাবুল আগামী (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, তা.বি.), খ.৪, পৃ. ১০।

একবার কেউ তাঁকে নিম্ন বংশের খোঁটা দিলে কবি তার জবাব দিয়েছিলেন নিম্নোক্ত পংক্তির মাধ্যমে : [১১]

الا انما التقوي هو العز والكرم ** وحبك للدنيا هو الذل والعدم

وليس علي عبد تقي نقيصة ** اذا صحح التقوي، و ان حاك او حجم

"তাকওয়াই প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান, সংসারের প্রতি তোমার লোভ-লালসা কেবল লাঞ্ছনা দারিদ্র্য ও অভাব সৃষ্টি করে থাকে; প্রকৃত ধার্মিক ও সাধু ব্যক্তি জোলা বা রক্তমোক্ষক হলেও কোন দোষ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।"

কবির উপরোক্ত পংক্তির মাঝে একটি মহান সত্য লুক্কায়িত। অন্যত্র তিনি বলেন:

وإذا تَنَاسَبَتِ الرّجالُ، فما أرَى ** نَسَباً يُقاسُ بصالِحِ الأعْمالِ

"মানুষ বংশ গৌরব করে, কিন্তু আমি দেখি যে, বংশগৌরব কখনোই সৎকর্মের সমকক্ষ হয় না।"

কেননা গোত্রের এক ব্যক্তি তার সাথে বংশীয় অহমিকা প্রকাশ করলে জবাবে তিনি বলেন:

دعنيَ منْ ذكرِ أبٍ وجدٍّ ** ونَسَبٍ يُعليكَ سُورَ المِجْدِ

ما الفَخرُ إلاّ في التّقَى والزّهْدِ، ** وطاعةٍ تعطِي جِنانَ الخُلْدِ

"বাপদাদা ও বংশ মর্যাদার ফাঁকাবুলি পরিহার কর। আসল গৌরবতো যুহদ, তাকওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত, যা চিরস্থায়ী জান্নাত দান করবে।"

উপেক্ষার কারণে জীবনের শুরু থেকেই স্বীয় মেধা কাজে লাগাতে পারেননি; সেজন্য তার লিখিত কবিতায় সমাজের ধনিক শ্রেণির প্রতি বিরক্তি পরিলক্ষিত হয়। এমনকি সম্পদশালী শাসকদেরও তিনি ছাড় দেননি; যারা তাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

শিক্ষাজীবন

কুফাতেই আবুল 'আতাহিয়া বেড়ে ওঠেন এবং যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। তৎকালীন কুফা শিক্ষা-সংস্কৃতির লালনকেন্দ্র ছিল। এখানে তিনি বিভিন্ন ধর্ম, মতবাদ ও সংস্কৃতির পরিচিতি লাভ করেন। আতাহিয়া ছিলেন স্বভাবজাত কবি। দরিদ্র হওয়ার দরুন তিনি শৈশবে জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের দারসে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাননি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মাঝে ধী-শক্তির

---

১১ আবুল 'আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

প্রখরতা পরিলক্ষিত হয়। জন্মগতভাবে তিনি স্বাভাবিক কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কাব্যের প্রতি তাঁর বেশি ঝোঁক হওয়ার কারণে তিনি মরু অঞ্চলে চলে যান এবং সেখানকার বিশুদ্ধভাষী আরব বেদুঈনদের সাথে মিশে ভাষাগত শুদ্ধতা ও কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। আতাহিয়া কুফার সাহিত্য আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর মাঝে প্রবল এক সাহিত্য বোধ ও কাব্যপ্রতিভার আলো বিকশিত হয়ে ওঠে। তিনি কুফার শ্রেষ্ঠ কবিদের সাথে পরিচিত হন, যারা তখন আরবী ভাষা-সাহিত্যে নবসৃষ্টিশীল কর্ম উপহার দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন কুফার অলি-গলিতে মৃৎপাত্র বিক্রয়ের জন্য আওয়াজ করে ফিরতেন তখনই তার মনে কবিতা আবৃত্তির শখ জাগ্রত হয়। তিনি নিজেই কবিতা আবৃত্তি করতেন ও ছন্দ মিলাতেন। কখনো কখনো কথার মাঝে ছন্দোবদ্ধ বাক্য ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন[১২]:

ولو شئت ان اجعل كلامي كله شعراً لفعلت

'আমি যদি ইচ্ছা করি আমার প্রতিটি কথাই কাব্যাকারে বলবো, তাও আমার দ্বারা সম্ভব।'[১৩]

কর্ম জীবন

দারিদ্র্যের কারণে আবুল 'আতাহিয়া কুফার পারিবারিক পেশা কুম্ভকারের কাজে নিয়োজিত থেকে লালিত-পালিত হন। কবির পূর্বপুরুষের পেশা ছিল মৃৎপাত্র তৈরি করা। কবি তাঁর ভাইদের সাথে পারিবারিক মৃৎপাত্র তৈরির কারখানায় কাজ করতেন। এ জন্য তিনি 'আল জাররার' বা কুম্ভকার নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইদের সাথে সবুজ রঙের মটকা বা কলসী তৈরি করতেন।[১৪] আবুল 'আতাহিয়া শুধু মৃৎপাত্র তৈরিই করতেন না, তৈরি মৃৎপাত্রগুলো খাঁচি ও জালে করে মাথায় ও পিঠে বহন করে কুফার পথে পথে ও অলিতে গলিতে বিক্রি করতেন।[১৫]

মালামাল ফেরি করার সময় তার মনে কবিতা আবৃত্তির আবেগ জাগ্রত হতো এবং তখন মনের সুখে তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে থাকতেন। এ ছাড়া মৃৎপাত্র তৈরি করার সময়ও

---

১২ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

১৩ দীওয়ানে আবুল 'আতাহিয়া, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১৪ আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১৫ আহমদ আয-যাইয়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ২০০০ খ্রি.), স. ৬, পৃ. ১৯৫; ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি শি'রিল আরাবী (কায়রো: দারুল মা'আরেফ, ১৯৬০ খ্রি.), স. ১০, পৃ. ১৬৪।

তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে থাকতেন। তাঁর সমসাময়িক আব্দুল হামিদ ইব্ন সরীহ বলেন :[১৬] "আমি দেখেছি আবুল 'আতাহিয়া যখন কুম্ভকারের কাজ করতেন তখন কাব্যামোদী বহু যুবক তাঁর নিকট যেতো। কারণ তখন কবিতা ছিল গণমানুষের হৃদয়ানুভূতির বহিপ্রকাশ (Public register)। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং তারা ভগ্ন মৃৎপাত্রের উপর লিখে নিতেন।"

খলিল ইবনে আসাদ বলেন, আবুল আতাহিয়া আমাদের নিকট আসার অনুমতি চাওয়ার সময় বলতেন': [১৭] انا ابو اسحاق الجرابر "আমি আবু ইসহাক কুম্ভকার।"

আশৈশব তাঁর ধমনীতে যেন কবিতার শোণিতধারা প্রবহমান। একদা মাটির পাত্র ফেরী করা অবস্থায় কতক যুবককে কবিতা প্রতিযোগীতা ও আবৃত্তির আসর জমাতে দেখে মাটির পাত্রের খাঁচা রেখে ওদেরকে বলেন, হে তরুণ যুবারা! তোমরাতো দেখছি আসর জমিয়েছ এবং বিজয়ীকে পুরস্কৃত করছ। যদি আমার সাথে বিজয়ী হতে পার তবে আমি তোমাদেরকে দশ দিরহাম করে দেব। প্রথমে তারা কুম্ভকার ভেবে তাঁকে উপহাস করলো। পরে কবির দৃঢ়তা দেখে তারা প্রতিযোগীতায় সম্মত হল। তিনি বললেন, এবার আমার এ পংক্তিটির সাথে ছন্দ মিলাও দেখি- ساكنى الأجداث انتم আর এজন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া হল। কিন্তু যুবকরা ব্যর্থ হওয়ায় এবার তিনি ওদেরকে ভর্ৎসনা করে বলেন:

ساكنى الأجداث أنتم ** مثلنا بالأمس كنتم

ليت شعري ما صنعتم ** أربحتم أم خسرتم؟

"ওহে কবরবাসী, তোমরা তো গতকাল আমাদের মতই ছিলে, হায়, তোমরা কী করছো যদি জানতে পারতাম। তোমরা কি লাভবান না ক্ষতিগ্রস্থ?"

কবির কাব্য প্রতিভা দেখে তরুণরা লজ্জাবনত হলো। মানুষ কুফার অলিতে-গলিতে তাঁর কাব্যিক প্রতিভার কথা বলে বেড়াতে লাগলো। অল্প ক'দিনের মধ্যেই চতুর্দিকে তাঁর কাব্য প্রতিভার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। তখন সাহিত্যামোদী ও কাব্যপ্রিয় মানুষ তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার আশায় তাঁর কাছে ভীড় জমাতে লাগলো।

---

১৬ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ.৬

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৬

বাগদাদে আবুল 'আতাহিয়া

আবুল আতাহিয়া স্বীয় কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন ছিলেন। সে সময় বাগদাদ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। আবুল আতাহিয়া মসুলবাসী ইবরাহীমের সাথে কুফা থেকে বাগদাদ পৌঁছেন। কবি রাজকৃপা লাভের জন্য বাগদাদে খলীফার দরবারে যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু রাজদরবারে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়ে তিনি হীরাতে অবস্থান করতে থাকেন। এখানে তাঁর কাব্য সাধনা চলতে থাকে। চারদিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন ছিল আব্বাসীদের শাসনামল। খিলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন খলীফা মাহদী বিন মানসুর (১৫৮-১৬৯হি.)। খলিফা মাহদী যেমন ছিলেন প্রজাবৎসল তেমনি সাহিত্যামোদী। আবুল আতাহিয়ার সুখ্যাতি মাহদীর দরবারে পৌঁছালে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান। কবি বাগদাদ গমন করেন এবং খলীফা মাহদীর স্তুতিমূলক কবিতা পাঠ করে তাঁকে মুগ্ধ করে দেন। আবুল আতাহিয়ার কাব্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ খলীফা তাঁকে পুরস্কৃত করেন।[১৮] অতঃপর কবি বাগদাদেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

খলীফা হাদী, হারুনুর রশীদ, আল-আমীন ও মামুন-উর রশীদ-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা সকলেই কবির গুণমুগ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে প্রবাদপ্রতীম ছিলেন। একজন মৃৎশিল্পী কাদা-পানি থেকে ওঠে এলেন সভাকবিদের জাঁকালো আসরে এবং পর্ণকুটির থেকে রাজপ্রাসাদে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নিকলসন ঠিকই বলেছেন: "He was bred in Kufa and gained his livelihood as a youngman by selling earthen ware. His political talent however promised so well that he set out to present himself before the Caliph Mahdi".

একবার খলীফা মাহদী তাঁর দরবারে সমকালীন কবিদের তলব করেন। তখন সমবেত কবিদের মধ্যে আবুল আতাহিয়া ও অন্ধ কবি বাশ্শার ইবন বুর্দও উপস্থিত ছিলেন। আবুল আতাহিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে কবি বাশ্শার তাঁর সঙ্গীকে বলেন- এখানে কি আবুল আতাহিয়া আছেন? সে উত্তরে বলে- হ্যাঁ। একথা শুনে আতাহিয়া উত্বার ব্যাপারে তাঁর রচিত ঐ কাসিদা আবৃত্তি করতে থাকেন।

---

১৮ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত পৃ. ৭; উমর ফররুখ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, খ. ২, পৃ. ১৯০।

যার প্রথম পংক্তি হল[১৯]:

الا ما لسيدتى مالها * أدلت فأجمل ادلالها

"শুনে রাখ! তার যা আছে আমার কর্ত্রীর তা নেই, সে অভিমান করেছে তারপর তার অভিমানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে।"

কবিতার এই লাইন শুনে কবি বাশ্‌শার ইবন বুরদ সঙ্গীকে বললেন- "আমি এর চেয়ে সাহসী ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি"। এ মন্তব্য শুনে আবুল আতাহিয়াহ আরো উৎসাহিত হয়ে কবিতা শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন-

أتته الخلافة منقادة ** إليه تجررُ أذيالها

فلم تك تصلح إلا له ** ولم يك يصلح إلا لها

ولو رامها أحد غيره ** لزلزلت الأرض زلزالها

ولو لم تطعه بنات القلوب ** لما قبل الله أعمالها

"খিলাফত তাঁর 'অনুগত' হয়ে আঁচল হেঁচড়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে;
আর তা তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্য শোভা পায়না আর তিনিও 'তা' ছাড়া অন্য কিছুর সাথে বেমানান;
তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যদি তা কামনা করতো তাহলে পৃথিবী প্রচণ্ড কম্পনে প্রকম্পিত হতো;
আর 'হৃদয় কন্যারা' যদি তার অনুগত না হতো তাহলে আল্লাহ তাদের আমলসমূহ কবুল করতেন না।"

আতাহিয়ার কবিতার শেষে বাশ্‌শার বিন বুরদ সঙ্গীকে বললেন, দেখতো তাঁর প্রশংসায় খলীফা আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার আসন থেকে উড়াল দিয়েছেন কি না? বর্ণনাকারী বলেন, সত্যই এই কবিতা শ্রবণে খলীফা এতই মুগ্ধ হন যে, উপস্থিত কবিদের মধ্যে একমাত্র আবুল 'আতাহিয়া ব্যতীত অন্য কাউকে পুরস্কৃত করেননি। এভাবে তিনি কবিতার মাধ্যমে রাজ দরবার হতে ব্যাপকহারে উপহার সামগ্রী লাভ করতে থাকেন।[২০]

---

১৯ আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০ খ্রি.), ১ম সং, খ.১০, পৃ. ৪৫৫-৫৬।

২০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৪৫৫-৫৬।

কারাবরণ

খলিফা মাহদীর দরবারে থাকাকালীন আবুল আতাহিয়া কিছুদিন মাহদির ক্রীতদাসী উতবার প্রেমে পড়ে কবিতায় তার উল্লেখ করতে থাকেন। কিন্তু দাসীটি কিছুতেই এ কবির প্রতি দৃষ্টি দেননি; বরং সর্বদাই খলিফার মনোরঞ্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। খলিফা বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দিয়ে কবিকে বাঁদিটীর কথা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কবি তার কবিতায় উতবাকে স্মরণ করতে ভুল করতেন না। এমনকি কবি খলিফার প্রশংসামূলক কবিতাতেও উতবার কথা উল্লেখ করতেন।[২১] এতে খলিফা মাহদী ক্রুদ্ধ হয়ে কবিকে বন্দি করেন। কয়েদখানার অভ্যন্তরে বসে তিনি স্বীয় অপরাধ স্বীকার ও মার্জনা ভিক্ষা করে একটি কবিতা রচনা করেন। এতে খলিফার মনে কৃপা উদ্রেক হয় এবং কবি মুক্তি লাভ করেন।[২২] মাহদীর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র হাদী (১৬৯-১৭০হি.) খলিফা হন। কনিষ্ঠপুত্র হারুনের সাথে তিনি মিশতেন বলে আবুল 'আতাহিয়ার প্রতি হাদী অসন্তুষ্ট ছিলেন। কাজেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলে কবি কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। অতঃপর খলিফার অনুগ্রহ ভিক্ষা করে একটি কবিতা রচনা করে হাদীর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি কবির প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ডেকে পাঠান। হাদীর মৃত্যুকাল পর্যন্ত আবুল 'আতাহিয়া তাঁর দরবারে সসম্মানে অবস্থান করেন। কিছুদিন পর যখন হারুনুর রশীদ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কবি তাঁর দরবারে এসে তাঁর প্রশংসাগীতি গেয়েছেন। খলিফা হারুনুর রশীদের সাথে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এমনকি দেশে ও প্রবাসে তিনি খলিফার সঙ্গী হতেন। দান-দক্ষিণা, উপহার-উপঢৌকন ছাড়াও খলিফা তাঁকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম মাসোহারা দিতেন।[২৩]

খলীফা হারুনুর রশিদ তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। হাম্মাদ ইবন ইসহাক বলেন: [২৪] "একদা খলীফা দুই পাতা কাগজ নিয়ে আমাদের নিকট এলেন। এক পাতা কাগজ তাঁর ছেলের গৃহ শিক্ষককে দিয়ে বললেন, তা যেন তাঁর ছেলেকে কণ্ঠস্থ করানো হয়। অপর পাতা আমার হাতে দিয়ে তাতে সুরারোপ করার জন্য বললেন।"

---

২১ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬; ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, (ই.ফা.বা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

২২ দীওয়ান, (ভূমিকা) পৃ. ৭।

২৩ আবদুল হক ফরিদি, আরব কবি আবুল 'আতাহিয়া, মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা ১৩৩৪বাং, ফাল্গুন ১মবর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ২৮৩।

২৪ আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

আবুল ‘আতাহিয়া হারুনুর রশীদের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি খলীফাকে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ও সাহায্যকারী হিসেবেই জানতেন। এ মর্মে তাঁর রচিত কবিতার নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো প্রণিধানযোগ্য:[২৫]

إذا نكب الإسلام يوما بنكبة ** فهارون من بين البرية ثائرة

“কোন দিন যদি ইসলাম বিপন্ন হয়, তাহলে সকল সৃষ্টির মধ্য থেকে হারুনই হবেন এর সাহয্যকারী।”

কবি খলিফা হারুনুর রশীদকে শান্তি ও করুণার প্রতিবিম্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সেই সাথে মহান করুণাময় আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করেন যে, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং কিয়ামত দিবসে শান্তির ফয়সালা করেন। যেমন কবি বলেন: [২৬]

إِنَّما أَنتَ رَحمَةٌ وَسلامَه ** زادَكَ اللَهُ غِبطَةً وَكَرامَه

لَو تَوَجَّعتَ لي فَرَوَّحتَ عَنّي ** رَوَّحَ اللَهُ عَنكَ يَومَ القِيامَه

“আপনি তো দয়া ও শান্তির মূর্ত প্রতীক। আল্লাহ আপনার সুখ-শান্তি ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। আপনি যদি আমার জন্য সদয় হন অতঃপর আমার শান্তির ব্যবস্থা করেন তবে কিয়ামতে আল্লাহও আপনার শান্তির ব্যবস্থা করবেন।”

তৎকালীন আব্বাসীয় ভোগ-উপভোগ ও বিলাস-বিনোদনের যুগে খলিফা হারুনুর রশীদের ধর্মচেতনা ও শিল্পবোধ তাঁর চরিত্রে পাশাপাশি লালিত ও পুষ্ট হয়েছিল। তিনি সিজদায় যেমন তাঁর বিনিদ্র রাত কাটাতেন তেমনি সংগীত আসরেও তাঁর নিশি ভোর হতো। কবির কবিতা শুনে যেমন তিনি বাহবা দিতেন তেমনি বুযুর্গদের তিরস্কার শুনে তিনি বিষন্ন হতেন। কবি আবুল আতাহিয়ার নিম্নোক্ত কবিতা শুনে তিনি কাঁদতেন[২৭]:

خانك الطرفُ الطموحُ ** أيُّها القلبُ الجَمُوحُ

لدواعي الخيرِ والشَّر ** رِ دُنُوٌ ونُزوحُ

هل لمطلوبٍ, بذنبٍ, ** توبةٌ منه نَصوحُ

---

২৫ আবুল আতাহিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩; ড. শুকরী ফায়সাল, আবুল ‘আতাহিয়া : আশআরুহু ওয়া আখবারুহু (দিমাশক : দারুল মা‘আল্লাহ, তা.বি), পৃ. ৫৪০

২৬ ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী (কায়রো : দারুল মা‘আরিফ, তা.বি.), ১৪শ সংস্করণ, খ.৩, পৃ. ২৪১; ইবন কুতায়বা, আশশির ওয়াশ শুয়ারা (বৈরুত: দারুছ ছাকাফা, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৭৬৭

২৭ ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, মুহাম্মদ আবূ তাহের মেসবাহ কর্তৃক অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০২-১০৩

كيفَ إصلاحُ قلوبٍ, ** إنَّما هُنَّ قُرُوحُ

أحسنَ الله بِنا أنَّ ** الخطايا لا تفوحُ

فإذا المستورُ مِنَّا ** بينَ ثوبَيه فُضوحُ

كم رأينا من عزيزٍ, ** طُوِيَت عنه الكُشوحُ

صاحَ منه برحيلٍ, ** صائحُ الدَّهرِ الصَّدوحُ

موتُ بعضِ الناسِ في الأر ** ضِ على بعضٍ, فُتوحُ

سيصيرُ المرءُ يوماً ** جسداً ما فيه روحُ

بينَ عَينَي كلِّ حيٍّ, ** عَلَمُ الموتِ يلوحُ

كُلُّنا في غفلةٍ, والـ ** ـموتُ يغدو ويروحُ

لِبَنِي الدنيا من الدنـ ** ـيا غَبُوقٌ وصَبُوحُ

رُحنَ في الوَشيِ وأَصبَحـ ** ـنَ عليهِنَّ المسوحُ

كلُّ نطَّاحٍ, من النا ** سِ له يومٌ بَطوحُ

نُح على نفسِكَ يا مسـ ** ـكينُ إن كنتَ تنوحُ

لَتموتنَّ وإن عُمـ ** ـِرتَ ما عُمِّرَ نوحُ

– “হায়রে অবাধ্য হৃদয়! উচ্চাভিলাস তোমাকে শেষ করেছে;
– সৎকর্ম ও দুস্কৃতির কার্যকারণে অবশ্য উত্থান-পতন আছে;
– পাপ তাড়িত যে, তার ভাগ্যে কি আর খাঁটি তাওবা জোটে?
– পচন ধরা হৃদয়ের সংশোধন হবে কিভাবে বলো?
– আমাদের পাপাচার ফাঁস হয়ে যায় না দয়াময়ের এইতো বড় দয়া;
– টগবগে যৌবনের হে মানুষ! একদিন পড়ে থাকবে তার প্রাণহীন দেহ;
– জীবনধারী প্রত্যেকের দৃষ্টিপথে মৃত্যুর কালো পতাকা উড়ছে(তা সত্ত্বেও আমরা অন্ধ);
– আমাদের সবার হাত-পা বাঁধা। আর মৃত্যু সকাল-সন্ধ্যা ছোবল হানছে;
– পৃথিবীর সন্তানকে সকালে কিংবা সন্ধ্যায় শরীক হতে হবে মহাযাত্রার কাফেলায়;
– ফুল বুটির ঝিকিমিকি পোশাকে বিচরণকারিণীদের দেখ আজি সাধারণ বেশ;
– ‘সময়ের মঞ্চে’ শিংবাগিয়ে ঘায়েল করছে যারা তাদের ও ঘায়েল হতে হবে একদিন;
– রে হতভাগা! বিলাপের শখ হলে নিজের জন্যই বিলাপ করেনে এ বেলা;
– ‘নুহ’ নবীর দীর্ঘ জীবন পেলেও মরতে তোকে একদিন হবেই।”

একবার খলিফা হারুনুর রশীদের একটা অট্টালিকা বানানোর শেষ হলে সবাই এর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করতে লাগলো। তখন খলিফা আতাহিয়াকে এ সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, 'উচ্চ প্রাসাদের শামিয়ানায়, সুখে শান্তিতে আপনি বসবাস করুন।' হারুনুর রশিদ খুশি হয়ে বলল, বাহ! সামনে চলুন। কবি বললেন, 'প্রভাবে ও সন্ধ্যায়, এই প্রাসাদে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন।' খলিফা আরো আনন্দিত হলো। কিন্তু কবি এরপর বললেন, "বুকের কম্পন আর মৃত্যুর গড়গড়া যখন শুরু হয়ে যাবে তখন আপনি নিশ্চিত বুঝতে পারবেন যে, আপনি প্রাসাদে বাস করেননি। বরং বাস করেছেন প্রতারণায়।" এই কথাগুলো শুনে খলিফা অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। কান্না শেষে তিনি আমলাদের বললেন, সুসজ্জিত পর্দাগুলো খুলে ফেলতে এবং প্রাসাদের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিতে।[২৮]

বাল্যকাল থেকেই কবি আবুল আতাহিয়া জীবনকে গাম্ভীর্য ও বিরাগের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই দরবারী জীবনের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ধরাও স্বাভাবিক ছিল। ভোগবাদী খলিফাদের স্বভাব সম্পর্কে আতাহিয়া বলেন[২৯]:

أخي من عشق الرئاسة خفت أن ** يطغى ويحدث بدعة وضلالة

"হে ভাই আমার! রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি দীওয়ানা ব্যক্তির প্রতি আমার ভয় হয় সে আল্লাহর সীমালংঘন করবে অথবা বিদ'আত ও বাতিল পথ অবলম্বন করবে।"

কবি আতাহিয়া খলিফা হারুনের সিংহাসনে আরোহনের পর কাব্য রচনার অহমিকা তিনি মোটামুটি ছেড়েই দিয়েছিলেন।[৩০] হারুনুর রশীদের আমলে কবিতা আবৃত্তি বন্ধ করে দেন। কিন্তু খলীফা তাকে বন্দী করে রাখেন এবং কবিতা আবৃত্তি না করার কারণে ষাটটি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। এক পর্যায়ে কবি নতি স্বীকার করেন এবং কবিতা আবৃত্তির অঙ্গীকার করে বন্দীশালা থেকে মুক্তি পান। এরপর তিনি কবিতা রচনা ও আবৃত্তি আর বন্ধ করেননি। আমৃত্যু কবিতাই ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। কবিতা রচনা আর আবৃত্তি ছাড়া আবুল আতাহিয়া অন্য কোন কাজ করেননি। এমন কি তার প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, জীবন ধারনের জন্য এটিই ছিল তাঁর উপযোগী। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য মাসিক ভাতা ধার্য করা ছিল পঞ্চাশ হাজার দিরহাম। এছাড়া খলীফা ও আমীর-ওমরাদের পক্ষ থেকে উপঢৌকন তো ছিলই।

---

২৮ https://fateh24.com

২৯ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ানু আবুল আতাহিয়া (বৈরুত: দারু বৈরুত: ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.), পৃ. ৩৪৮।

৩০ আবদুল হক ফরিদি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

তিনি প্রথম জীবনে জন্মভূমিতে অবস্থান করলেও যুবক বয়স থেকে আমৃত্যু বাগদাদেই কাটান। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সময় কবিতা রচনাই ছিল তাঁর নেশা ও পেশা। শুধু রচনার আধিক্যে নয় –অনুপম রচনাশৈলী ও মানের কারণেই তিনি খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করতে সক্ষম হন। আবুল আতাহিয়ার আবির্ভাব খলীফা মাহদীর শাসনামলে–এসময় তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। অতঃপর খলীফা হাদী, হারুনুর রশীদ, আমীন ও মামুনের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি শুধু কাব্যই রচনা করেছেন। এতে করে তিনি অর্জন করেছেন সুনাম, সুখ্যাতি ও খলীফাগণ কর্তৃক অঢেল সম্পদ। প্রথম জীবনে গযলসহ বিভিন্ন ধরণের কবিতা লিখলেও পরিণত বয়সে বিশেষ করে শেষ বয়সে যুহদিয়াত বা মরমী কবিতাই শুধু রচনা করেছেন।

সূফিবাদ অবলম্বন

উতবার প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে বারংবার প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ মনোরথ হওয়ার পর কবির জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ক্রমেই তিনি সূফিবাদ ও বৈরাগ্যবাদের দিকে ধাবিত হয়ে পড়েন। কারো কারো মতে, তিনি আব্বাসী যুগের রাজন্যবর্গের দুনিয়াপ্রীতি, ভোগ-বিলাস, অভিজাত শ্রেণির ধর্মের প্রতি উদাসিনতায় বিরক্ত হয়ে সূফিবাদ অবলম্বন করেন।[৩১] সমকালীন রাজন্যবর্গের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। খলীফাদের সুদৃষ্টি তাঁকে বিশাল সম্পদের অধিকারী করলেও তিনি জাগতিক ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেননি। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি ও অভিজাত শ্রেণির ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে দুনিয়া বিমুখ করে তুলে। তাছাড়া সামাজিকভাবে উপেক্ষিত তাঁর হৃদয় মানসকে তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে। ফলে পরবর্তীতে তাঁর কাব্য রচনায় শাসক ও সম্পদশালী শ্রেণির প্রতি তাঁর অবজ্ঞা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এরপর থেকে তিনি কাব্য রচনায় নতুন ধারার সৃষ্টি করেন, যার বিষয়াবলী ছিল- পার্থিব জীবনের অসারতা, পরকালের জন্য পূণ্য সঞ্চয়, আল্লাহর একত্ববাদ, ধর্মপালনে একাগ্রতা ইত্যাদি। এক সময় তিনি হয়ে উঠেন যুহদ কবিতার প্রতীক। আতাহিয়া এ জাতীয় কবিতা রচনা করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

---

৩১ R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, ibid, p. 279.

আব্বাসীয় যুগের কবি বাশ্‌শার ও আবু নুয়াসরা ছিলেন ভোগবাদী জীবনধারার কর্ণধার। তাদের অশ্লীল কাব্য, মানুষের কামনা ও প্রবৃত্তির আগুনে ইন্ধন যোগাতো। অন্যদিকে কবি আবুল আতাহিয়ার কবিতা ছিল যাহিদ ও সংসার নিরাসক্তদের তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের জন্য শীতল পানি তূল্য। যেমন, আবু নুয়াস তাঁর কবিতায় আনন্দময় জীবনের হাতছানি দিয়ে বলেন[৩২]:

جَرَيتُ مع الصِّبا طَلَقَ الجُموح ** وهانَ عليّ مأثورُ القبيح

وجدتُ أَلَذَّ عَارِيَةِ اللّيالي ** قِرَانَ النّغْمِ بالوَتَرِ الفصِيحِ

و مُسْمِعَة، إذا ما شِئْتُ غَنَّتْ ** متى كان الخِيامُ بِذي طُلُوحِ

تمتّعْ من شَبابٍ ليسَ يبْقى** وصِل بعُرَى الغَبوقِ عُرَى الصَّبوحِ

- "ভালো-মন্দের নীতিবাক্য তুচ্ছ জেনে কামনার দুর্দান্ত ঘোড়ায় চড়ে আমি ছুটেছি;
- শীতের যে রাতে বীণার তারে বিশুদ্ধ সূর ঝংকৃত হয় সে রাতই আমার কাছে মধুরতম;
- আর যে গায়িকা বিনোদন স্পট 'যিতুলুহ' এর তাঁবুতে আমার মর্জিমাফিক গান গেয়ে শুনায়;
- দু'দিনের এ যৌবন মনের মতো ভোগ করে নাও। সকাল ও সন্ধ্যায় মদের আসর একাকার করে দাও।"

অপর দিকে দ্বিতীয় জীবন ধারার স্বার্থক কবি আবুল 'আতাহিয়ার কবিতায় ছিল ভোগমুক্ত জীবনের উদাত্ত আহ্বান। তিনি বলেন:

رغيف خبز يابس ** تأكله في زاويه

وكوز ماء بارد ** تشربه من صافيه

وغرفة ضيقة ** نفسك فيها خاليه

أو مسجد بمعزل ** عن الورى في ناحيه

تدرس فيه دفتراً ** مستنداً بساريه

معتبراً بمن مضى ** من القرون الخاليه

"ঘরের কোণে বসে খাবে শুকনো রুটি, আর সুরাহী (কলসী) থেকে শীতল পানি। সংকীর্ণ কুঠুরীতে নির্জন সময় যাপন করবে। কিংবা লোকালয় থেকে দূরে কোন মসজিদের থামে হেলান দিয়ে কিতাবের পাতায় ডুবে থাকবে এবং বিগত লোকদের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।"

---

৩২ ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২২।

তিনি আরো বলেন:

خير من الساعات في ** في‌ء القصور العاليه

تعقبها عقوبة ** تصلى بنار حاميه

فهذه وصيتي ** مخبرة بحاليه

طوبى لمن يسمعها ** تلك لعمري كافيه

فاسمع لنصح مشفق ** يدعى أبا العتاهيه

“এ তোমার জন্য শানদার বালাখানার ছায়ায় সময় কাটানোর চেয়ে উত্তম। কেননা সে জীবনের পরিণামে ভয়ংকর আগুনে তোমাকে ঝলসানো হবে। এ-ই আমার যথার্থ উপদেশ। সৌভাগ্য তার, সে তা গ্রহণ করবে। জীবনের শপথ! এ উপদেশই যথেষ্ট। আবুল ‘আতাহিয়া নামের এই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর উপদেশ মেনে চলো ভাই।”

আবুল আতাহিয়ার সমকালীন সাহিত্যে ত্যাগ ও ভোগ এই প্রধান বিপরীত জীবন ধারার সর্বোত্তম প্রতিফলন দেখা যায়। একদিকে বাশ্‌শার ও আবু নুয়াসদের মদ ও নারী নির্ভর কাব্য। অন্যদিকে ত্যাগবাদী জীবন ধারার প্রতিফলন ঘটেছে মৃত্যু, আখিরাত, ত্যাগী পুরুষদের জীবন, কর্ম ও বাণী বিষয়ক কাব্য রচনায়।

কবির মৃত্যু

আবুল ‘আতাহিয়া খলিফা মামুনের রাজত্বকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ববর্তী সময়কালীন তিনি বন্ধুদের সংসর্গ ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হন এবং কিছুকাল পরেই রোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পদধ্বনি শ্রবণ করে তিনি আত্মসমর্পণের সুরে বার বার আবৃত্তি করতে থাকেন:

إلهي لا تعذبني فإني ** مقر بالذي قد كان مني

ومالي حيلة إلا رجائي ** وعفوك إن عفوت وحسن ظني

فكم من زلة لي في البرايا ** وأنت علي ذو فضل ومن

إذا فكرت في ندمي عليها ** عضضت أناملي وقرعت سني

“হে আমার ইলাহ! আমাকে শাস্তি দিওনা, আমার থেকে যা কিছু হয়েছে (পাপকার্য) তা আমি স্বীকার করছি;

তোমার ক্ষমার প্রত্যাশা ব্যতীত আমি নিরুপায়, আমার সেই শুভ প্রত্যাশা মাফিক তুমি মোরে ক্ষমা কর;

কতবার পাপ-প্রলোভনের পথে আমার পদস্খলন হয়েছে; তবুও তুমি আমাকে দয়া ও অনুগ্রহ করেছ;

যখন আমি আমার পাপের লজ্জার কথা চিন্তা করি, তখন আমি দন্ত দ্বারা অঙ্গুলি কর্তন করি ও দন্ত ঘর্ষণ করতে থাকি।"

উপরোক্ত কবিতায় কবির সরল স্বীকারোক্তি ও অমায়িক ক্ষমাপ্রার্থনা প্রস্ফুটিত হয়েছে। মানুষ যত পাপই সংঘটিত হোকনা কেন, আল্লাহ বড় মেহেরবান ও করুণাময়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ক্ষমা থেকে কখনো নিরাশ করেন না। তার দরবার ছাড়া মানুষের আর কোনই পথ নেই। কবি তাঁর কবিতায় সে কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবুল 'আতাহিয়ার মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। তাঁর ছেলে মুহাম্মদের মতে তিনি ২১১ হিজরি ৮২৫/২৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।[৩৩] তবে অনেকের মতে, তিনি প্রায় আশি বৎসর বয়সে খলিফা মামুনের রাজত্বকালে ইন্তিকাল করেন। বাগদাদের পশ্চিম উপকণ্ঠে তাঁকে দাফন করা হয়। কবর ফলকে অংকিত করার জন্য তাঁর রচিত কবিতার শেষ পংক্তি হল-

ليس زاد سوى التقى ** فخذى منه أو دعى

"পূণ্যের ন্যায় কোনো পাথেয় নেই, তা অর্জন কর, নচেৎ দূর হও।"[৩৪]

স্বভাব-চরিত্র

আবুল 'আতাহিয়া সুশ্রী ছিলেন। গায়ের রঙ ছিল গৌরবর্ণ। মাথায় ছিল কালো কুচকুচে কুঞ্চিত কেশরাজি। তিনি ছিলেন আড়ম্বরপূর্ণ ও মার্জিত রুচির অধিকারী, ব্যবহারে ছিলেন অমায়িক। তাঁর ভাষা ছিল সুমধুর। উচ্চ অথবা নিম্ন আওয়াজ নয়, মধ্যম আওয়াজে কথা বলতেন। তিনি হাসি-তামাশা পছন্দ করতেন। সদা থাকতেন হাস্যোজ্জ্বল, তাঁর হাসি-খুশি থাকাটাকে অনেকে যুহদ কবিতা রচনাকারী ব্যক্তির সাথে বেমানান মনে করতেন। কবি আবুল আতাহিয়া ছিলেন সাদা মনের অধিকারী এক দিব্য পুরুষ। তিনি তাঁর দোষ-ত্রুটি অপকটে স্বীকার করে নিতেন। তিনি কিছুটা কৃপণ প্রকৃতির ছিলেন, জীবন পরিচালনায় ক্ষেত্রে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন- এজন্য কেউ কেউ তাঁর ভীষণ সমালোচনা করেছেন।

---

৩৩ আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী (মিসর: দারুল কুতুব, তা.বি.), পৃ. ১২১৬-১৭।

৩৪ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

জনৈক কবি বলেন:[৩৫]

ما اقبح التزهيد من شاعر ** يزهد الناس ولا يزهد

"কোন কবির যুহদের ভান করাটা কতই না খারাপ! অন্য মানুষকে যুহদের কথা বলে অথচ নিজে যাহেদ হয় না।"

কবি আবুল 'আতাহিয়া গরীবের বন্ধু ছিলেন। সমকালীন রাজন্যবর্গের রাষ্ট্রীয় সম্পদের সিংহভাগ খলিফার প্রাসাদ, আমীর-উমরাদের বালাখানায় এবং উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্তাদের ভবনে ব্যয় হতো। সম্পদ বণ্টনে সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য ছিল আকাশ-পাতাল। অপরদিকে সমাজের নিম্নশ্রেণি অর্থ্যাৎ সর্বহারাদের নিত্যসঙ্গী ছিল দারিদ্র্যের অভিশাপ এবং জঠর জ্বালা। বাগদাদ ও অন্যান্য শহর ছিল বিত্তবানদের স্বপ্নের শহর। কেননা বিলাসী জীবনের সব উপায়-উপকরণ তাদের জন্য সহজলভ্য ছিল। কিন্তু অভাবী ও গরীবদের জন্য বাগদাদ ছিল রুদ্ধদ্বার এক অন্ধকার নগরী। সেখানে জীবন ধারণ করা কিংবা টিকে থাকা তাদের জন্য ছিল অসম্ভব। এজন্য কবি আবুল 'আতাহিয়া এরূপ অন্যায়, সীমাহীন অনাচার ও পাপাচারের কারণে এসবের প্রতি বিরূপ ছিলেন। ইরাকের সম্পদ প্রাচুর্য এবং খারাজলব্ধ অর্থ জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিত্তবানদের জন্য সহনীয় হলেও গরীব জনসাধারণের জন্য তা ছিল একান্ত নৈরাশ্যজনক। ফরিয়াদের ভাষায় কবি আবুল 'আতাহিয়া এ অবস্থার সুন্দর ও নিখুঁত চিত্র এঁকে বলেন[৩৬]:

من مبلغ عني الإمام ** نصائح متوالية
إني أرى الاسعار أسعار ** الرعية غالية
وأرى المكاسب نزرة ** وارى الضرورة فاشية
وأرى هموم الدهر ** رائحة تمر وغادية
وأرى المراضع فيه عن أولادها متجافية
وأرى اليتامى والأرامل ** في البيوت الخالية
من بين راج لم يزل ** يسمو إليك وراجية
يشكون مجهدة بأصوات** ضعاف عالية
يرجون رفدك كي يروا ** مما لقوه العافية

---

৩৫ ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২; উমর ফররুখ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, খ. ২, পৃ. ১৯২।

৩৬ আবুল 'আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১৮।

من يرتجى في الناس ** غيرك للعيون الباكية

من مصبيات جوع ** تمسي وتصبح طاوية

من يرتجى لدفع كرب ** ملمة هي ماهية

من للبطون الجائعات ** وللجسوم العارية

يابن الخلائف لا فقدت** ولا عدمت العافية

إن الأصول الطيبات ** لها فروع زاكية

ألقيت أخبارا إليك ** من الرعية شافية

- "খলিফার দরবারে আমার এ পুঞ্জীভূত ফরিয়াদ কে পৌঁছে দেবে?
- গরীব জনসাধারণকে আমি দেখেছি অগ্নি-মূল্যের অসহায় শিকার;
- দেখেছি মানুষের আয়ের পথ সীমিত অথচ প্রয়োজন বেশুমার;
- দেখছি; রাজ্যের দুঃখ-বেদনা সকাল সন্ধ্যা তাদের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে;
- ইয়াতিম বিধবাদের আমি দেখেছি শূন্য ঘরে বসে আছে;
- আশা ভরা চোখে আপনারই দিকে তাকিয়ে আছে এই ভাগ্যাহত নর-নারীর দল;
- দুর্বল কণ্ঠে সর্বশক্তি ঢেলে ওরা দুর্বিসহ জীবনের ফরিয়াদ জানাচ্ছে;
- আপনার মহান করুণায় ওরা দুঃখ বেদনার পরিবর্তে সুখ-শান্তি দেখার প্রত্যাশী;
- সকাল-সন্ধ্যা অভাব-অনাহারে বিপর্যস্ত মানুষগুলো অশ্রু সজল চোখে আপনাকে ছাড়া আর কার দিকে তাকাবে?
- ঘূর্ণায়মান মহাদুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কি অন্য কারো প্রত্যাশা করা যেতে পারে?
- অন্নহীন ও বস্ত্রহীন এই নগ্ন কংকালদের বাঁচাতে পারে এমন আর কে আছে বলুন?
- মহান খলিফাদের হে মহান উত্তরসুরি, প্রার্থনা করি আপনি চির সুস্থ থাকুন;
- উত্তমকাণ্ড থেকে উত্তম শাখা অংকুরিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!
- দুঃখী মানুষের বেদনার কাহিনী সবিস্তারে নিবেদন করে আমি ভার মুক্ত হলাম।"

কবি শেষ জীবনে নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতাকে বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন। তাওবা ইস্তিগফার আর ইবাদাতের মধ্যেই তিনি সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁর শেষ জীবনের কবিতাগুলোতে ছিল পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা স্বরূপ। সে সময়কার যুহদ কবিতাসমূহে কবির গভীর ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। জীবন সায়াহ্নে কবি সংসারের

যাবতীয় ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়ে যান। কবি এ ব্যাপারে বলেন: [৩৭]

تجرد من الدنيا فإنك إنما ** سقطت إلي الدنيا و أنت مجرد

"সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত হও (নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন কর), তুমি একাকীই এ পার্থিব সংসারে পতিত হয়েছ।"

আবুল আতাহিয়ার ধর্মদর্শন

আবুল আতাহিয়ার কাব্যদর্শন ও তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যে বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিতার বৃহদাংশ ধর্মীয় তপস্যা, উপদেশ ও পরকালীন পরিণতিকে উপজীব্য করে রচিত। তবে কাব্য-দর্শনের সাথে কবির ব্যক্তি চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। জনৈক কবি তাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: [৩৮]

ما اقبح التزهيد في واعظ ** يزهِّدُ الناس ولا يزهدُ

"কোন কবির যুহদের ভান করা কতইনা খারাপ! লোকদেরকে যুহদের কথা বলে নিজে যাহিদ হয়না।"

কবি আবুল 'আতাহিয়া কৃপণতা ও কৃপণদের সমালোচনা করে কাব্য রচনা করলেও সম্পদ আহরণে কবি উদগ্রীব ছিলেন এবং অর্জিত সম্পদ নিজ পরিবারের জন্য খরচ করার ক্ষেত্রে ব্যয়-সঙ্কোচন করতেন। দুনিয়া-প্রীতি ও লালসা হতে মানুষকে দূরে থাকার আহ্বান করতেন; অথচ অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে নিজে খলিফা ও শাসকগোষ্ঠীর পেছনে ছুটতেন।[৩৯] একদিকে ধর্মীয় তপস্যার দিকে মানুষকে আহ্বান অপরদিকে কৃপণতা ও সম্পদাসক্তি, এরূপ দ্বিচারিতার কারণে অনেক সমালোচক কবি আবুল আতাহিয়ার ধর্মনিষ্ঠা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[৪০] তবে অধিকাংশের মতে, কবি আবুল 'আতাহিয়া দারিদ্র্যপ্রেমী ছিলেন। তিনি একজন যাহিদ হিসেবে দারিদ্র্যকে ভালোবেসেছেন আর এজন্যই দরিদ্রের মতো জীবন কাটাতেই তিনি পছন্দ করতেন। দরিদ্র ব্যক্তির মূল্যায়নে তিনি বলেন: [৪১]

إذا أَرَدتَ شَريفَ الناسِ كُلَّهُمُ ** فَانظُر إِلى مَلِكٍ في زِيِّ مَسكينِ

"যদি শ্রেষ্ঠ মানুষকে দেখতে চাও তাহলে কাঙালবেশী রাজাধিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।"

---

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

৩৮ উমর ফররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২; আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৩৯ দীওয়ানু আবিল আতাহিয়া, সম্পাদনা গারীদ আশ-শায়খ (বৈরুত: মু'আসসাতু আল-'আলামী, ১৯৯৯খ্রি.), ভূমিকা, পৃ. ৫।

৪০ ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাচীন আরবী কবিতা ইতিহাস ও সংকলন (চট্টগ্রাম: আহমদিয়া প্রকাশনী, ২০১৯), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬১০।

৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮

কবি আরো বলেন:

نعم الفراشُ الأرضُ فاقنع به ** وكُنْ عن الشّرِ قصيرَ الخُطا

ما أكرم الصبر وما أحسن ** الصِّدْقَ وما أزينه بالفتى

“কী সুন্দর এই শ্যামলভূমির গালিচা! এতেই সন্তুষ্ট থাক। পাপের পথ হতে পদক্ষেপ সংবরণ কর। ধৈর্য অতি মাধুর্যময়; সত্য অতি মনোরম এবং যে কোন তরুণের জন্য এটা শ্রেষ্ঠ ভূষণ।” তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রয়োজনের বেশি সম্পদ কল্যাণ বয়ে আনেনা বরং দুর্ভোগই বাড়ায়। কবি বলেছেন : [৪২]

لَمّا حَصَلتُ عَلى القَناعَةِ لَم أَزَل ** مَلِكاً يَرى الإِكثارَ كَالإِقلالِ

“অর্জনের পর আমি এমন এক রাজ্যে প্রবেশ করি যেই স্থানে প্রাচুর্যকে দারিদ্র্যতুল্য দুর্ভোগ গণ্য করা হয়।”

কবি নিজে ছিলেন মিতব্যয়ী আর এসম্পর্কে অন্যদের উপদেশও তিনি দিয়েছেন। মূলত: তিনি অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।

সমালোচকদের অনেকে কবি আবুল ‘আতাহিয়াকে মুতাযিলী দর্শনের লোক, আবার অনেকে জরোস্ট্রিয়ান বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচ্যবিদ গোল্ডজিয়ার কবিকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আখ্যায়িত করেছেন। গোল্ডজিয়ারের মতে-যেহেতু আবুল ‘আতাহিয়ার কবিতার মধ্যে কখনো কখনো এমন কথা পাওয়া যেত যা ইসলামী আকীদার খেলাফ বলে বিবেচিত হতো এ কারণেই তাঁকে আটক করা হয়েছিল। এ ধরণের কথা তাঁর কবিতায় পাওয়ার কারণ হলো তিনি দ্বীনি শিক্ষার সুযোগ পাননি।[৪৩] তবে কবির কর্মজীবন ও কাব্য ভাণ্ডার পর্যালোচনা করলে উপর্যুক্ত মতামত ও দাবি সমর্থিত হয় না। উপরন্তু কবির যুহদকেন্দ্রিক কবিতাগুলো মানব পরিণতি ও জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা এবং মহান আল্লাহর প্রতি একান্ত আকুতি যে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তা বহু মুমিনের কান্নার উদ্রেক ও হেদায়াতের পাথেয় বৈকি।

---

৪২ আবুল আতাহিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩০।

৪৩ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ানু আবুল আতাহিয়া, সম্পাদনায়, মাজীদ তারাদ (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-‘আরবী, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ১২-১৩।

যিন্দিকতার অভিযোগ

আবুল 'আতাহিয়ার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার দরুন অনেক সমালোচক তাঁর প্রতি যিন্দিকতার[৪৪]ও অভিযোগ তুলেছিল। অবশ্য তৎকালে বিরোধী পক্ষকে জব্দ করার সহজতম পন্থা ছিল তাঁকে যিন্দিক হওয়ার অপবাদ দেওয়া। এ সময় যিন্দিকতার ধুয়া তুলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে খিলাফতের কর্ণধাররা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করে নিতেন। অথচ এর নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণ সক্রিয় ছিল।[৪৫] ফলে তাঁর বিরুদ্ধেও অধার্মিকতার অভিযোগ আনা হয়। কবি তাঁর কবিতায় বলেছেন[৪৬]:

كأن عتابة من حسنها ** دمية قس فتنت قسها

يا رب لو أنسيتنيها بما ** في جنة الفردوس لم أنسها

"রূপে অনন্যা আত্তাবা যেন মন্দিরের দেবী মূর্তি, ভক্ত পূজারীকে রূপের যাদুতে যে করেছে মুগ্ধ। প্রভু! ফিরদাউস জান্নাতের হুর-গিলমানেও যদি আমাকে ভুলাতে চাও, আত্তাবাকে আমি ভুলবো না।" অন্যত্র তিনি বলেন[৪৭]:

إن المليك رآك أحسـ ** ـن خلقه ورأى جمالك

فحذا بقدرة نفسه ** حور الجنان على مثالك

"বিধাতার চোখেও তুমি সৃষ্টি-অনন্যা। তিনিও মুগ্ধ হলেন তোমার অপরূপরূপে। তাই তোমার আদলে, তোমার রূপের পরশ নিয়ে জান্নাতের হুর তৈরি করলেন।"

মজার ব্যাপার হলো, কবিতায় মৃত্যু প্রসঙ্গ এনেও তিনি বিপাকে পড়েছিলেন। অভিযোগে বলা হয়, তাঁর কাব্যে মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথা আছে, কিন্তু কিয়ামত ও বিচার দিবসের উল্লেখ

---

৪৪ যিন্দীক-যিন্দীক একটি ধর্মদ্রোহী শক্তি। যিন্দিক বলতে সেই দলকে বুঝায়, যারা ইসলামের মৌল আক্বিদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা করে। অনেকের মতে, এরা প্রকাশ্যে ইসলামকে স্বীকার করে এবং অন্তরে কুফরী পোষণ করে। ইসলামী আইনশাস্ত্রে এ পরিভাষাও বিকৃত বিশ্বাসপূর্ণ বিদ'আতী মতবাদের জন্য ব্যবহৃত হয়, যার শিক্ষা ধর্ম ও ইসলামী খিলাফতের পক্ষে বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচিত। কুরআন ও সুন্নাহর বিকৃত ও ভুল ব্যাখ্যাকারীরদের উপরও এ যিন্দীক কথাটি আরোপিত হয় এবং বিদ'আতপন্থী ও নাস্তিকদের ক্ষেত্রেও যিন্দিক কথাটি আরোপিত। ইসলামী বিধান মতে যিন্দীক-এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আব্বাসী যুগে কবি বাশশার ইবন বুরদ ও সালিহ ইবনু আবদুল কুদ্দুস যিন্দীক হওয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। (দ্র. ড. ওমর ইবনে হাসান, আল ওয়াদ'উ ফিল হাদীস (বৈরুত: মাকতাবাতু গায্যালী, ১৯৮১খ্রি.), খ.১, পৃ. ৮৮; ড. সৈয়দ শাহ এমরান, ইসলামী পরিভাষা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪৩৯হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৭১৬।)

৪৫ ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯।

৪৬ ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৪।

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-৪৫।

নেই। তখন খলিফা হারুনুর রশিদ তাঁকে কবিতা রচনা পরিত্যাগ করার জন্য বন্দি করেন। তখন তিনি এ নিম্নোক্ত এ কবিতা রচনা করেন:[৪৮]

تذكر أمين الله حقي وحمتي ** وما كنت توليني تذكر

ليالى تدني منك بالقرب مجلس ** ووجهك من ما البشاشة يقطر

"হে রশিদ! আমার অধিকার এবং সম্মানের প্রতি লক্ষ্য কর, আর তোমার সে অনুকম্পা ও মর্যাদার কথা লক্ষ্য কর যা তুমি আমার প্রতি করছ। সম্ভবত তুমি আমার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত রয়েছ, সে রাতগুলোর কথা স্মরণ কর যখন তুমি আমাকে তোমার অতিসন্নিকটে স্থান দিতে, তোমার প্রতি আমার প্রশংসামূলক কবিতা রচনার কারণে। খুশিতে তোমার সদানন্দ মুখাবয়বে হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্লতা প্রকাশ পেত।"

কবি তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদের দিকে ইঙ্গিত করে লিখেন:

فسد الناس وصاروا ان راوا ** صالحا في الدين قالوا مبتدع

"মানুষ কলুষিত হয়ে পড়েছে; কাজেই কাউকে নিষ্ঠাবান দেখলেই তাকে অধর্মের অপবাদ দিয়ে থাকে।[৪৯]

কবির বেশিরভাগ কবিতাই ইসলামী দর্শন, কিয়ামত ও পরকাল সম্বন্ধে। যেমন:

لدوا للموت وابنوا للخراب ** فكلكم يصير إلى تباب

"মৃত্যুর জন্যই বংশ বৃদ্ধি, ধ্বংসের জন্যই অট্টালিকা নির্মাণ। সকলকেই একদা বিনাশের পথে যেতে হবে।"[৫০]

سَأَسأَلُ عَن أُمورٍ كُنتُ فيها ** فَما عُذري هُناكَ وَما جَوابي

بِأَيِّ حُجَّةٍ أَحتَجُّ يَومَ الحِسابِ** إِذا دعيتُ إِلى الحِسابِ

"এখানে এসে কী কী করেছি সে বিষয়ে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে তখন কি ওজর পেশ করবো আর কি উত্তরইবা দিব? কিয়ামতের দিন যখন আমার হিসাব দেওয়ার জন্য ডাকা হবে তখন কী যুক্তি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করবো?"[৫১]

একবার আবুল 'আতাহিয়া নুশজানবাসী খালীল ইবন আসাদের নিকট গিয়ে বলেন, লোকে আমাকে অধার্মিকতার অপবাদ দেয়, অথচ আমার ধর্ম সত্য সনাতন তাওহীদ। খালীল

---

৪৮ আহমদ হাসান, যায়্যাত, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪।

৪৯ আবুল আতাহিয়া, দিওয়ান (বৈরুত: ১৯০৯খ্রি.), ৩য় সং, পৃ. ১৫৩।

৫০ দিওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৫১ দিওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

বলেন, তাহলে এমন কিছু বলুন যা দ্বারা লোকের অভিযোগ খণ্ডন করা যায়। আবুল ‘আতাহিয়া বলেন: [৫২]

ألاّ إنّنا كلّنا بائد ** وأي بني آدمٍ, خالد

وبدؤهمُ كان من ربّهم ** وكلّ إلى ربّه عائد

فيا عجبا! كيف يعصى الإله؟! ** أم كيف يجحده الجاحد؟!

ولله في كلّ تحريكة ** علينا وتسكينة شاهد

وفي كلّ شيء له آية ** تدل على أنّه واحد

“আমাদের সকলকে যেতে হবে। কোন আদম সন্তান অমর নয়; তাদের শুরু বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট থেকে এবং সকলকেই তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে।”

আশ্চর্য! লোকে কিভাবে আল্লাহর অবাধ্য হয়! কিভাবেই বা অবিশ্বাসীগণ তাঁকে অস্বীকার করে?”

প্রত্যেক গতি ও স্পন্দন এবং নিরব নিস্তব্ধতা ও নিথরতায়ই যে সর্বদা আল্লাহর সাক্ষ্য রয়েছে;

প্রত্যেক বস্তুতেই তাঁর নিদর্শন আছে যা সাক্ষ্য দেয় যে তিনি একক ও অদ্বিতীয়।”

আরবী সাহিত্য সমালোচক নিকলসন এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন-কবির কাব্যে এমন কিছু নেই যাতে কোন মুসলমানের মতে আঘাত লাগতে পারে।”[৫৩]

উপর্যুক্ত কবিতা থেকে এটা বুঝা যায় যে, আবুল ‘আতাহিয়া তাওহীদবাদী কবি ছিলেন। তিনি ছিলেন পাক্কা-ঈমানদার, আল্লাহর একত্ব, কিয়ামত ও পরকালে সম্পূর্ণ আস্থাবান। আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা, একত্ববাদ, স্রষ্টার প্রশংসা, তাওবা, অনুতাপ, রাসূল (স.)-এর প্রতি ভালোবাসা, সম্মান, প্রশংসা এবং দুনিয়া বিমুখ কবিতা রচনার মাধ্যমে ধর্মভীরু একজন মুত্তাকী যাহেদ মানুষ হিসেবেই আমরা তাঁকে পাই। প্রারম্ভিক জীবনে কবি যৌবনের উন্মাদনায় ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন, চিন্তাভারাক্রান্ত ছিলেন। ধর্মীয় নানা বন্ধন হতে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন এবং ধর্মকে সমালোচনা দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন। পরবর্তীকালে

---

৫২ আবুল ‘আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৫৩ R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, ibid, p. 297.

কবির মধ্যে বোধ ফিরে আসে। এক পর্যায়ে তিনি দুনিয়া ত্যাগি ধর্ম-নিষ্ঠ হয়ে মরমী কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।[৫৪]

কবি আবুল 'আতাহিয়ার বিরুদ্ধে কৃপণতার অভিযোগও করা হয়। কিন্তু তাঁর কাব্য পর্যালোচনা করলে তা ভুল প্রমাণিত হয়। তিনি পুন: পুন: তাঁর কাব্যে অল্পে তুষ্টি, সন্তোষ বা ক্বানা'আতের প্রশংসা করেছেন। একই ব্যক্তি যুগপৎভাবে কৃপণ ও অল্পেতুষ্ট হতে পারে না। লোভ ও কৃপণতা অভেদ্য অথচ তা আত্মতৃপ্তি ও সন্তোষের সম্পূর্ণ বিপরীত। কবিকে তাঁর কাব্যের মাধ্যমে বিবেচনা করতে হবে।[৫৫] কারণ কবিতাই তাঁর হৃদয়পটের দর্শন।

আবুল 'আতাহিয়ার রচনাবলী

আবুল আতাহিয়ার রচনা-প্রাচুর্য এত অধিক যে, তার পূর্ণ সংকলন সম্ভব হয়নি। বাস্তবিক অর্থেই তাঁর রচনা এত বেশি যে, তা একত্র করা প্রায় অসম্ভব। বিশেষত: হঠাৎ তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে থাকতেন, যা অল্প লোকই স্মরণ রাখতে পারতো। কিতাবুল আগানীতে রয়েছে যে, বাশ্শার আল-বুরদ ও আবুল আতাহিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ 'স্বভাব কবি'। অতি প্রাচুর্যের কারণে এযাবত কেউ তাঁদের সমুদয় রচনা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি।[৫৬]

আবুল আতাহিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর কবিতার কতকাংশ 'দীওয়ানে-আবিল আতাহিয়া[৫৭] নামে সংগৃহীত হয়। স্পেনের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইবন্ আবদিল বার (মৃ. ৪৬৩হি./১০৭১খ্রি.)[৫৮] শুধু তাঁর 'যুহদিয়াত' কবিতাসমূহের (زهديات) একটি সংকলন 'আল-আনওয়ারুল যাহিয়্যাহ ফী দীওয়ানে আবিল আতাহিয়া' নামে প্রস্তুত করেছেন। এটি ১৮৮৬ খ্রি. এবং পরে ১৯১৪ খ্রি. লেবাননের রাজধানী বৈরুত থেকে এটি প্রকাশিত হয়। এর সংকলকগণ কাব্যগ্রন্থটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অংশে কেবল যুহদিয়াত সম্পর্কিত কবিতাসমূহ এবং দ্বিতীয় অংশে অন্যান্য বিষয়ে রচিত কবিতাসমূহ সংকলিত

---

৫৪ জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬৯।

৫৫ আবদুল হক ফরিদী, আরব কবি 'আবুল আতাহিয়া, মাসিক মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮৫।

৫৬ ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, খ. ৩, প্রাগুক্ত পৃ. ১২২; আবদুল হক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫।

৫৭ দীওয়ান আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ-কাব্য সংকলন, তথ্য-পুস্তক, বিবরণী, দফতর, বিভাগ ইত্যাদি। পরিভাষায় কোনো কবির একক কবিতাসমগ্র তথা কাব্যসমষ্টি কিংবা একই গোত্র বা গোষ্ঠীর কয়েকজন কবির কাব্য-সংগ্রহকে দীওয়ান (Public Register) বলে। (দ্র. আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১)

৫৮ মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবন আবদিল বার ৩৬৮হি./৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের কর্ডোভাতে জন্মগ্রহণ করেন।। বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ইস্তিয়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব'-এর রচয়িতা। (দ্র. www.islamweb.net.)

হয়েছে। আর উক্ত সংকলনে কবির কবিতাসমূহ ক্বাফিয়া বা ছন্দের ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।[৫৯]

করম আল-বুস্তানী কর্তৃক সম্পাদিত আবুল 'আতাহিয়ার দীওয়ানের আরেকটি সংকলন ১৪০৬হিজরি/১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'দীওয়ান আবিল-আতাহিয়া' নামে প্রকাশিত হয়, এটিতে ৫১১ পৃষ্ঠা রয়েছে।

কবি আবুল আতাহিয়া মুখে মুখে অনেক কবিতা রচনা করেছেন যা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর বন্ধু ইবরাহীম আল-মাওসিলী তাঁর অনেক কবিতায় সুরারোপ করেন এবং তা বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে গীত হয়। কবি আবুল আতাহিয়া ও তাঁর কনিষ্ঠতর সমসাময়িক কবি আবদুল হামিদই প্রথম 'মুযদাবিজ' (مزدوج) অর্থাৎ দুই শ্লোকে অন্ত্যমিলযুক্ত পদ্য রচনা করেছেন। আলমা'আররীর মতে, আবুল আতাহিয়াই সর্বপ্রথম মুদ্বারি' (مضارع) ছন্দ আবিষ্কার করেন। এছাড়া আটটি দীর্ঘ শব্দাংশ বিশিষ্ট (Syllables) ছন্দও তিনি ব্যবহার করেছিলেন।[৬০]

আধুনিক যুগের কবিতা সংগ্রাহক আবুল 'আতাহিয়ার দীওয়ানের ভূমিকায় লিখেন: "কাব্যের মনোরঞ্জক ও চিন্তবিনোদক শক্তি উপলব্ধি করে আমি কয়েকখানা ভালো কাব্য পুস্তক প্রকাশ করার সংকল্প করি। এ উদ্দেশ্যে আমি অনেকগুলি দীওয়ান[৬১] অধ্যয়ন করি। কিন্তু পবিত্র ভাব, মার্জিত রুচি, সরল ভাষা ও মধুর ছন্দের দিক দিয়ে আবুল 'আতাহিয়ার দীওয়ানই আমার নিকট শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়েছে।[৬২]

কবিতার বিষয়বস্তু

আবুল আতাহিয়ার কবিতায় যুহদ বেশি পরিমাণে থাকলেও অন্যান্য বিষয়েও তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তিনি ধর্মনিষ্ঠা, মৃত্যু, সন্তোষ, কালের কুটিলগতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। প্রথম জীবনে আবুল 'আতাহিয়া বাগদাদে গমন করে খলিফাদের প্রশংসা কীর্তন করে আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করেন। তিনি গযল বা প্রেমের কবিতাও রচনা

---

৫৯ Encyclopaedia of Islam, 2nd Editon, Leiden, p. 108.

৬০ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১১।

৬১ কোন কবির একক এবং নিজস্ব রচনাকে দীওয়ান বলা হয়। পক্ষান্তরে বিভিন্ন কবিদের সংকলিত কাব্যগ্রন্থকে 'মুখতারাত' বলা হয়। (দ্র. আল-মুজামুল ওয়াসীত (মিসর: মাকতাবাতুস শুরুকুদ, দাওলিয়্যাহ, ২০০৮খ্রি.), স.৪, পৃ. ৩১৬)

৬২ দীওয়ান, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

করেছেন। খলিফা মাহদীর দাসী 'উতবার প্রেমে পড়ে তিনি অনেক প্রণয়গীতিও রচনা করেন।[৬৩] প্রেয়সী উৎবাকে নিয়ে রচিত সেসব কবিতা মানোত্তীর্ণও হয়েছে। শৈশব থেকে কবি দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছেন কালের কুটিলতা, দুঃখ-যন্ত্রণা আর মিথ্যার বাগাড়ম্বর। তার সাথে যুক্ত হয়েছে বিরহ-বেদনা ও প্রেয়সীকে হারানোর অসহ্য যন্ত্রণা। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি কবি হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। শাসক ও অভিজাত শ্রেণির আস্ফালন ও ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে ভোগ-বিলাস থেকে বিমুখ করেছে। চিরন্তন ও অনিবার্য মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের বিভীষিকা কবি হৃদয়কে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে। কবির উপলব্ধি মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকটই মানব জাতির শেষ প্রত্যাবর্তন। ফলে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জন করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। উপর্যুক্ত বিষয় সমূহ তাঁর কাব্যে আলোচিত হয়েছে। এসব বিষয়কে মোটা দাগে যুহদিয়াত বলা চলে। অর্থাৎ কবির গযল বিষয়ক কবিতা বাদ দিলে আর যেসব বিষয়ের উপর তিনি কবিতা লিখেছেন সেগুলো অবশ্যই মরমী কবিতার আওতাভূক্ত। আবুল 'আতাহিয়ার কবিতার বিষয়বস্তুতে দেখা যায় যে, তাঁর কাব্যে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সর্ব বিষয়ের বর্ণনা, জীবনধারণের সুন্দর রূপরেখা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ইতিহাস, জীবন সায়াহ্নের ভাবনা ও চিন্তা, আশা-নিরাশার সুর ধ্বনি ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কবি যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আবহমান কাল ধরে বয়ে আসা প্রাচীন সাহিত্যের বিষয় সমূহ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নতুন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। এক পর্যায়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে কম রস পূর্ণ যুহদ কবিতা দিয়েই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিরল প্রতিভা, নিরলস সাধনা ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

আবুল 'আতাহিয়ার غزل(প্রেমোদ্দীপক বা প্রণয়)[৬৪] বিষয়ক কবিতা, مدح (প্রশংসা)[৬৫] মূলক কবিতা, مرثية (শোকগাঁথা)[৬৬] মূলক কবিতা ও هجاء (ব্যঙ্গ)[৬৭] কবিতার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো:

---

৬৩ আহমদ হাসান আয-যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

৬৪ গযল বা প্রেমোদ্দীপক কবিতা বলা হয়- যে কবিতার মাধ্যমে কবি তাঁর প্রেয়সীর স্মৃতিচারণ করে থাকেন তাকে غزل বা প্রেমগাঁথা বলে। (দ্র. মুখতার আলী ইবন মুহাম্মদ আলী, আত-তাওহীদাত (দেওবন্দ: কুতুবখানা এমদাদিয়া, তা.বি., পৃ. ৫; আয-যাওযানী, শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'য়ি (বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৯১খ্রি.), পৃ. ২৯-৩০)

৬৫ مدح বা প্রশংসামূলক কবিতা হলো- কোন মর্যাদাবান ব্যক্তির উত্তম গুণ উল্লেখ করে কবিতা রচনা করা। যেমন, বুদ্ধি, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং বীরত্বের কথা উল্লেখ করা কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে গঠনপ্রকৃতির প্রশংসা করা। বাংলায়

গযল বা প্রণয়মূলক কাব্য

কবি আবুল 'আতাহিয়া জীবনের প্রারম্ভে বাগদাদে খলিফা মাহদির দরবারে থাকাবস্থায় দাসী উতবার প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। উতবার প্রেমাসক্ত হয়ে তিনি যেসব কবিতা রচনা করেছেন সেগুলো তাঁর শ্রেষ্ঠতম প্রণয়মূলক কাব্য হিসেবে স্বীকৃত। উতবা ছিল খলিফা মাহদির স্ত্রী বাইতা বিনতে সাফ্ফার ক্রীতদাসী। উতবা যদি আবুল 'আতাহিয়াকে অপছন্দ না করতো তাহলে খলিফা কবির কাছে তাকে সমর্পন করতে প্রস্তুত ছিলেন। কারণ, কবি উতবার রূপ-গুণ নিয়ে এত বেশি গযল ও প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করেন, যা খলিফাকে বিমোহিত এবং প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। উতবার অনীহার কারণে খলিফা এক পর্যায়ে বেশ কিছু অর্থ-সম্পদ দিয়ে কবিকে ভুলাতে চেয়েছিলেন।[৬৮]

কুফায় অবস্থানকালেও কবি সু'দা (سعدى) নাম্নী এক নারীর প্রেমাসক্ত হয়ে কতিপয় প্রণয়মূলক কবিতা রচনা করেন। সে নারী তার মনিবের কাছে অভিযোগ দিলে, মনিব তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু উতবার প্রতি আবুল 'আতাহিয়ার ভালোবাসা ছিল নিখাঁদ। এক্ষেত্রে তাঁর আবেগ, অনুভূতি, উচ্ছ্বাস, বেদনা তাঁর প্রণয়মূলক কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতাই যেন তাঁর ভগ্ন হৃদয়ের ক্ষত ও যন্ত্রণার এক স্ফটিকদর্পণ মাত্র। তিনি উতবার স্মরণে গযল কবিতা আবৃত্তি করেন:[৬৯]

عينى على عتبة منلهة ** بدمعها المنسكب السائل

كأنها من حسنها درة ** أخرجها اليم إلى الساحل

"আমার চক্ষু উতবার বিরহে অশ্রু প্রবাহিত করে চলেছে। তার সৌন্দর্য মনে হয় যেন উজ্জ্বল মণি-মুক্তার ন্যায়, যা সমুদ্র তার উপকূলে সদ্য উদগীরণ করে রেখেছে।"

এ ধরনের প্রসত্তিসূচক কবিতাকে 'স্তোত্র' বলা হয়। (দ্র. আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ৪১; সুরভি বন্দোপাধ্যায়, সাহিত্যের শব্দার্থকোশ (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০,১৯৯খ্রি.), পৃ. ১০৯)

৬৬ যে কবিতায় মৃত ব্যক্তির গুণাগুণ, তার ঘটনাবহুল জীবনের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা করা হয়- তাকে رثاء বা শোকগাঁথা বলা হয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ডার্জ' (Dirge)। আর শোককবিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'এলিজি' (Elegy)। সুদীর্ঘ লিরিক কবিতা, যাতে গুরুগম্ভীর সুরে ও গম্ভীর বিষয়ে কোন ব্যক্তির মৃত্যুশোক বর্ণনা করা হয়। (দ্র. আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত,, পৃ. ১৫০; সুরভি বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫)

৬৭ هجاء ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা কুৎসামূলক কবিতা হলো- কবিতার মাধ্যমে কোনো লোকের বা কোনো বংশের দোষ বর্ণনা করা এবং তাদের সৎ ও উত্তম গুণাবলী অস্বীকার করা। নিন্দা কাব্যকে বাংলায় ব্যঙ্গকাব্য বলে। এ ধরনের কবিতায় কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমাজের দুর্বলতা ও দোষত্রুটি ব্যঙ্গ ও শ্লেষের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। (দ্র. সুরভি বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯)

৬৮ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৩খ্রি.), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৬৮।

৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

প্রশংসামূলক কবিতা

আবুল 'আতাহিয়া তাঁর প্রশংসামূলক কবিতা রচনায় পূর্ববর্তীদের অনুকরণ করেছেন। এতে প্রাচীন রীতির লয়, তাল ও ছন্দ ফুটে উঠেছে। তিনি পুরনো রীতির প্রচলিত ধারাকে আকর্ষণীয় মোড়কে উপস্থাপনে পারঙ্গম ছিলেন; যাতে প্রশংসিতের হৃদয় বিগলিত হয়ে যেত। সরল, সহজ ও সাবলীল মধুর ছান্দসিক উপস্থাপনা যে কাউকেই সম্মোহিত করতো। যেমন, খলিফা মাহদীর সিংহাসনে অভিষেক উপলক্ষে রচিত প্রশস্তিগাঁথায় কবি বলেন:

أتته الخلافة منقادة ** إليه تجرر أذيالها

ولم تك تصلح إلا له ** ولم يك يصلح إلا لها

ولو رامها أحد غيره ** لزلزت الأرض زلزالها

"খিলাফত তাঁর কাছে স্বীয় আঁচল গুটিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেই ধরা দিয়েছে;
খিলাফতের এই মসনদের একমাত্র যোগ্য তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নয়;
যদি খিলাফতের এই সম্মাননা তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্য ভাবা হয়, তবে তা হবে ভূতলের জন্য এক ভয়াবহ ভূমিকম্প সদৃশ।"

কবি 'আমর ইবনুল 'আলা-এর ক্ষেত্রেও তাঁর অনবদ্য স্তুতিগীতি খুবই প্রনিধানযোগ্য:

إِنِّيْ أَمِنْتُ مِنَ الزَّمَانِ وَصَرْفِهِ ** لَمَّا عَلِقْتُ مِنَ الأَمِيْرِ حِبَالاَ

لَوْ يَسْتَطِيعُ النَّاسُ مِنْ إِجْلاَلِهِ ** تَخِذُوا لَهُ حُرَّ الخُدُوْدِ نِعَالاَ

"আমি কালচক্র ও এর উত্থান-পতন থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করছি
যেহেতু মহান আমিরের পক্ষ থেকে আমার জন্য রয়েছে নিরাপত্তা রজ্জুর নিশ্চয়তা।
যদি মানুষ তাঁর যথাযথ সম্মান দানে সমর্থ হতো
তবে মুক্তমনা ভদ্রজনরা তাঁর পাদুকা পরিয়ে দিত।"

এ কবিতা শুনার পর 'আমর ইবন 'আলা কবিকে সত্তর হাজার টাকা (প্রচলিত মুদ্রা) উপঢৌকন দেন এবং তাঁকে মহামূল্য খিলাত (উত্তরীয়) পরিয়ে দেন, যে সবকিছু নিয়ে কবি উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। ফলে অন্যান্য কবিরা লজ্জাবনত হয়ে পড়েন।[৭০]

---

৭০ আনিস মাকদিসী, আমিরুশ শি'র আল-আরাবী ফিল আসরিল আব্বাসী (বৈরুত: দারুল ইলম লিল-মালায়িন, ১৯৭৯খ্রি.), ১২তম সংস্করণ, পৃ. ১৫১।

নিন্দামূলক কবিতা

কারো দোষ চর্চা বা নিন্দাবাদের ক্ষেত্রে আবুল 'আতাহিয়া তেমন পারঙ্গম ছিলেন না। বরং তিনি শালীনতার সীমার মধ্যেই অসামান্য পারঙ্গমতা প্রদর্শন করতেন। তাঁর নিন্দাবাদমূলক কবিতার মধ্যে সরলতা ও নম্রতাই যেন প্রধান উপজীব্য। 'আতাহিয়া তাঁর প্রথম প্রেমিকা সু'দা-এর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস আব্দুল্লাহ ইবনে মা'আন-এর নিন্দা করতে গিয়ে তাকে শৌর্য-বীর্য, বিবেক ও পৌরুষ বিবর্জিত ব্যক্তি হিসেবে রূপায়িত করে বলেন:

أنا فتاة الحى من وائل ** في الشرف الشامخ والنبل
ما في بني شيبان أهل الحجى ** جارية واحدة مثلي
قد نقطت في وجهها نقطة ** مخافة العين من الحكل

"আমি ওয়ায়েল গোত্রের শীর্ষস্থানীয় এক বনেদি যুবক। বনূ শায়বান গোত্রে আমার যোগ্য বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন তরুণী নেই। আমি বদনজরের ভয়ে তার গণ্ড দেশে সুরমা দিয়ে কালো তিলক অঙ্কিত করে দিয়েছি।"

কবি ওয়ালিবাহ বিন হুবাব নিজেকে 'আরব' দাবী করতো, তাকে তিরস্কার করে আবুল আতাহিয়া বলেন:

أَوالِبُ أَنتَ في العَرَبِ ** كَمِثلِ الشَيصِ في الرُطَبِ
هَلُمَّ إِلى الموالي الصي ** دِ في سَعَةٍ وَفي رَحَبِ
فَأَنتَ بِنا لَعَمرُ اللَه ** أَشبَهُ مِنكَ بِالعَرَبِ

"ওয়ালিবা, আরব সমাজে তুমি উমদা খেজুরের মাঝে রদ্দি খেজুরের মতই অপাংক্তেয়। সুতরাং আজমীদের মাঝেই ফিরে এসো ভালো কদর পাবে। তাছাড়া মুখের আদলে আরবদের চেয়ে আমাদের সাথেই তো তোমার মিল বেশী।[৭১]

কবিতার বৈশিষ্ট্য

আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে আবুল 'আতাহিয়া অনন্য সাধারণ সৃজনশীল ও সর্বজনবিদিত কবি, যাঁকে উচ্চশিক্ষিত পাঠক থেকে শুরু করে নিরক্ষর বেদুঈন নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে চিনে এবং তাঁর কবিতা পাঠ করে থাকে। সহজ ভাষা, হ্রস্ব ছন্দ,সরল, অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক লিখনভঙ্গী তাঁকে সমকালীন আরবী সাহিত্য জগতে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ মার্গে পৌঁছে দেয়। আরবী কবিতার প্রাচীনধারা থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। জাহেলী নমুনার মৌল

---

৭১ ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪খ্রি.), খ.১, পৃ. ৩৩।

আরবীয় সংস্কৃতির উপর খুব একটা দখল ছিল না বিধায় তাঁর কবিতায় একেবারে সহজ-সরল ও অতি পরিচিত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। তাঁর কবিতা আপন বৈশিষ্ট্যের কারণে পাঠক সমাজে সর্বাপেক্ষা সমাদৃত। তাঁর কবিতার ভাষা সহজ হওয়ার কারণ হলো, তিনি কবিতার মাধ্যমে উপদেশ ও যুহদের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। যুহদ বিষয়ে লিখতে গিয়ে তার কাব্যে নান্দনিকতার ক্ষতি হয়নি। আর উপদেশমূলক কবিতার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ যেন সর্বসাধারণ তা বুঝতে সক্ষম হয়। এ কারণেই তিনি তাঁর কবিতাকে অত্যন্ত সহজ ও মর্মস্পর্শী করে রচনা করেছেন। কবির সহজ-সরল, অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক লিখন ভঙ্গি সর্বত্র প্রশংসনীয়। তাঁর বিস্তৃত খ্যাতি ও উচ্চাসনের মূলে রয়েছে, তাঁর সহজবোধ্য ভাষা ও চিত্তাকর্ষক ছন্দ। সর্বোপরি তাঁর উচ্চচিন্তার (high thought) দার্শনিক ভাবগাম্ভীর্য। তাঁর ভাবধারা অনাবিল জলস্রোতের ন্যায় সহজবোধ্য এবং ভাষার শ্রেষ্ঠ শব্দ-সম্পদ দ্বারা গ্রথিত। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন যে, কাব্যের সৌন্দর্যহানি না করেও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা যায়।[৭২] ছন্দের আকুলতায় কখনোই তাঁকে দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতে অথবা ভাবকে সংকুচিত করতে হয়নি। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর এতদূর অধিকার ছিল যে, তিনি অনায়াসে পদ্যে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। এমন কি হঠাৎ রচিত তাঁর কতগুলি পদ্য আছে, যা তাঁর অন্যান্য রচনার সাথে বিশেষভাবে স্থান পাবার যোগ্য। তিনি বলতেন যে, لو شئت أن أجعل كلامي كله شعرا لفعلت 'ইচ্ছা করলে আমি সর্বদা পদ্যে কথা বলতে পারি।[৭৩]

আবুল 'আতাহিয়া প্রচলিত আরবী ছন্দশাস্ত্রকে উপেক্ষা করে অনেক সময় কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু কঠোর সমালোচককেও স্বীকার করতে হয়েছে, কাব্য হিসাবে এ সমস্ত রচনার সৌন্দর্য অপূর্ব। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো- আপনি ছন্দশাস্ত্র (علم العروض)[৭৪] জানেন কি? জবাবে তিনি বলেন: انا اكبر من العروض "আমি ছন্দের ঊর্ধ্বে"।[৭৫]

---

৭২ R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (London, 1923), p. 299

৭৩ Clement Huart, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৭৫।

৭৪ আরবী অলংকারশাস্ত্রের যে অংশ পাঠ করলে আরবী কবিতার ছন্দ-প্রকরণ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকেই علم العروض বা ছন্দবিদ্যা বলে। (দ্র. শায়খ নাসিফ আল-ইয়াজিযি আল-লুবনানী, মাজমুউল আদাব ফি ফুনুনূল আরব (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল আমেরিকানিয়্যা, ১৯৩২খ্রি.), পৃ. ১৭৯; সাইয়্যেদ মুহাম্মদ দামনুহুর, আল-মুখতাছির শাফি আলা মতনুল কাফি (মিসর: মাতবা'আতু মুস্তফা বাবিল হালবি, ১৯৩৬খ্রি.), পৃ. ৩; M. Ziaul Huq, The principles of Arabic Rhetoric and prosody (Calcultta: Islamia Art Press ltd., 1930 AD), p. 62)

৭৫ আবুল 'আতাহিয়া, দীওয়ান (বৈরুত: ১৯০৯ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭।

বহু রচনার মধ্যে আবুল 'আতাহিয়ার রচনা সহজেই বেছে নেয়া যায়। অনাবিল ভাবধারা ও সাবলীল ভাষা দ্বারাই তার পার্থক্য নির্ণীত হয়। মরু কাব্যের বাগাড়ম্বরকে তিনি সম্পূর্ণ পরিহার করে চলতেন। কারণ নাগরিক সভ্যতা ও পরিবেশ তাঁর দৃষ্টিতে শুধু অবাস্তব কৃত্রিমতার আস্ফালন মাত্র।[৭৬] যেমন, তিনি বলেন-

اشد الجهاد جهاد الهوى** وما كرم المرء الا التقي

"প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই কঠিনতম জিহাদ এবং সাধুতাই মানুষকে সম্মানিত করে।"[৭৭]

কী সরল ও মনোরম ভাবধারা! অথচ এতে একটি চিরন্তন সত্য নিহিত আছে।[৭৮] এরকম কৃত্রিমতা বিবর্জিত ও সহজ-সরল ভাষা তিনি কবিতায় ব্যবহার করতেন। পবিত্র ভাবধারা, মার্জিত রুচি, সরল ভাষা ও মধুর ছন্দের দিক দিয়ে আবুল 'আতাহিয়া আরব কবিদের শ্রেষ্ঠ কবি বা ছন্দের যাদুকর।

আবুল আতাহিয়ার কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আধুনিক কাব্য সংগ্রাহক তাঁর দীওয়ানের ভূমিকায় লিখেন: "কবিতা মানব জীবন ও দৈনন্দিন সত্যসমূহের মনোরম অভিব্যক্তি, মানুষের ভাব-চিন্তা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার একটি সুন্দর প্রকাশ। মানবের গহীন অনুভূতি কবির ছন্দে মূর্ত হয়ে ধরা দেয়। তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ইতিহাস তাঁর বাঁশির সূরে অনুরণিত হয়। এই কষ্টিপাথরে যদি আবুল 'আতাহিয়ার কাব্য বিচার করা হয়, তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি একজন উঁচুমার্গের কবি। আরব-আজমে তাঁকে যে সমাদর ও সম্মান দেওয়া হয়েছে তিনি তার প্রকৃত অধিকারী।" [৭৯]

আবুল আতাহিয়ার কবিতা প্রাচীন কঠোর নিয়মকানুনের বন্ধনমুক্ত। কবি আতাহিয়ার রচনায় এই সরলীকরণ প্রবণতা তাঁর কবিতাকে কাঠামোগতভাবে যেমন দুর্বল করেছে তেমনি পুনরাবৃত্তিবহুল ও চর্বিত চর্বনদোষে সমালোচিত করেছে। এজন্য অনেক আরবী সাহিত্য সমালোচক তাঁর কবিতার সমালোচনা করেছেন।

---

৭৬ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫খ্রি.), খ. ২, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১০৯।

৭৭ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৭৮ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, প্রাগুক্ত, ১০৯।

৭৯ দীওয়ান, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

এ প্রসঙ্গে আল-আসমা'ঈ তাঁর কাব্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন-

شعر أبي العتاهية كساحة الملوك يقع فيها الجوهر، والذهب، والتراب، والخزف، والنوى

"আবুল 'আতাহিয়ার কবিতা হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর উন্মুক্ত দরবারের মত যেখানে মুনিমুক্তা, সোনা, মাটি, মৃৎপাত্র, শস্যদানা সবকিছুই সমর্পিত হয়।"[৮০]

আবুল 'আতাহিয়াকে আরবী সাহিত্যের প্রথম 'দার্শনিক কবি' বলে আখ্যায়িত করা হয়।[৮১] তাঁর কবিতা দার্শনিক ভাবাপন্ন হলেও তাঁর কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, মতাদর্শ ও ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে অনেক আলোচনা বিদ্যমান। কাজেই তাঁর কাব্য সহজেই মানবহৃদয় স্পর্শ করে। সরল, অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক লিখনভঙ্গির সাথে তিনি যে উচ্চদার্শনিক ভাবধারা যুক্ত করেছেন, যা কবিতায় সচরাচর চোখে পড়ে না। ক্লাসিক্যাল আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই দেখিয়েছেন, কাব্যের সৌন্দর্যহানি না করেও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে একজন কবির পক্ষে স্বার্থক কাব্য রচনা সম্ভব।[৮২]

সমালোচকদের মতে, আবুল 'আতাহিয়া স্বভাবজাত কবি হওয়ার দরূন তিনি স্বভাবগতভাবে কবিতা রচনা করতেন। একে পৃথক শিল্পকর্ম হিসেবে নেননি। যার কারণে তাঁর অনেক কবিতা অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধিবদ্ধ ছন্দের আওতায় পড়ে না।[৮৩]

আরবী সাহিত্য যখন নগরজীবন, ভোগ-বিলাস, ভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত জ্ঞান প্রভাবিত করল। আরবী কবিতায় যখন খমরিয়্যাত, নারী, বালক ইত্যাদি যাবতীয় অশ্লীল বিষয় যোগ হল। তখন এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসেন কবি আবুল আতাহিয়া। আবুল 'আতাহিয়ার কবিতায় তরুণ পাঠকগণ চিত্ত-বিনোদন পাবে না। হয়তো নিরাশ হয়ে বলে উঠবে যে, এ কেমন কবি যার কাব্যে প্রেমের গান, বিরহের জ্বালা, রমনীর রূপ-সৌন্দর্য ও কামনা ইত্যাদির উল্লেখ নেই। কিন্তু বৈধ-অবৈধ প্রেমের চিত্রাঙ্কন, প্রাকৃতিক ও নারী সৌন্দর্যের বর্ণনা, প্রিয়ার মিলনের সুখ ও বিরহের দুঃখ বর্ণনাই যদি শুধু কবিতা বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহলে অবশ্য আবুল 'আতাহিয়াকে ভালো কবি বলা চলে না। কিন্তু প্রকৃত কবিতা এরূপ সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নয়। বরং এটা প্রশস্ততর, উচ্চতর ও মহত্তর। এটা মানব জীবন ও দৈনন্দিন সত্য

---

৮০ আবুল 'আতাহিয়া, দীওয়ান, গারীদ আশ-শায়খ সম্পাদনা (বৈরুত: মু'আসসাতু আল-আ'মালী, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ৬।

৮১ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৮২ R.A. Nicholson, Literary History of the Arabs, ibid, p. 298-299.

৮৩ ইবন কুতাইবা, আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা, খ. ২, পৃ. ৭৯১।

সমূহের মনোরম অভিব্যক্তি, মানুষের ভাব, চিন্তা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার একটি সুন্দর ও নির্মল বহিঃপ্রকাশ। মানবের সুপ্ত অনুভূতি কবির ছন্দে মূর্ত হয়ে ধরা দেয়। তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ইতিহাস তাঁর বাঁশির সূরে প্রকাশ পায়। এভাবে যদি আমরা আবুল 'আতাহিয়ার কাব্য বিচার-বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ কবি। এজন্যই প্রাচ্য-প্রতীচ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।[৮৪]

পরিশেষে বলা যায় যে, কবি আবুল 'আতাহিয়া ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি। ছন্দের যাদুকরিতে তিনি ছিলেন সর্বাধিক প্রত্যুপন্নমতি ও দ্রুততম সময়ে কবিতা রচনায় পারদর্শী। কবিদের জন্য সদুপদেশ ও দুনিয়া বিমুখতার দ্বার উন্মোচনকারী। পার্থিব প্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষার কবচ হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম জ্ঞানগর্ভ কবিতা রচনা করেন। আব্বাসীয় অশ্লীলতা, ভোগবাদ, বস্তুবাদী মন ও মনন, অবক্ষয় ও অধপতনের যুগে মানুষকে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী এবং ইসলামের সুমহান নৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

---

৮৪ আবদুল হক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

তৃতীয় অধ্যায়
কবি আবু নুয়াসের জীবন পরিক্রমা

আরবী সাহিত্যের আব্বাসীয় প্রথম যুগের ধুমকেতু মহাদিকপাল কবি আবু নুয়াস। সাহিত্য সমালোচকগণের মতে আবু নুয়াস আধুনিক ভাবধারার কবিদের প্রতিনিধি। প্রাথমিক জীবনে অর্থাভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে না পারলেও স্বীয় প্রতিভাবলে এবং স্বভাবজাত কবি হিসেবে কবিতার প্রতিটি শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। নিম্নে আবু নুয়াসের জীবন ও বর্ণাঢ্য কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো:

জন্ম ও শৈশবকাল

আবু 'আলী আল-হাসান ইবন হানী আল-হাকামী আব্বাসীয় যুগের খ্যাতনামা আরবী কবি। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম হলো-আবু 'আলী। কবির পিতা আল-জার্‌রাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-হাকামী-এর মাওলা (মুক্তদাস) ছিলেন। তাই কবির নামের সাথে 'আল-হাকামী' যুক্ত হয়েছে। তিনি 'আবু নুয়াস' উপনামেই বেশী প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, তাঁর প্রিয় বন্ধু খালফ আল-আহমার কবিকে ইয়ামানের রাজবংশ 'যু-নুয়াস (ذو نواس)'-এর নামানুসারে 'আবু নুয়াস' নামকরণ করেন। এরপর কবির প্রথম পারিবারিক নাম 'আবু 'আলী' ঢাকা পড়ে এবং দ্বিতীয় নামেই তিনি সাহিত্যজগতে বিশেষ পরিচিত হন। তিনি ১৪৫হি./৭৫৭খ্রি. সনে খুরাসানের আল-আহওয়ায[১] পল্লীতে আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর মানসুর (১৫৮হি./৭৭৫খ্রি.)-এর সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।[২] আবু নুয়াসের জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।[৩] তবে এতে সবাই একমত যে, তাঁর পিতা শেষ উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয়

---

১ আহওয়ায (اهواز/Ahvaz) ইরানের খুজিস্তান প্রদেশের রাজধানী এবং পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষ উষ্ণ তাপমাত্রার শহর। এটি কারুন নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ইরানের প্রাচীনতম স্থান। ইরাকের বসরা প্রদেশের কাছাকাছি অবস্থিত। (দ্র. www.wikipedia.org./wiki/Ahvaz)

২ মুহাম্মদ আব্দুল মুনঈম খাফাজী, আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা ফিল 'আসরিল আব্বাসী (ইস্কানদারিয়্যা, দারুল ওফা, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪১; আনিস আল্-মাকদিসী, উমারা-উল-শি'র আল্ আরাবী ফী-আল্ 'আসর আল-'আব্বাসী (বৈরুত: দার্ আল ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১০৪; Philip F. Kennedy, Abu Nuwas A Genius of Poetry (England: Oneworld Publications, 2005), p. 1.

৩ ইতিহাসবিদদের মতে তিনি ১৩০হি./৭৪৭খ্রি.- ১৪৫হি./৭৬২ খ্রি.-এর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান নিয়েও মতান্তর রয়েছে। অনেকের মতে ইরানের আহওয়ায নামক পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আবার অনেকের মতে তিনি খুজিস্তান বা বসরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (দ্র. আবু হাফ্‌ফান 'আবদুল্লাহ বিন আহমদ মাহযুমী, আখবার আবি নুয়াস (মিসর: মাকতাবাতু মিসর, তা.বি.), পৃ. ১০৮-১০৯; আবুল আব্বাস 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন মু'তায, তাবাকাতুশ্ শু'আরা (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৩৯; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান (বৈরুত: দারুস সাকাফাহ, তা.বি.), পৃ. ৯৫; আবদুল কাদির বিন ওমর আল-বাগদাদী, খাজানাতুল আরাব (মিসর: হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল কুত্তাব, ১৯৭৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪৭)

মারওয়ান (৭৪৪-৭৫০খ্রি.)-এর সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা আল-জাররাহ' ইবন আবদিল্লাহ আল-হাকামীর মাওলা (মুক্তদাস) ছিলেন। আল-জাররাহ ছিলেন দক্ষিণ আরবের সাদ ইবন আশীরা গোত্রীয় এজন্যই আবু নুয়াস-এর নিসবাতি (সম্বন্ধবাচক নাম) ছিল আল-হাকামী।[৪] উত্তর আরবদের সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মাতা গুলবান ইরানি ছিলেন। আবু নুয়াস শৈশবকাল আহওয়াযেই কাটান। ২ বৎসর অথবা ৮ বৎসর বয়সে তাঁর পিতার সাথে বসরায় যান। পিতার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল যাচ্ছিল না এবং সম্ভবতঃ তার পিতা কিছুদিন পরে তথায় মারা যান। সহায়-সম্বলহীন তাঁর মাতা ছেলে-সন্তানদের নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান। তিনি তাঁর মায়ের সাথে মাতুলালয়ে আশ্রয় নেন।

শিক্ষা জীবন

কবি আহওয়াযে জন্মগ্রহণ করলেও বসরায় লালিত-পালিত হন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে তিনি জীবন ধারণকল্পে আতর বিক্রেতার চাকুরি নেন।[৫] এ সময় তিনি উপলব্ধি করেন, এ চাকুরি তাঁর উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় এবং প্রতিভা বিকাশের পথে সহায়কও নয়। সুতরাং তিনি অবসর সময়ে তৎকালে প্রচলিত নিয়ম মাফিক মসজিদে অনুষ্ঠিত শিক্ষার মজলিসে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য আসরেও তাঁর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।[৬] এ সব মজলিসে কবিতার রাভী, সীরাত ও ইতিহাস বিশারদ এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে স্ব-স্ব বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন। আবু নুয়াস এ সব বিষয় গভীরভাবে আত্মস্থ করেন। ক্রমে তাঁর জ্ঞানের পরিমণ্ডল বিস্তৃত হতে থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেক সময় তিনি পুরো রাত এদের সাথে আড্ডা দিয়ে কাটাতেন। এক সময় এসব আড্ডাবাজ বন্ধুদের প্রভাবে তিনি মাদকাসক্ত ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়েন। এ গড্ডালিকা প্রবাহ তাঁকে বেশী দূর এগুতে দেয়নি।

ওয়ালিবা ইবনুল হুবাব (মৃ. ১৭০হি./৭৮৬খ্রি.) নামক এ ব্যক্তির নিকট তিনি প্রথম লেখাপড়া শুরু করেন।[৭] কাব্য চর্চার দিকে তাঁর আকর্ষণ বাড়তে থাকলে তিনি বসরা ছেড়ে কুফায় কবি

---

৪ আহমদ হাসান আয-যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

৫ জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৬ খ্রি.), ১ম সং, খ. ১, পৃ. ৬৩।

৬ আহমদ আল-'ইস্কান্দারী ও মোস্তফা 'আনানী, আল-ওয়াসীত ফিল আদাবিল 'আরবী ওয়া তারীখিহী (বৈরুত: দারু ইহইয়াইল উলুম, ১৯৯৪খ্রি.), ১৮শ সং, পৃ. ২৫৭; আহমদ আয-যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

৭ ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১১৩।

ওয়ালিবা ইবন হুবাবের (والبه بن حباب) সাহচর্যে যাওয়ার চিন্তা করতে থাকেন। ঘটনাচক্রে একদিন ওয়ালিবা নিজেই আতরের দোকানে এসে হাজির হন। আর পরিচয় হওয়ার পর তিনি তাঁর চেহারায় প্রতিভার ছাপ লক্ষ্য করেন। আবু নুয়াস তাঁর পরিচয় লাভ করে তাঁর সাথে কুফা যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন আবু নুয়াসের বয়স ত্রিশ বছর। এ সময় তাঁর সামনে উন্মোচিত হয় এক নব দিগন্ত। এখান থেকে শুরু হয় তাঁর জীবনের আরেকটি অধ্যায়। এভাবে আবু নুয়াস তার দীক্ষাগুরু ওয়ালিবার সাথে কুফায় চলে যান এবং সেখানকার কাব্য মজলিসে নিয়মিত যোগদান করতে শুরু করেন। এখানকার কবিগণ মদ্যপান ও আড্ডা জমিয়ে কাব্য মজলিসকে মুখরিত করে রাখত এবং প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের কাব্যকর্মের আলোচনা ও বিষয় ভিত্তিক কবিতা পাঠের আসর বসাত। গল্প ও হাস্য কৌতুকপ্রদ বিষয় থেকে শুরু করে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যন্ত তাদের আলোচনার বিষয়ে পরিণত হত। খারিজী মতবাদের উত্থান, খিলাফতের বিরুদ্ধে খারিজীদের অবস্থান, যিন্দীক, আরব জাতীয়তাবাদ ও পারসিক চিন্তাধারার উত্থান সম্পর্কেও এ আসরসমূহে আলোচনা-পর্যালোচনা হত। এসব বিষয় আবু নুয়াসের কাব্য চর্চায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। এর মাধ্যমে তিনি সমালোচনা, কাব্য রচনার বিভিন্ন কৌশল এবং বিভিন্ন কবিদের অনুসৃত পন্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। মূলতঃ এ সময়েই তাঁর কাব্য রচনার সূচনা হয়। তিনি 'ওয়ালিবার' সাথে প্রথমে কুফায় আসেন। তারপর উভয়ই বাগদাদে এবং তার সাথে বিভিন্ন সমাবেশে যেখানে কবি এবং সাহিত্যিকগণ রাতে কবিতার মাধ্যমে একে অপরের সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করত এবং মদ্য পান করত, সেখানে উপস্থিত হতেন। এতে করে তিনি ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

কিছুদিন পর কবি ওয়ালিবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বনু আসাদ গোত্রের এক কাফেলার সাথে মরু অঞ্চলে চলে যান এবং সেখানকার জীবন প্রণালী, কাব্যচর্চা ও জীবনবোধ গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেন। ভালোভাবে আরবী ভাষা আয়ত্বে আনার জন্য তিনি প্রাচীন রীতি অনুযায়ী কিছুদিন মরুভূমিতে কাটান এবং অল্পদিনে আরবী ভাষার ওপর অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরবর্তীতে এ সব বিষয় তাঁর কাব্য চর্চার মূল উপাদানে পরিণত হয়। এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত করার পর আবু নুয়াস বসরার বিশিষ্ট কবি খলফ আল-আহমরের (মৃ. ৮০০ খ্রি.) সান্নিধ্যে চলে যান। এখানে এসে তিনি কাব্যচর্চার নতুন নতুন পদ্ধতির সাথে

পরিচিত হন। এ সময় খলফ আল-আহমর তাঁকে প্রাচীন আরব কবিদের 'ক্বসায়িদ'[৮] ও 'রজয'[৯] সমূহ আত্মস্থ করার পরামর্শ দেন। খলফ আল-আহমর সময় সময় কাব্যচর্চায় তার যোগ্যতা অর্জনের পরীক্ষা নেন। একদা কাব্যচর্চায় আবু নুয়াসের যোগ্যতা নিরূপণ করার নিমিত্তে খলফ আল-আহমর তাঁকে বললেন-'আমার জীবদ্দশায় তুমি আমার উপর একটি শোকগাঁথা রচনা কর'। আবু নুয়াস আরবী 'ফা' বর্ণের অন্ত্যমিল সম্পন্ন ১৯ পংক্তি বিশিষ্ট একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। উক্ত শোকগাঁথার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ:[১০]

لما رأيت المنون آخذة ** كل شديد ، وكل ذى ضعف

بت أعزى الفؤاد عن خلف ** وبات دمعى إن لا يفض يكف

أنسى الرزايا ميت فجعت به ** أمسى رهين التراب فى جدف

"যখন আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, মৃত্যু প্রত্যেক সবল এবং দুর্বল ব্যক্তিকে গ্রাস করে, তখন আমি খলফের জন্য আমার হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হলেও অশ্রু সংবরণ করতে ব্যর্থ হলাম। ইতোপূর্বে আমি সব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে যন্ত্রণা কাতর ছিলাম, এই মৃত সত্ত্বা তার সবকিছুই বিস্মৃত করে দিয়েছে। অনন্তর সে কবরের গহ্বরে মাটির আমানতে পরিণত হয়।" এই কবিতা শ্রবণ করে খলফ আল-আহমর অত্যন্ত খুশী হন এবং আবু নুয়াসকে কাব্যচর্চার অনুমতি দেন। এভাবে খলফেরের সান্নিধ্যে তাঁর জীবনের আরেকটি অধ্যায় অতিবাহিত হয়। এ ছাড়াও আবু নুয়াস আবু জায়েদ (মৃ.৮৬৯), আল-শাফী (মৃ. ৮২০) এবং আবু উবাইদাহ (মৃ.৮২৪) প্রমুখ সাহিত্যিকদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বিভিন্নমুখী কবিতা রচনায় পারদর্শি

---

৮ ক্বাসীদা- ক্বাসীদা আরবী কাব্যের একটি বিশেষ রূপ। ক্বাসীদার রয়েছে তিনটি স্তর। (১) কবি দয়িতার বাসভূমির বর্ণনা এবং স্মৃতিচারণের পরিপ্রেক্ষিতে দয়িতার জন্য আক্ষেপ। এ অংশকে নসীব বলে। (২) প্রেমিকা কেন্দ্রিক সুখ-দুঃখ, প্রেমিকার গোত্রের প্রশংসা ও প্রাকৃতিক অবস্থার চিত্রায়ন, যা ওয়াছফ নামে পরিচিত। (৩) সাফল্য ও ব্যর্থতার উচ্ছ্বাস এবং নীতিকথা। এটি কবিতার মূল বিষয় যা মওদু হিসেবে চিহ্নিত। ক্বাসীদার প্রথম পংক্তির উভয় অংশ এবং অপরাপর পংক্তিগুলোর শেষ অংশ একই অন্ত্যমিল (قَافِيَة) সম্পন্ন হয়। এর পংক্তি সংখ্যা ন্যুনতম ১৫ এবং সর্বাধিক ১০০ বলে বর্ণিত হলেও পাঁচ শতাধিক ছত্র বিশিষ্ট ক্বাসীদার সন্ধান পাওয়া যায়।

৯ রজয-রজয আরবী কাব্যের প্রাচীন রূপ যা সহজ সরল ভাষায় রচিত। এতে অন্ত্যমিলের বালাই না থাকলেও কবিতার অন্তর্নিহিত ছন্দের প্রাবল্য বিদ্যমান। রজয অনেকটা হিজা কাব্য ধর্মী। তবে পার্থক্য এই যে, এর মাধ্যমে আরব কবিগণ স্বপক্ষীয় সৈন্যদেরকে নিজেদের শৌর্যবীর্যের বর্ণনা দ্বারা উৎসাহিত করতেন। সাথে সাথে প্রতিপক্ষীয়দের যশ-খ্যাতির বর্ণনা দিয়ে তাদেরকে ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

১০ আবু নুয়াস, দীওয়ান আবি নুয়াস আল-হাসান ইবন হানী (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-আরবী, ১৯৮২), পৃ. ৫৭৫

হয়ে উঠেন। আবু নুয়াস কুরআনের হাফেয ছিলেন এবং কুরআন ও হাদিসে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।[১১]

কর্মজীবন

কবি আবু নুয়াস আবদুল ওহাব আল-ছাক্বাফী[১২] পরিবারের জিনান (جنان) নাম্নী এক ষোড়শীর প্রেমে পড়েন। তাকে প্রেম নিবেদন করে কবি সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন ও গভীর অর্থবহ দীর্ঘ পংক্তিমালা অনুকরণহীন রচনা করেন। তাঁর এ সব কবিতায় প্রেমিক হৃদয়ের আকুলতা ও অস্থির চিত্তের বর্ণনা এবং প্রেমের দহনে প্রেমিক হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত শিখা চিত্রায়নের সাথে সাথে তিনি প্রেয়সীর রূপ-লাবণ্য ও তার সাথে ঘনিষ্ঠতার বর্ণনা বিবৃত করেন। কবি জিনানের রূপের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন[১৩]-

تمت ، وتم الحسن في وجهها ** فكل شيء ما خلاها محال

للناس في الشهر هلال، ولى ** في وجهها كل صباح هلال

"সে পরিপূর্ণ একজন রমনী, তার চেহারার সৌন্দর্যের আভা পূর্ণভাবে বিকশিত। এ চেহারা ব্যতীত অন্য কারো চেহারায় সৌন্দর্যের অবস্থান মানানসই নয়। মানুষের জন্য প্রতি মাসে একবার হেলাল বা নয়া চাঁদ উদিত হয়, আর আমার জন্য রয়েছে, তার চেহারায় প্রতি সকালে একটি হেলাল।"

কবির এ সময়কার কবিতায় প্রেয়সীকে পাওয়ার যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তার চিত্তমূলে প্রচণ্ড ভাবাবেগ সৃষ্টি করে এবং তা কাব্যিক ছন্দে মূর্ত হয়। কবি বলেন:

لولا حذارى من جنان ** لخلعت عن رأسي عنانى

وركبت ما أهوى وكم ** أجفو مقالة من نهانى

"যদি জিনানকে হারানোর ভয় আমার না হতো, তাহলে আমি আমার মস্তক হতে বন্ধন খুলে ফেলতাম, অর্থাৎ নির্বিঘ্নে দূর-দূরান্তে চলে যেতাম। আর আমি নিজের মনমতো বাহনে সওয়ার হতাম এবং আমাকে বারণকারীদের অনুরোধ অপেক্ষা করতাম।"

---

১১ ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখুল আদাব আল-আরাবী আল-আসরুল আব্বাসী আল-আওওয়াল (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৬খ্রি.), ১০ম সংস্করণ, পৃ. ২২১।

১২ আবদুল ওহাব আল-ছাক্বাফী (al-Wahhab ibn 'Abd al-Majid al-Thaqafi) শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের বড় স্কলার ছিলেন। (দ্র. Philip F. Kennedy, Abu Nuwas A Genius of Poetry,Ibid, p. 7)

১৩ আবু নুয়াস, দীওয়ান, আহমদ আবদুল মজিদ সম্পাদিত (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ২৮৮।

জিনানের সাথে কবির প্রেম ছিল একপক্ষীয়। তিনি জিনানের নিকট প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে জিনানের হৃদয়কে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে দেয়ার জন্য বিশ্ববিধাতার নিকট প্রার্থনা করে বলেন[১৪]:

أيا ملين الحديد ** لعبده داود

ألن فؤاد جنان ** لعاشق معمود

"হে লৌহ বিগলনকারী সত্তা যিনি স্বীয় বান্দা দাউদের জন্য লৌহকে বিগলন করেছেন। ভালবাসার ভারে ন্যুব্জ প্রেমিকের প্রতি তুমি জিনানের হৃদয়কে বিগলিত করে দাও।"

কবির এই আকুল মিনতি 'জিনান' এর হৃদয়ে কোন ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। ফলে তিনি ক্ষোভে দুঃখে বসরা ছেড়ে বাগদাদ চলে যান এবং অতীতের সকল ঘটনা প্রবাহ স্মৃতিপট হতে মুছে ফেলার চেষ্টা করেন। এ পরিস্থিতিতে কবি বাগদাদের বৈরী পরিবেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এং অতি মাত্রায় মদ্যপানের মাধ্যমে জীবন-যন্ত্রণা ভুলে থাকার চেষ্টা করে যান। এ সময় কবি মদের স্তুতি গেয়ে 'আল-খমরিয়্যাত' (মদ বিষয়ক কবিতা) রচনা করেন। 'আল-খমরিয়্যাত' কাব্যমালায় কবি মদ্যপানের কারণ, মদ্যপানের মাধ্যমে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্বেষণের রহস্য এবং এর মাধ্যমে হৃদয়ে উদ্বেলিত ভাবাবেগ নিরসনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হন। তিনি মনে করেন জীবনে সঞ্জীবনী শক্তি ফিরিয়ে আনতে মদের বিকল্প নেই।[১৫] তার মতে: لاعيش إلا المدام أشربها 'মদ পান বিহীন জীবন জীবনই নয়।'[১৬] মদ ও জীবন-যন্ত্রণা পাশাপাশি অবস্থান করে না। তার মতে মদ্যপ ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে কখনো জীবন-যন্ত্রণার তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করে না। বস্তুতঃ কবি আবু নুয়াস জীবন-যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে মদের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়েন। এর অন্তর্নিহিত কারণ ছিল জিনানের সাথে ব্যর্থ প্রেম।

কবি আবু নুয়াস ত্রিশ বৎসর বয়সে (৭৮৬ খ্রি.) প্রশংসাবাচক গীতি রচনা করে খলিফার অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে বাগদাদ গমন করেছিলেন। কিন্তু খলিফার দরবারে তেমন অনুগ্রহ লাভ করতে পারেননি। তবে বার্মাকীগণ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে। বার্মাকীদের পতনের পর তিনি মিশরে পলায়ন করেন। সেখানে তিনি রাজস্ব বিভাগের (দীওয়ানুল খারাজ) প্রধান আল-খতীব ইবন আবদিল হামিদের (মৃ.৮১৫-১৫খ্রি.) প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তিনি অবিলম্বে তাঁর প্রিয় শহর বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানকার জ্ঞানী-গুণীদের সাহচর্য লাভ করেন। স্বল্প সময়ে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি সমকালীন

---

১৪ আবু নুয়াস, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯।

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

শীর্ষস্থানীয় কবির আসনে সমাসীন হন।[১৭] আব্বাসীয় খিলাফতকালের উজ্জ্বল নক্ষত্র খলিফা হারুনুর রশিদ (১৪৬-১৯৩হি.) তাঁর সুখ্যাতি শুনে তাঁকে রাজদরবারে স্থান দেন। তিনি খলিফার দরবারে তাঁর প্রশংসাগীতি গেয়ে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হন এবং বেপরোয়া খরচ করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি খলিফার পরম বন্ধুতে পরিণত হন।

তাঁর রহস্যপ্রিয়তা, উপস্থিত বুদ্ধি ও দরবারি আদব কায়দার জন্য খলিফার সাথে তাঁর বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হয়। খলিফার দরবারে শক্ত অবস্থানের কারণে কবির স্পর্ধা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, রাজদরবারে নেতৃস্থানীয় সেনাপতি কিংবা সচিবরা গমন করলেও কবি পা লম্বা করে হেলান দিয়ে বসে থাকতেন। তাঁর মধ্যে কোনো ভাবান্তর ঘটত না।[১৮] তিনি খলিফা আল-আমীনের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবেও জীবনের উৎকৃষ্ট সময় অতিবাহিত করেন।

ধর্ম বিশ্বাস

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রারম্ভিক পর্বে যখন বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পরাণয়তা ও অনৈতিকতার সয়লাব চলছিল ঠিক তখনই কবি আবু নুয়াসের আবির্ভাব। বসরা, কুফা ও বাগদাদের প্রধান বিনোদনকেন্দ্র ও মদ্যশালাগুলোতে কবি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ফলে কবি অতিমাত্রায় মাদকাসক্ত ছিলেন।[১৯] ব্যক্তিগতভাবে তিনি ধর্মীয় কোন নির্দিষ্ট নীতির উপর স্থির ছিলেন না। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি ছিলেন শিথিল নীতির অনুসারী। ভোগ-বিলাস আস্বাদন তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি মনে করতেন, আল্লাহ উদার ক্ষমাশীল; শিরক ব্যতীত তিনি যে কোনো পাপ ক্ষমা করে দিবেন। বোধহয় এই দর্শনের ভিত্তিতে কবি শরীয়ত-নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন[২০]:

فَقُل لِمَن يَدَّعي في العِلمِ فَلسَفَةً ** حَفِظتَ شَيئاً وَغابَت عَنكَ أَشياءُ

لا تَحظُرِ العَفوَ إِن كُنتَ اِمرَأً حَرِجاً ** فَإِنَّ حَظرَكَهُ في الدينِ إِزراءُ

“যে ব্যক্তি জ্ঞানদর্শনের দাবি করে তুমি তাকে বলে দাও, ‘তুমি অল্প জেনেছো, তোমার অজানা অনেক কিছু রয়ে গেছে; আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমাকে তুমি নিষিদ্ধ করো না; কেননা এটি ধর্মে বড় অপরাধ।”

---

১৭ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

১৮ প্রাগুক্ত।

১৯ ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাচীন আরবি কবিতা : ইতিহাস ও সংকলন (চট্টগ্রাম,২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৫৮৫।

২০ আবু নুয়াস আল-হাসান ইবন্ হানী, দীওয়ানু আবী নুয়াস, আহমাদ ‘আবদুল মাজীদ আল-গাযালী সম্পাদিত (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-‘আরাবী, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৭।

একবার খলিফা আল-আমীন আবু নুওয়াসকে বললেন, তুমিতো যিন্দিক! জবাবে আবু নুওয়াস বলেন, কিভাবে আমি যিন্দিক? অথচ আমিতো স্বীকার করি:

أصلي الصلاة الخمس في حين وقتها ** وأشهد بالتوحيد لله خاضعا

وأحسن غسلا إن ركبت جنابة ** وإن جاءني المسكين لم أك مانعا

وإني وإن حانت من الكأس دعوة ** إلى بيعة الساقي أجيب مسارعا

"আমি যথাসময়ে দৈনিক পাঁচওয়াক্ত সালাত আদায় করি এবং আমি সবিনয়ে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেই। আমি যথাযথভাবে ফরয গোসল করি এবং আমার নিকট আগত নিঃস্বদের আমি বঞ্চিত করি না। আবার যখন কোন পানশালার পরিবেশনকারী মদপূর্ণ পাত্রের প্রতি আহবান জানায় তাতেও আমি তড়িৎ সাড়া দিই।"

খলিফা তাঁর কবিতা শুনে ভর্ৎসনা করে প্রথানুযায়ী কবিতার জন্য পুরস্কৃতও করলেন। উপরোক্ত কবিতায় আবু নুওয়াসেরর ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। কবি একদিকে ধর্মের প্রতি অনুরাগী থাকলেও অন্যদিকে মদ্যপান ও ভোগবিলাসের প্রতি আসক্ত ছিলেন।

আব্বাসীয় সমকালীন সমাজে যিন্দিক শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার ছিল। যিন্দিকতার অভিযোগ তুলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা ছিল সাধারণ ব্যাপার। কোন কবির কবিতা শোনা মাত্র তারা লেগে যেতো সেই সব ফ্যাকড়া খোঁজার কাজে, যেগুলোকে পুঁজি করে কবিকে যিন্দিক প্রমাণ করা যায়। বিগদ্ধ সমাজে যিন্দিক শব্দটির অর্থ ও প্রয়োগ সুনির্দিষ্ট হলেও সাধারণ সমাজে এমনকি শিথিল চরিত্রের লোকদেরও যিন্দিক বলা হতো। কবি আবু নুয়াসের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং আচরণে অস্বাভাবিকতা ছিল। কবি ভোগ-বিলাস ও স্ফূর্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে ছিলেন। মানুষকে নগ্ন বিনোদনে প্ররোচিত করেছেন; যা ক্রমান্বয়ে ধর্মদ্রোহিতার রূপ ধারণ করেছিল। আবু নুয়াসের এরকম একটি কবিতা:

فدعى الملام فقد أطعت غوايتى ** وصرفت معرفتى الى الانكار

ورأيت اقيانى اللناذة والهوى ** وتعجلا من طيب هذى الدار

أحرى وأخزم من تنظر آجل ** علمى به وجم من الأخبار

ما جائنا أحد يخبر أنه ** في جنة من مات أو في النار

"ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার রঙ্গরস যতটা সম্ভব মন ভরে ভোগ করে নিতে চাই। আন্দাজী খবরে ভরসা করে পরকালের স্বপ্ন দেখার চেয়ে এটাই বরং ভালো। কেউ কি এসে বলে গেছে যে, মরে সে জান্নাতে বা জাহান্নামে দাখিল হয়েছে?

কবি অন্য কবিতায় বলেন:

يا ناظرا في الدين ماالأمر ** لاقدر صح ولاجبر؟

ما صح عندى من جميع الذى ** قد ذكر الا الموت والقبر

"ব্যাপার কি হে ধর্ম পণ্ডিত? তকদীর-তদবীর সব মতবাদই দেখি ভুল। যত ধর্ম সমাচার শুনালে তার মাঝে কবর ও মৃত্যুই শুধু চোখে দেখলাম।"

কবি আবু নুয়াস শুধু অশ্লীল কবিতার লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। কখনো প্রকাশ্য কাজের মাধ্যমেও তাঁর ইসলামী নীতি বিরোধী কাজ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, আবু নুয়াস একবার মাগরিবের নামায পড়ছিলেন। ইমাম সাহেব যখন সূরা কাফিরুনের প্রথম আয়াত: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ পড়লেন। তিনি নামাযের মাঝেই জবাব দিলেন: لبيك 'আমি হাজির'।[২১]

কবি আবু নুয়াসের এ জাতীয় কবিতাগুলো সুস্পষ্টভাবেই ইসলাম বিরোধী। তবে তাঁর শেষ জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বাস ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে তিনি ধর্মদ্রোহিতা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। স্ফূর্তি ও ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত থাকায় এ ধরনের অসংযত কাব্যোক্তি তিনি রচনা করেছিলেন। যেমন, কবি হাম্মাদ আজরদের ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেন: "আমার ধারণা ছিল যে, তরল কাব্য চর্চার কারণেই বুঝি হাম্মাদ আজরদকে যিন্দিক অপরাধের শিকার হতে হয়েছে, কিন্তু পরে যিন্দিকদের কয়েদখানায় নিক্ষিপ্ত হয়ে দেখতে পেলাম; হাম্মাদ আজরদ তাদের 'গুরু', এমনকি তাদের সালাতেও তার 'দ্বিপংক্তি কবিতা পঠিত হয়।"[২২]

কবির উপরোক্ত মন্তব্যে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। মূলত আবু নুয়াস কবিতা রচনায় অসংযত ও বাক সর্বস্ব থাকলেও তার ঈমান ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল সচেতন আনুগত্য।

আবু নুয়াসের কবিতায় অল্পতুষ্টি নীতি পরিলক্ষিত হলেও বিলাস আস্বাদন তাঁর প্রিয় ছিল। এসব কারণে আবু নুয়াসের কাব্যে বিপরীতমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে তিনি 'আল-খমরিয়্যাত' রচনার মাধ্যমে নিজেকে মদ্যপ হিসেবে উপস্থাপন করেন অপরদিকে 'যুহদ' রচনার মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্যে গিয়ে পাপ-তাপ মোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই বিপরীতমুখী কাব্য রচনার কারণে তাকে অনেকে 'সংশয়বাদী কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করে

---

২১ Philip F. Kennedy, Abu Nuwas: A Genius of Poetry, ibid, p. 21.

২২ ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

থাকেন। তবে জাগতিক উপভোগ এবং ঐশ্বরিক আকর্ষণ মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা হতে আবু নুয়াসের মত কবিও মুক্ত নন। 'যুহদ' রচনায় আবু নুয়াস কেবল শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ক্ষান্ত হন নি বরং কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব রূপায়ন এবং হৃদয়ের গভীর অনুভূতি চিত্রায়নেও তিনি স্বীয় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যখন পার্থিব জীবন সম্পর্কে কবির মোহমুক্তি ঘটে তখন পরকালে যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে তিনি 'যুহদ' কবিতা রচনা করেন।[২৩]

কারাবরণ

আবু নুওয়াসের কয়েকবার কারাবরণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর কবিতায় তিনবার কারাবরনের কথা জানা যায়। একবার আবু নুয়াস মাদকাসক্ত হয়ে আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের চাচা সুলায়মানের বিরুদ্ধে হিজা (هجاء) কবিতাংশ আবৃত্তি করলে তাঁকে প্রথমে কারারুদ্ধ করে পরে শাস্তির জন্য রাজ দরবারে ডাকা হলে মুহূর্তের মধ্যে কবি নিম্নোক্ত প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি করলে তাঁকে উপঢৌকনসহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। কবিতাগুলো হচ্ছে:

تذكر أمين الله والعهد يذكر ** مقالي وإنشاديك والناس حضَّرُ

ونشري عليك الدرّ يا درَّ هاشم ** فيا من رأى درًا على الدر ينثر

"আমরা আল্লাহর বিশ্বস্ত বন্ধুকে মর্যাদা ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে স্মরণ করি, হে হাশিম গোত্রের মালিক আপনার উদ্দেশ্যে আমার আবৃত্তি, মানুষের সমাগম, আমার বিস্তৃতি, সব আপনারই সাফল্য।" তিনি আরো বলেন:

مضت لي شهور مذ حُبست ثلاثة ** كأني قد أذنبت ما ليس يغفر

فإن أكُ لم أذنب ففيم عقوبتي ** وإن كنت ذا ذنب فعفوك أكبر

"তিনবার বন্দি হওয়ার মাধ্যমে আমার জীবনের অনেক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, মনে হয় আমি এমন অপরাধ করেছি যা ক্ষমার অযোগ্য। আমি যদি অপরাধ না করি তাহলে কেন আমাকে বন্দি করেছো আর আমি যদি অপরাধীও হই তবে তোমার ক্ষমার দৃষ্টিতো অধিকতর মহান।"

---

২৩ কার্ল ব্রকেলম্যান, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, আবদুল হালীম আল-নাজ্জার সম্পাদিত, (কায়রো, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৭।

জীবন সায়াহ্নে এসে আব্বাসীয় খলিফা আল-আমীনের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে উৎকৃষ্ট জীবন যাপন করেন। আল-আমীন তাঁকে মদপান করতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি সে নিষেধাজ্ঞা না মানায় তাঁকে একবার কারারুদ্ধ করা হয়। অন্য এক বর্ণনা মতে, তাঁর একটি কবিতায় ধর্মদ্রোহিতার ভাব প্রকাশ পাওয়ায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।[২৪]

কবিতার বিষয়বস্তু

আবু নুয়াসের কবিতা সন্নিবেশিত করে হামঝাহ্ বিন আল-হাসান আল-আস্‌বাহানী جامع الديوان নামে গ্রন্থ রচনা করে তাঁর কবিতার মূল্যায়ন ও সমালোচনা করেছেন ৪৫০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে ১৩০০০ ছন্দ একত্রিত করে সকল কবিতা বারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় আবু নুয়াসের কবিতায় ১২টি বিষয়বস্তু বিদ্যমান ছিল।[২৫]

ক) نقائض[26] ابى نواس مع الشعراء কবিদের কবিতার প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা। কবি আবু নুয়াস কবি যুহায়রের জবাবে লিখেন:

قل لزهير إذا حدا رشدا ** أقلل أو أكثر فأنت مهذار

سخنت من شدة البرودة ** حتى صرت عندي كأنك النار

لا يعجب السامعون من صفتي ** كذلك الثلج بارد حار

"আবার যদি যুহায়র বকাঝকা করে তাহলে বলে দিও, হয় ক্ষান্ত হও-নয় যত পারো বকে বেড়াও। তুমিতো একটা মুর্খ বাচাল;

আমার জন্য তুমি হলে আগুন। তাই শীতল স্বভাব সত্ত্বেও তেতে উঠেছি;

আমার কথায় শ্রোতাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা, 'বরফওতো ঠান্ডা-গরম।"[২৭]

ইসলামে মদ হারাম বা নিষিদ্ধ হলেও তৎকালীন সময়ে ভোগবাদী একদল কবি এ হারাম নেশায় বুঁদ হয়ে যেতো। মদকে হারাম জেনে ও কবুল করেও তারা প্রকাশ্যে মাতাল সেজেছিল। কবি আবু নুয়াস মদ হারাম বলে উপদেশদানকারী কবিদের উদ্দেশ্য করে বলেন[২৮]:

---

২৪ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

২৫ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯; জি.এম. মেহেরুল্লাহ, আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য (ঢাকা: ২০১৪ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮১।

২৬ আরবী نقيضة শব্দের বহুবচন نقائض । অর্থ- বৈপরিত্য, বিরোধীতা, বিপরীত, বিরুদ্ধতা ও কুৎসা ইত্যাদি। উমাইয়া ও আব্বাসী যুগের অনেক কবি বিশেষ করে কবি জারির এবং ফারাযদাক প্রায়ই ছন্দোবদ্ধ অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দে কবি রচনা করে পরস্পর কাব্য-যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। সেটি আরবী কাব্য সাহিত্যে نقائض বা পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ কবিতা নামে পরিচিতি লাভ করে। (দ্র. ড. মোহাম্মদ সাইফুল গণি, আরবি সাহিত্য কোষ (ঢাকা: আল-ফুনুন প্রকাশনী, ২০১৬খ্রি.), পৃ. ১৩৭।

২৭ ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, খ.১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

২৮ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩।

فإنْ قالوا: حرامٌ؟ قلْ: حرامٌ! ** ولكِنّ اللّذاذَة في الحَرامِ

ألا فاسقِني خمراً، وقل لي: هيَ الخمرُ ** ولا تسقني سرّاً إذا أمكن الجهرُ

"ওরা যদি বলে (মদ) হারাম, তুমিও বলো জী হুজুর!, তবে কিনা হারাম কাজেই মজা বেশী। তাই শোন! মদ বলেই আমাকে মদ খাওয়াবে। জানান দেয়া সম্ভব হলে গোপনে খাওয়াবে কেন?"

কবি নুয়াস অন্যত্র তাঁর কবিতায় মদ পরিবেশনকারীদের কিবলার সাথে পর্যন্ত তুলনা করে বসেন[২৯]:

إذا كانت بنات الكرم شربي ** ونقلي وجهه الحسن جميل

أمنت بذين عاقبة الليالي ** وهان علي ما قال العذول

"যেহেতু আঙ্গুরবাগানের মেয়েরা আমার শরাব, আর (মদ পরিবেশনকারী) সুদর্শন কিশোররা আমার কিবলা স্বরূপ। সেজন্য আমি তাদের ওপর অন্ধকার রাতে ভরসা করি, এতে তিরস্কারকারীদের তোয়াক্কা করি না।"

(খ) المراثى শোকগাঁথা কবিতা।[৩০] 'মারাছী' রচনায় কবি আবু নুয়াসের অনুভূতি সুতীব্র। ব্যথাতুর হৃদয়ের বাস্তব অভিব্যক্তি এ সব কাব্যে পরিস্ফুট। তাঁর حلاب নামক কুকুরের সর্পদংশনে আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে বলেন[৩১]:

يا بُؤسَ كَلبي سَيِّدِ الكِلابِ ** قَد كانَ أَعناني عَنِ العُقابِ

يا عَينُ جودي لي عَلى حَلّابِ ** مَن لِلظِباءِ العُفرِ وَالذِئابِ

'হায় আমার কুকুরের কষ্ট! যে কুকুদের নেতা ছিল। যে আমাকে হিংস্রপ্রাণী থেকে রক্ষা করতো। হে চক্ষু! খাল্লাবের অবর্তমানে নেকড়ে ও হিংস্র প্রাণী থেকে রক্ষায় তুমিই আমার সাহায্যকারী।"

খ) **المديح। Ponegyrical poem প্রশংসামূলক কবিতা:** মাদ্‌হ (مدح) শব্দের অর্থ হলো প্রশংসামূলক, তারিফ, স্তুমিূলক।[৩২] জাহিলী যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রশংসামূলক কবিতা রচিত হয়ে আসছে। কবি আবু নুয়াসের অধিকাংশ 'মাদহ' কাব্য আব্বাসী খলিফা

---

২৯ Philip F. Kennedy, The Wine Song in Classical Arabic Poetry: Abu Nuwas and the Literary Tradition (Clarendon Press, 1997) 1st Edition, p. 141.

৩০ যে কবিতায় মৃত ব্যক্তির গুণাগুণ, তার ঘটনাবহুল জীবনের অংশ বিশেষ আলোচনা করা হয় তাকে رثاء বা শোকগাঁথা বলা হয়। (দ্র. আহমদ হাসান আয-যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০)

৩১ সালাহ আবদুস সাত্তার শাহাভী, **رثاء الطير والحيوان في ديوان العرب**/www.qafilah.com/ar/رثاء-الطير-والحيوان/.

৩২ ড. ফজলুর রহমান, আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৬৭৭।

হারুন আল-রশীদ (৭৮৬ খ্রি.-৮০৯ খ্রি.) ও তদীয় পুত্র আল-আমীনকে (৮০৯ খ্রি.-৮১৩ খ্রি.) কেন্দ্র করে রচিত। 'মাদহ' রচনায় তার কাব্যিক মান কিছুটা নিম্নগামী। শিল্প সৌন্দর্যের সাথে এ কাব্যে কিছুটা লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা স্থান পেয়েছে। খলিফা হারুন-উর রশীদের প্রশংসায় তিনি বলেন:

تباركَ من ساسَ الأمور بعلمه ** وفضّل هارونا على الخلفاء
نعيشُ بخير ما انطوينا على التقى ** دما ساس دنيانا أبو الأمناء
إمام يخاف الله حتى كأنه ** يؤمل لقياه صباح مساء

"মহীয়ান সেই সত্ত্বা! যিনি স্বীয় জ্ঞান-গরিমা বলে সিদ্ধান্ত নেন এবং খলিফা হারুনকে শ্রেষ্ঠত্বে আসনে সমাসীন করেছেন। যদ্যপি মোরা তাকওয়ার ওপর বহাল থাকবো এবং কল্যাণের উপরই থাকবো, কেননা সেরা আস্থাভাজনের নেতৃত্বেই আমাদের রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে। তিনি এমনই আল্লাহ ভীরু নেতা, যাঁর সান্নিধ্য সকাল-সন্ধ্যায় প্রত্যাশিত।"

কবি খলিফা আল-আমীন-এর প্রশংসা করে বলেন:

لقد قام خير الناس من بعد خيرهم ** فليس على الأيام والدهر معتب
فأضحى أمير المؤمنين محمد ** وما بعده للطالب الخير مطلب
سخر الله للأمين مطايا ** لم تسخّر لصاحب المحراب

"সেরা মানুষদের পর যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শুভাগমন হয়েছে, তাঁকে ভর্ৎসনা করার মত এ যুগে এমন কেউ নেই;

মুহাম্মদ আল-আমীন আমীরুল মুমিনীন (আব্বাসীয় খলিফা) নিযুক্ত হয়েছেন, কল্যাণ-সন্ধানীর জন্য এরপর আর কোন অনুসন্ধান স্থল নেই;

আল-আমীনের জন্য আল্লাহ তা'আলা বাহন অনুগত করে দিয়েছেন, সাহিবুল মিহরাব বা ইমামের জন্যও এমন বাহন রাখা হয়নি।"

মিশরের বাদশাহ খাসীব-এর প্রশংসায় বলেন[৩৩]:

تقولُ التي عن بيتها خفّ مرْكبي ** عزيزٌ علينا أن نَرَاكَ تَسيرُ
أما دونَ مصْرٍ للغنَى مُتَطَلّبٌ؟ ** بلى إنّ أسْباب الهوى لكثيرُ

"যখন তার ঘর থেকে আমার বাহন প্রস্থান করতে লাগল তখন সে বলতে লাগলো তোমাদের ভ্রমণ করাটা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টের। কেন মিসর ব্যতীত অন্য কোথাও কি পরিতৃপ্ত

৩৩ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০।

হওয়ার এবং ধনী হওয়ার (উপকরণ) সম্ভাবনা নেই? হ্যাঁ, মনোরঞ্জনের উপকরণ অনেক আছে, তবে তা মিশরের মত নয়।"

গ) العتاب: ভর্ৎসনামূলক কবিতা বা দোষ প্রকাশমূলক কবিতা।[৩৪] কবি আবু নুয়াস আল-মুফাদ্দাল ইবন সাবাবাহ এর কৃপণতার নিন্দা করে বলেন:[৩৫]

صبحت أجوع خلق الله كلهم ** وأفزع الناس من خبز إذا وضعا

خبز المفضل مكتوب عليه ألا ** لا بارك الله في ضيف إذا شبعا

"আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে আমি অধিক ক্ষুধার্ত, আর মুফাদ্দালের হাতে যখন রুটি প্রদেয় হলো তা মানুষের জন্য শঙ্কার কারণ, মুফাদ্দালের রুটি তার জন্যই বরাদ্দকৃত। তিনি পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তার আতিথেয়তার কাজে লাগাবেন না। (অর্থ্যাৎ তার সম্পদ দিয়ে কেউ পরিতৃপ্ত হবে না এবং মানুষের উপকারে আসবে না)

ঘ) الهجاء: Defamatory poem ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা। 'হিজা' রচনায় কবির বক্তব্য ধারালো এবং প্রতিপক্ষের হৃদয় সংহারক। তবে অশ্লীল প্রেমের প্রভাবের কারণে এ সব কবিতা অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট।[৩৬]

কবি খলিফা হারুন-উর রশীদের উযীর জাফর বারমাকীকে ভর্ৎসনা করে বলেন[৩৭]:

لقد غرني من جعفر حسن بابه ** ولم أدر أن اللؤم حشو إهابه

"জাফরের সিংহ তোরণের সৌন্দর্য্য আমাকে প্রতারিত করেছে, অথচ আমার জানা ছিল না যে, তার শরীরের চামড়া ভর্তি হেয়প্রতিপন্নতা বিদ্যমান।"

কবি আবু খালেদ নুমাইরিকে ব্যঙ্গ করে বলেন:

يا راكِباً أَقبَلَ مِن ثَهمَدٍ ** كَيفَ تَرَكتَ الإِبلَ وَالشاءَ

وَكَيفَ خَلَّفتَ لَدى قَعنَبٍ ** حَيثُ تَرى التَنُّوُمَ وَالآءَ

جاءَ مِنَ البَدوِ أَبو خالِدٍ ** وَلَم يَزَل بِالمِصرِ تَنّاءَ

---

৩৪ এটি ব্যঙ্গ জাতীয় কবিতা। তবে এটি একটু কঠোর প্রকৃতির। কবিগণ তাদের বিপক্ষীয় লোকজন ও গোত্রের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করত এ জাতীয় কবিতায়। (দ্র. আহমদ হাসান যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১)

৩৫ ড. মুহাম্মদ আবদুল আযীয আল-মু'য়াফী, হারকাত আল্ তাজদীদ ফীল আল-শি'র আল-'আব্বাসী (কায়রো: কুল্লিয়াহ দার আল্-'উলুম, তা.বি.), পৃ. ৯২।

৩৬ কার্ল ব্রকেলম্যান, তারীখ আল-আদব আল-আরবী, আবদুল হালীম আল-নাজ্জার কর্তৃক আরবী ভাষায় অনুদিত (কায়রো, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ২৬।

৩৭ দীওয়ানু আবু নুয়াস, তাহকীক, ড. বাহজাত আবদুল গফুর আল-হাদিসী (National Library Abu Dhabi Authority for Culture & Heritage- "Cultural Foundation, 2010), পৃ. ৩৯১।

ঙ) الزهد: **Ascalic poem কু-প্রবৃত্তি ত্যাগমূলক কবিতা।** কবি আবু নুয়াসের যুহদ কবিতা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

চ) الطرد: শিকারের পশ্চাদ্ধাবনমূলক কবিতা। 'ত্বরদ' শীর্ষক কবিতায় কবির বেদুইন জীবনের ছাপ পরিস্ফুট। এতে অনেক বেদুইন শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ছ) الخمريات: **মদ সম্পর্কিত কবিতা।**

খমরিয়্যাহ (خمرية) অর্থ মদ। ইংরেজিতে বলা হয়-Spirituous lipuor, Hilarity, Intoxication.[৩৮] আরবী সাহিত্যে মদ সংক্রান্ত কবিতাকে খামারিয়্যাহ কবিতা বলা হয়।[৩৯] আরব সমাজে ইতোপূর্বে জাহিলী যুগে ত্বারাফা (মৃ. ৫৬৯ খ্রি.), আ'শা (মৃ. ৬২৯ খ্রি.) এবং উমাইয়া যুগে আখত্বাল (মৃ. ৭১০ খ্রি.) প্রমুখ কবি মদ্যপান এবং মদ বিষয়ক কিছু কিছু কবিতা রচনা করলেও এই বিষয়কে উপজীব্য করে 'আল-খমরিয়্যাত' (الخمريات) শিরোনামে দীর্ঘ ও অসংখ্য কবিতা রচনার প্রবর্তক আবু নুয়াসকেই বলা চলে। আব্বাসী যুগে এসে তিনি মদিরার বর্ণনাকে একটি স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং এটিকে উপজীব্য করে পৃথক কাসীদা রচনা করেন। শরাব আবু নুয়াসের কবিতার অলঙ্কার, তাঁর কাব্য প্রতিভার ঝলক এতেই বিচ্ছুরিত হয়েছে এবং এরই মাধ্যমে তিনি পূর্ববর্তী ও সমকালীন কবিদের ছাড়িয়ে গেছেন।[৪০] 'আল-খমরিয়্যাত' রচনায় তাঁর বক্তব্য জোরালো, ভাষা গতিশীল এবং অনুভূতি সুতীব্র। এতে অনুকরণের ছাপ লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর এ সব কবিতা মৌলিক সৌন্দর্যে বিভূষিত। শরাব ছিল আবু নুয়াসের প্রেমিকাতূল্য, যাকে দেহরূপ দান করে তিনি এতে অনুভূতি ও প্রাণের সঞ্চার করেছেন। তাঁর কাব্য বিবরণীতে শরাবের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী যেমন, শরাবের মটকা, মগ, পেয়ালা ও পরিবেশনা হতে আরম্ভ করে এর প্রস্তুত প্রণালী, বিচিত্র স্বাদ ও দেহমনে এর প্রভাব ইত্যাদি বাদ পড়েনি। বস্তুতঃ 'আল-খমরিয়্যাত' কাব্যে ভাষা, শব্দ, অলংকার ও রূপকল্পে বৈচিত্র্য আনয়নের কারণে আবু নুয়াস স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন। শরাব পানে বিরত থাকার জন্য যারা উপদেশ দান করেন তাদের উদ্দেশ্যে কবি বলেন[৪১]:

---

৩৮ Bangla-English Dictionary (Dhaka: Bangla Academy, 2007.), pp.

৩৯ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৫৩৭।

৪০ ড. মুহাম্মদ আবদুল আযীয আল-মু'য়াফী, হারকাত আল্ তাজদীদ ফীল আল-শি'র আল-'আব্বাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

৪১ আবু নুয়াস, দীওয়ান, পৃ. ১০৭।

الراح شيء عجيب أنت شاربه** فاشرب وإن حملتك الراح أوزارا
يا من يلوم على حمراء صافية ** صر في الجنان ودعني أدخل النارا

"শরাবতো এক বিস্ময়কর বস্তু যদি তুমি পান করে থাক। পাপের বোঝা মাথায় চড়ালেও তুমি এটি পান করতে থাক। ওহে, যে রক্তিম শরাব পানের জন্য ভর্ৎসনা করছ, তুমি জান্নাতে থাক; আর আমাকে (শরাব পান করে) জাহান্নামে থাকতে দাও।"

মদ্যপায়ী কবি অন্য কবিতায় শরাব সম্পর্কে বলেন:

دَع عَنكَ لَومي فَإِنَّ اللَومَ إِغراءُ ** وَداوِني بِالَّتي كانَت هِيَ الداءُ
صَفراءُ لا تَنزَلُ الأَحزانُ ساحَتَها ** لَو مَسَّها حَجَرٌ مَسَّتهُ سَرّاءُ

"আমাকে মদ্যপানের জন্য গালমন্দ করা হতে নিবৃত্ত হও; কেননা গালমন্দ (নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি) প্ররোচিত করে। আর যেটি ব্যধি (শরাব) সেটি দিয়ে আমার চিকিৎসা কর। হরিৎবর্ণের ঐ মদের চৌহদ্দিতে বিষন্নতা আগমন করে না; এমনকি নিথর পাথরও যদি একে স্পর্শ করে সেও আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যায়।" অন্য কবিতায় তিনি বলেন[৪২]:

فالخمر ياقوتة، والكأس لؤلؤة ** في كف جارية ممشوقة القدّ،
تسقيك من طرفها خمراً، ومن يدها ** خمراً، فما لك من سكرين من بدّ

"মদ হলো নীলকান্তমণি, আর পানপাত্র হলো মুক্তাদানা, যা টুকরো টুকরো অথচ প্রসারিত হয়ে পরিচারিকার হাতের তালুতে শোভা পাচ্ছে, তুমি মদপান করছো, তোমার পার্শ্বে রয়েছে মদ, তোমার কি হলো যে, তুমি এর থেকে নিস্কৃতি পাচ্ছ না।"

জ) الخمريات والمجون: খালেছ মদ সম্পর্কিত কবিতা। কবি আবু নুয়াস পুরোনো মদের ব্যাপারে বলেন:

معتقة صاغ المزاج لرأسها ** أكاليل در ما لناظمها سلك
جرت حركات الدهر فوق سكونها ** فذابت كذوب التبر أخلصه السبك

"পুরানো মদ, পানির সংমিশ্রণ তার সম্মুখভাগ মনে হয় যেন মুক্তার তৈরি মুকুট পরানো হয়েছে। তার স্থিতিশীলতার উপর যুগের ধারাবাহিকতা প্রবাহিত হয়েছে এবং উহা আগুনে পোড়ানো সোনার ন্যায় পরিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।"

---

৪২ ড. শাওক্বী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১১১৯হি.), ১০ সংস্করণ, পৃ. ১৬০।

ঝ) غزل المؤنث: রমনীগণ সম্পর্কিত কবিতা। কবি আবু নুয়াস প্রেমিকা জিনানের রূপ-লাবণ্য চিত্রায়ন করতে গিয়ে বলেন[৪৩]-

تمت ، وتم الحسن فى وجهها ** فكل شىء ما خلاها محال

للناس فى الشهر هلال ، ولي ** فى وجهها كل صباح هلال

"সে ষোলকলায় পরিপূর্ণ একজন রমণী, তার চেহারায় সৌন্দর্যের আভা পূর্ণরূপে বিকশিত। এই চেহারা ব্যতীত অন্য কিছুতে সৌন্দর্যের অবস্থান মানানসই নয়। মানুষের জন্য প্রতি মাসে একবার নবচন্দ্র উদিত হয়। আর আমার জন্য রয়েছে তার মুখাবয়বে প্রতি প্রাতেঃ একটি নয়াচাঁদ।"

ঞ) غزل المذكر: কিশোর সম্পর্কিত কবিতা।

কবি আবু নুয়াস সাহিত্য ও বাস্তবতার মাঝে কোনো দেয়াল নির্মাণ কিংবা কোনো রাখঢাক রাখেননি। ফলে তিনি মদ, সুন্দর বালক ও অশ্লীলতা এবং কুরুচীপূর্ণ বিষয় খোলাখুলিভাবে তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন। আরবী সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম নারীদের পরিবর্তে সুন্দর বালকদের লক্ষ্য করে কবিতা রচনা করেন। বালকদের নিয়ে তাঁর কবিতা রচনার অন্তর্নিহিত কারণ ছিল জিনানের সাথে ব্যর্থ প্রেম। প্রেমের এই ব্যর্থতা তার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এবং নারীদের প্রতি নিরাসক্তি সৃষ্টি হয়। যদ্দরুন পরবর্তীকালে পুরুষদেরকে উপজীব্য করে তিনি কাব্য রচনা করেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রাচ্যদেশীয় পুরুষদেরকে উপজীব্য করে তিনি কাব্য রচনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দসমূহ তাঁর কাব্যে স্থান দেন। এটি আবু নুয়াসের কবিতার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। তবে আবু নুয়াসের এসব অশ্লীল ও কুচুরীপূর্ণ কবিতা দুনিয়া হতে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেননা, ধর্মীয় ভাবধারার চলমান সমাজ সেগুলো পছন্দ করেনি। তিনি তাঁর 'সাকী ও শরাব' শিরোনামের কবিতায় মদ পরিবেশনকারী বালকদের সম্পর্কে বলেন[৪৪]:

تَمُدُّ بها إليكَ يدَا غُلامٍ ** أغَنّ ، كأنّهُ رَشأٌ رَبيبُ

غذّتهُ صنْعةُ الدّاياتِ حتّى ** زَهَا، فَزَهَا به دَلٌّ وطيبُ

৪৩ আবু নুয়াস, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

৪৪ ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩-৯৪।

يَجُرُّ لكَ العِنانَ ، إذا حَساها ** و يفتحُ عقد تكّته الدّبيبُ

و إن جَمّشْتهُ خَلَبَتْكَ منهُ ** طَرَائِفُ تُسْتَحَفّ لَها القُلوبُ

ينوءُ برِدْفهِ، فإذا تمشّى ** تَثَنّى ، فِي غَلائِلِهِ، قَضِيبُ

يكادُ من الدّلالِ، إذا تَثَنّى ** عليْكَ ، ومن تساقطهِ، يذوبُ

"ঐ মদ নিয়ে সুরেলাকণ্ঠ বালক তোমার দিকে তার হাত বাড়ায়; সে যে প্রতিপালিত হরিণশাবক। প্রসবকারীর যত্নআত্তি তাকে (বালককে) পরিপুষ্ট করেছে। ক্রমান্বয়ে সে বেড়ে উঠেছে এবং সৌন্দর্য ও আভিজাত্য নিয়ে বেড়ে উঠেছে। সে যখন মদ পান করে তখন তোমার জন্য লাগাম প্রলম্বিত করে দেয় অর্থাৎ অনুগত হয়। তার লাগামের ফিতার গিঁট খুলে দেয়। তুমি যদি তাকে সোহাগ কর, তবে তার হৃদয়গ্রাহী অভিনব আচরণ তোমাকে বিমোহিত করবে। সে ভারী নিতম্ব নিয়ে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায়। আর যখন স্বীয় পোশাকে পথচলে তখন মনে হবে যেন পাতার মাঝে সবুজ বৃক্ষডালি দুলছে।"

ট) المجون: কুরুচি বিষয়ক কবিতা। আবু নুয়াসের কুরুচিপূর্ণ কবিতা ও ইসলামবিরোধী কবিতার আবৃত্তি দুনিয়া হতে বিলীন হয়ে গেছে। কেননা, তখনকার দিনে সারাবিশ্বে ইসলামী ভাবধারা চলমান ছিল বিধায় এ কবিতা জনসাধারণ পছন্দ করেননি অথবা ধর্মীয় স্বার্থে তা লোপ পেয়ে যায়।[৪৫] কবি বলেন:

فديت من حملت حاجة ** فردني منه بفضل الحياء

وقفت من المجون على ثلاث ** فأولهن تركى للصلاة

"প্রয়োজনে যাকে আমি উৎসর্গ করলাম, সেই-আমাকে সানুগ্রহে জীবন ফিরিয়ে দিল। অশ্লীলতার বশবর্তী হয়ে তিনটি বিষয়ে আমি স্থির থাকলাম, তার প্রথমটি হলো-নামায পরিত্যাগ করা।"

আবু নুয়াস আব্বাসীয় যুগের বহুমাত্রিক কবি। তিনি বেদুঈন রীতি হতে বেরিয়ে এনে কবিতায় নগর রীতি প্রবর্তন করেন। তিনি প্রিয়ার পরিত্যক্ত বসত বাড়ির পরিবর্তে নগরের মদ্যশালার দিকে আহ্বান জানান। একজন স্বভাব কবি হিসেবে তিনি কবিতার প্রতিটি শাখায় সদর্প বিচরণ করেছেন। তাঁর শৈল্পিক প্রতিভাগুণের কারণে বলা হয় যে, তিনি ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে ইমরুল কায়েসের যে অবস্থান ক্লাসিক্যালোত্তর জগতে আবু নুয়াসের একই অবস্থান। আবু নুয়াসের কুকুর পালন ও তা নিয়ে খেলা করার শখ ছিল। আরবী সাহিত্যে

৪৫ জি.এম. মেহেরুল্লাহ, আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২।

তিনিই সর্বপ্রথম দীওয়ানের একটি বিশেষ অধ্যায়ে শিকার সম্পর্কিত কবিতা রচনা করেন। এতে তিনি শিকারী কুকুর, বাজপাখি, অশ্বসহ বিভিন্ন জীব-জন্তুর শিকারের বর্ণনা দিয়েছেন।[৪৬] তবে তাঁর কবিতায় শরীয়াত বিরোধী ও কুরুচিপূর্ণ ভাবধারা বিদ্যমান। তাঁর কবিতায় চরম লাগামহীন চরিত্রহীনতা, পাপাচার হালকাভাবে গ্রহণ, মদ্যপানে বুঁদ হওয়া, বালক প্রেম ইত্যাদি উলঙ্গ সাহিত্য বিদ্যমান। তিনিই আরবী সাহিত্যে সর্বপ্রথম নারীপ্রেমের পরিবর্তে বালক প্রেমের প্রবর্তন করেন এবং সুন্দর বালকদের নিয়ে কবিতা রচনা করেন। তবে জীবন-সায়াহ্নে এসে কবি অতীত জীবনের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং যুহদিয়াত কবিতা রচনা করেন।[৪৭] কবি আবু নুয়াস আরবী কাব্যরীতির প্রাচীন পদ্ধতি পরিবর্তন করে এতে নতুনত্ব আনয়নের আহ্বান জানালেও তিনি পরিপূর্ণভাবে প্রাচীন রীতির প্রভাবমুক্ত হতে সক্ষম হননি বলেই প্রতীয়মান হয়। তার 'মাদহ' (স্তুতিকাব্য), 'রাজায' (বীরত্বগাঁথা), 'মারাছী' (শোকগাঁথা) প্রভৃতি কবিতায় প্রাচীন রীতির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। যদিও তার 'হিজা' (নিন্দাকাব্য), 'গযল' (প্রণয়গাঁথা) ও 'খমরিয়্যাত' (মদ বিষয়ক কাব্য) কাব্যে নতুন ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে।

আব্বাসী যুগের একজন প্রথিতযশা কবি আবু নুয়াস শৈল্পিক শব্দ ব্যবহার ও বর্ণনার বর্ণাঢ্যে স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপনে সমকালীন কবিদের অতিক্রম করেছিলেন। আরবী কাব্যে পারসিক শব্দ ও প্রবাদ প্রবচনের ব্যহার এবং পারসিক মডেলে 'গযল' রচনা তাঁর অন্যতম কীর্তি। মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির লীলাভূমি বাগদাদ প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থান করেও 'আল-খমরিয়্যাত' (মদ বিষয়ক কাব্য) রচনা তাঁর দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। এই বিষয়ে এ যাবৎকাল রচিত আরবী কাব্যের মাঝে আবু নুয়াসের আল-খমরিয়্যাতকে শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর যুগ পর্যন্ত আরবী কাব্যে প্রাচীন ধারা অনুসৃত হয়ে আসছিল। তিনিই সর্ব প্রথম কাব্য চর্চার এই রীতি পরিহার পূর্বক নতুন ধারা অনুসরণের আহ্বান জানান। স্বীয় কাব্যেও তিনি এই ধারা প্রবর্তনের প্রয়াস পান। এজন্য তাকে আরবী কাব্যে প্রাচীন ও আধুনিক ধারার মাঝে সেতুবন্ধন রচনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমসাময়িক কথ্য ভাষার বাক-পদ্ধতি মাঝে মধ্যে ব্যবহার করা সত্ত্বেও আবু নুয়াসের ভাষা ছিল মোটামুটি বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। ভাষাগত কিছু ত্রুটি ছিল যা তাঁর পূর্ববর্তীদের মাঝেও প্রচলিত ছিল।

---

৪৬ আনিস আল-মাকদাসী, উমারা-উশ্ শির আল্-'আরবী ফী আল্-'আসর আল্-আব্বাসী (বৈরুত: দার আল-ইল্ম লিল মালায়ীন, ১৯৯৪খ্রি.), পৃ. ১২৩।

৪৭ আহমদ হাসান, যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

দীওয়ান

আবু নুয়াস নিজে তাঁর কবিতার কোন সংকলন প্রস্তুত করে যাননি। ফলে তাঁর অনেক কবিতা অজানা রয়ে গেছে। বিশেষত: ইরাকে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি যে সকল কবিতা রচনা করেছিলেন তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইসলামী বিশ্বকোষের তথ্য মতে, তাঁর দীওয়ানের কয়েকটি সংশোধিত পাঠ বিদ্যমান, তন্মধ্যে আস্-সুলী ও হামযা ইসবাহানী এ দু'জনের দুটি পাঠই গুরুত্বপূর্ণ। আস-সুলী কবিতাগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণনাক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে হামযার কিছুটা উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি তেমন সতর্কতা প্রদর্শন করেননি বিধায় হামযার সংকলনটি আস-সূলীর সংকলন হতে প্রায় তিনগুণ বড় যা ১৫শত কবিতায় ১৩ হাজার শ্লোক সম্বলিত। অধিকন্তু হামযা ইসবাহানী অনেক কবিতার সঙ্গে 'আখবার' (রচনার পটভূমি)ও সংযোজন ও অনেক অধ্যায়ে ভাষ্য প্রদান করেছেন।[৪৮] সুলীর রেওয়াতটি ইস্তাম্বুলের মাকতাবা কুফিরয়ালী (مكتبة كوپريالى)-এ (আহমদপাশা নং-২৬৭ এবং মুহাম্মদপাশা নং-১২৫০) এবং দিমাশকের মাকতাবাতু যাহিরিয়্যায় (৭৮৭৭ رقم :المكتبة الظاهرية) সংরক্ষিত আছে। আর হামযার রেওয়াতটি ইস্তাম্বুলের মাকতাবাতু সুলায়মানিয়ায় (৩৭৭৩ رقم :فاتح) ও ইস্তাম্বুলের মাকতাবা রাগেব পাশায় (নং: ১০৯৯) এবং লন্ডনের মাকতাবা ব্রিটেনিয়্যা (নং ২৪৯৪৮) সংরক্ষিত আছে।[৪৯] ১৯৬২ সালে বৈরুত থেকে আবু নুয়াসের দীওয়ান প্রকাশিত হয়। এছাড়া আবুল ফাতাহ উসমান বিন জিন্নী-এর সংকলনকৃত একটা দীওয়ান ১৩৮৬হি./১৯৬৬ সালে দিমাশক থেকে প্রকাশিত হয়। এটি লন্ডনের মাকতাবা ব্রিটেনিয়্যায় (নং৭৭৬৪)-এ সংরক্ষিত আছে।[৫০]

W. Ahlwardt সংকলিত মদ সংক্রান্ত কবিতার সংস্করণটি (W. Ahlwardt, Diwan d. Abu Nuwas, I. Die Weinlieder, Greiffswald, 1861) আস-সূলীর পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। মিশরের কায়রো থেকে প্রকাশিত সংকলনটি (ইস্কানদার, আসাফ, কায়রো ১৮৯৮খ্রি.; ১৯০৫ খ্রি.) হামযার পাঠের উপর অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে।[৫১]

মদ, সমকামিতা ও অশ্লীল কবিতার জন্য আবু নুয়াস পাশ্চাত্যের লেখকগণের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। পাশ্চাত্যের অনেকে তাকে The Greatest Poet in Islam বলে অভিহিত করে

---

৪৮ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

৪৯ দীওয়ানু আবু নুয়াস ইবন হানী (বৈরুত: দার নশর কিতাব আল-আরাবী, ১৪২২হি./২০০১খ্রি.), সং, ২, পৃ. ভূমিকা-ك-ل।

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা-م।

৫১ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

থাকেন।[৫২] আধুনিক যুগে ইউরোপীয় অনেকে আবু নুয়াসের জীবনী ও কবিতা ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় সংকলন করেছেন। W. H. Ingrams কর্তৃক Abu Nuwas in Life and in Legend নামে জীবনী সংকলন করেছেন যা ১৯৩৩ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। Philip F. Kennedy কর্তৃক Abu Nuwas A Genius of Poetry জীবনী ও কবিতা সংকলন অক্সফোর্ড থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। আবু নুয়াসের বহু কবিতা ও ইসলাম বিরোধী আবৃত্তি দুনিয়া হতে বিলীন হয়ে গেছে। কেননা, তখনকার মানুষ অতিমাত্রায় ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন ছিল বিধায় এ প্রকারের কবিতা অনেকেই পছন্দ করত না ও ধর্মীয় স্বার্থে অনেকে সেগুলি বিলুপ্ত করে ফেলে।[৫৩] মিশরীয় প্রকাশনা সংস্থা 'দারুল কুতুবে' আবু নুয়াসের জীবনতথ্য সম্বলিত এমন একটি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে যা রাষ্ট্রীয় আইনের কারণে প্রকাশ করা যাচ্ছে না।[৫৪]

গুণাবলী ও চরিত্র

উজ্জ্বল লাবন্যময় চেহারা বিশিষ্ট মিষ্টভাষী, কোমল প্রাণ, সুললিত কণ্ঠবিশিষ্ট দুর্মূখ বাচাল ও বাগ্মি ছিলেন কবি আবু নুয়াস। তাঁর ব্যবহারে এমন কিছু নির্মল আকর্ষণ বিরাজ করত, যাতে মানুষ সবসময় আকৃষ্ট থাকত। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে ছিলেন খুবই শিথিল, ব্যক্তি চরিত্রে কলুষতার প্রকাশ ঘটত।[৫৫] তিনি কোমল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন, দয়ার্দ্রচিত্ত, আজকের দিনে যা রোজগার করতেন পরের দিনের জন্য জমা করে রাখতেন না।[৫৬]

আবু নুয়াসের স্মরণশক্তি ছিল প্রখর । বলা হয়- তাঁর গৃহে বই রাখার প্রয়োজন হতো না, কারণ সবই তাঁর মুখস্থ ছিল। মৃত্যুর পর আবু নুয়াসের গৃহে একখানা বইও পাওয়া যায়নি।[৫৭] কবি আবু নুওয়াস সৌন্দর্য প্রিয় ছিলেন। সৌন্দর্য, প্রেম-প্রীতি, সৌন্দর্যের শৈল্পিক নৈপুণ্য বর্ণনা এবং সৌন্দর্যের রস গ্রহণের ক্ষেত্রে তার রুচি-বৈচিত্র্য ছিল বিস্ময়কর।

---

৫২ www.encyclopedia.com/art>thediwanofabunuwas.encyclopedia.com

৫৩ ড. ইউসুফ খালীফ, তারীখুশ শি'র ফিল 'আসরিল 'আব্বাসী (কায়রো: দারুস সাকাফাহ, ১৯৮১খ্রি.), পৃ. ২৪-২৫।

৫৪ ড. ত্বহা হুসায়ন, হাদিছুল আরবি'আ (মিশর: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), ১১শ সং, খ.২, পৃ. ২৪।

৫৫ বুতরুস আল-বুস্তানী, উদাবাউল 'আরব (বৈরুত: দার আল-জিল, ১৯৮৯খ্রি.), পৃ. ৬৮; জুরজী যায়দান, তারীখুল লুগাতিল আল-আরাবিয়্যা।

৫৬ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

৫৭ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন, 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,), পৃ. ২৭।

কবির নিম্নোক্ত কবিতায় তাঁর সৌন্দর্য প্রিয়তা ফুটে ওঠে:

للحسن في وجناته بدع ** ما إن يميل الدرس قاريها

"সুন্দরের গণ্ডদেশে এমন চির নতুন আকর্ষণ রয়েছে যা তার পাঠককে পাঠ গ্রহণের একঘেঁয়েমিতে ভোগায়না।"

আবু নুয়াসের মৃত্যু

কবি আবু নুয়াসের মৃত্যু সাল নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। তবে ১৯৮/৮১৩ ও ২০০/৮১৫ সনের মধ্যভাগে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দীওয়ানে আব্বাসীয় খলিফা আল-আমীন (মৃ. ১৯৩/৮১৩) সম্পর্কে একটি শোকগাঁথা থাকায় এর পূর্বে মৃত্যুর ধারণা অসম্ভব। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, ১৯৪-১৯৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৮]

ঐতিহাসিক ইবনু নদীম তাঁর মৃত্যু ২০০ হিজরিতে উল্লেখ করলেও তিনি ইবনু কুতাইবার সাথে ঐক্যমত পোষণপূর্বক ১৯৯ হিজরিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

আবু নুয়াসের মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন ঘটনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে, তাঁর একটি কবিতায় ধর্মদ্রোহী ভাব প্রকাশ পাওয়ায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্য বর্ণনানুযায়ী আন-নাওবাখত-এর বিদ্বান শী'আ পরিবারের গৃহে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই পরিবারের সাথে তাঁর বিশেষ সখ্যতা ছিল। তবে কবি নাওবাখতীর সম্বন্ধে মর্মপীড়াদায়ক ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন, এ কারণে ধারণা করা হয় যে, নাওবাখতীর দ্বারাই তিনি নিহত হয়েছেন।[৫৯] তবে ইতিহাসবিদগণ এটিকে অপবাদ হিসেবে ধারণা করেন, কেননা পরবর্তীকালে এই পরিবারই আবু নুয়াসের কবিতা সংগ্রহ ও সংযোজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং অনেকে কবির কবিতা তাদের নিকট হতে সংগ্রহ করেছেন।[৬০]

আব্বাসী যুগের কবিগণের মধ্যে তাঁর অবস্থান

আরবী সাহিত্যের মধ্যযুগের দিকপাল। এ কবি তাঁর কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিগত গুণ প্রকাশের মাধ্যমে কবিগণের মধ্যে অন্যতম স্থান অধিকার করার প্রয়াস পেয়েছেন। জুরজী যায়দানের উক্তি মতে আবু নুয়াস কবিতা আবৃত্তির ধরণ বদলিয়ে, অর্থের প্রশস্তিগাঁথায়

---

৫৮ কাশফ-আল-যুনূন আন-আসামী আল-কুতুব ওয়া আল-ফুনূন' (বৈরুত: মাকতাবাতুল মুছান্না, ১৯৪১খ্রি.), খ.১, পৃ. ৭৭৪।

৫৯ হান্না আল-ফাখুরী, আল-জামী' ফী তারীখ আল আদাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৩।

৬০ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ২৭৩।

আব্বাসী যুগের কবিদের শীর্ষস্থান অধিকার অর্জন করেন। তার স্বীকৃতিস্বরূপ জাহেযের উক্তি প্রণিধানযোগ্য[৬১]:

ما رأيت أحدًا أعلم باللغة من أبي نواس، وأفصح لهجةً، مع مجانبة الاستكراه

"চতুর্দিকে অসচ্ছ পরিবেশ এবং ঘৃণিত আবহাওয়া সত্ত্বেও আমি আবু নুয়াসের চেয়ে বড় ভাষাবিদ ও শুদ্ধাচারী কাউকে দেখিনি।" তাঁর কবিতায় কোন কটুতা না থাকার কারণে হাসান যায়্যাত এভাবে মূল্যায়ন করেছেন যে, তিনি কবিতা রচনা করে পুনরায় সেটাকে কম বেশি করে শব্দ সংযোজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে হৃদয়স্পর্শী ও সাবলীল করে তুলতেন।

হাসান আরও বলেন, ভাষার লালিত্যে, চরণের চয়নে, ভাবের মাধুর্য্যে, অধ্যায় রচনায় অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সব-সাময়িক কবিগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। এমনকি হাসান বসরী ও হাসান ইবনু সিরিন যখন তাঁর কবিতা শুনতেন, তখন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেই তা শুনতেন। তিনি বাশ্শারের অনুসরণ করে তার উর্ধ্বে চলে যান।[৬২]

মা'মার বিন মাছনা বলেন:

كان ابو نواس للمحدثين كامرئ القيس للمتقدمين

আবু নুয়াস আধুনিক কবিদের মাঝে এমন ছিলেন, যেমন পূর্ববর্তীদের মাঝে ইমরুল কায়স ছিলেন।"

ইবনুস্ সাকিত বলেন:

اذا رأيت من أشعار الجاهلين فلامرئ القيس والاعشي، ومن الاسلاميين فلجرير والفرزدق، ومن المحدثين فلابى نواس، فحسبك.

'জাহেলী যুগের কবিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন ইমরুল কায়স ও আ'শা আর ইসলামী যুগের কবিদের মধ্যে জারির ও ফারাযদাক। অপরদিকে আধুনিকদের মধ্যে শুধুই আবু নুয়াসকে দেখতে পাবো।'

জালিলুর রহমান আ'জামী ابو الطيب المتنبى নামক গ্রন্থে বিভিন্ন কবিদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে ابو نواس এর মূল্যায়ন একটি ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করান যে, একদা ابو نواس মাদকাসক্ত হয়ে খলিফা মামুনের চাচা সুলাইমানের বিরুদ্ধে هجاء কবিতাংশ আবৃত্তি করলে

---

৬১ ইবনে মানযুর, আখবার আবী নুয়াস (মিসর: তা.বি.), পৃ. ৫৩-৫৪।

৬২ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ২৭৩

তাঁকে প্রথমে কারারুদ্ধ করে, পরে হত্যার জন্য দরবারে ডাকা হলে মুহূর্তের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি করলে তাকে উপঢৌকনসহ খালাস করে দেয়[৬৩]

তিনি বলেন:

تذكر أمين الله والعهد يذكر ** مقامي وإنشاديك والناس حضر
ونثري عليك بالدر يا در هاشمٍ ** فيا من رأى درّاً على الدر ينثر
مضت لي شهورٌ مذ حبست ثلاثةٌ ** كأني قد أذنبت ما ليس يغفر
فإن أك لم أذنب ففيم عقوبتي؟ ** وإن أك ذا ذنبٍ فعفوك أكبر

"আমরা আল্লাহর বিশ্বস্ত বন্ধুকে মর্যাদা ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে স্মরণ করি, হে হাশিম গোত্রের মালিক! আপনার উদ্দেশ্যে আমার আবৃত্তি, মানুষের সমাগম, আমার বিস্তৃতি, সব আপনারই সাফল্য।

"তিনবার বন্দী হওয়ার মাধ্যমে আমার অনেক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, মনে হয় আমি এমন অপরাধ করেছি যা ক্ষমার অযোগ্য। আমি যদি অপরাধ না করি তাহলে কেন আমাকে বন্দী করেছো, আর আমি যদি অপরাধী হই তবে তোমার ক্ষমার দৃষ্টি আমার অপরাধ অপেক্ষা অতি মহান।"

কবি আবু নুয়াস স্বীয় প্রবর্তিত নব্যপন্থায় কবিতা রচনা করে হৃদয়স্পর্শী ভাব, মর্মভেদী ভাষা, আবেগাপ্লুত ভাবের মাধ্যমে নিজেকে আব্বাসীয় যুগের উজ্জ্বল নক্ষত্রের অন্যতম হিসাবে প্রমাণিত করার পরম প্রয়াস পেয়েছেন।

---

৬৩ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭।

চতুর্থ অধ্যায়
যুহদ কবিতার পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

দুনিয়ার ভোগ ও বিলাস সামগ্রী বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস যা আল্লাহ হতে দূরে সরিয়ে দেয় এমন যে কোন জিনিস হতে সংযম অবলম্বন করাকে যুহদ বলে। সূফিতত্ত্বে যুহদ একটি প্রায়োগিক পরিভাষা। যাহিদের গুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো যুহদ। যুহদ পরহেযগার হতে আরও বিশেষ উচ্চস্তরের জীবন পদ্ধতি। আব্বাসীয় সমাজে অশ্লীলতার সয়লাব সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে। এর বিপরীতে এ সময় চারিত্রিক স্খলন ও ধর্মীয় শৈথিল্যের প্রতিকার স্বরূপ পার্থিববিমুখ নির্ভর কাব্যের সৃষ্টি হয় তাকেই যুহদ কবিতা বলা হয়। নিম্নে যুহদ কবিতার পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অলোকপাত করা হলো।

যুহদ-এর সংজ্ঞা ও পরিচয়

যুহদ (زهد) শব্দের যা (الزاء) বর্ণে পেশ, হা (الهاء) বর্ণে সুকুন, কখনো যা (الزاء) বর্ণে যবরযোগে পঠিত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো, কোন আকর্ষণীয় বস্তু হতে মুখ ফিরানো; ধর্মের পথে উৎসর্গীকৃত।[১] যেমন, বলা হয়ে থাকে, زهد عن الشيء "কোন জিনিস থেকে বিমুখ হলো বা فلان يتزهد بمعنى يتعبد।[২] আর যখন বলা হয় زهد في الدنيا - ইবাদতের জন্য দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত হলো।[৩] হাদীসে এসেছে-أفضل الناس مؤمن مزهد "স্বল্প সম্পদের অধিকারী মু'মিন সর্বোত্তম।"[৪]

যুহদ শব্দের কর্তৃবাচক বিশেষ্য (اسم فاعل) হলো زاهد (যাহিদ)। এটি একবচন, বহুবচন হলো, زهاد, زاهدون এর অর্থ হলো, সাধক, তাপস, দরবেশ[৫], পরকালের মহব্বতে দুনিয়া বিমুখ, সংকীর্ণ জীবন যাপনকারী ইত্যাদি।[৬]

---

১ ইবন মনযুর, লিসানুল আরব (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০৩খ্রি.), খ.৪, পৃ. ৪১৯; মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল্-আযহারী, বাংলা একাডেমী আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.), ২য় খ-, ২য় পুনমুদ্রণ, পৃ-১৪১৪।

২ জাওহারী, আস-সিহাহ, তাহকিক, আহমদ আবদুল গফুর আত্তার (বৈরুত: দারুল মালাঈন, ১৯৭৯খ্রি.), ৪র্থ সংস্করণ, খ. ২, মাদ্দাহ, ز هـ

৩ সম্পাদনা পরিষদ, আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), ১ম খ-, ১ম প্রকাশ, পৃ. ১০৯৩

৪ মুহাম্মদ 'আলী থানুভী, কাশ্শাফু ইসতিলাহিল-ফুনূন (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮হি./১৯৯৮খ্রি.), ১ম সং, খ. ২, পৃ. ২৯২।

৫ ড. ফজলুর রহমান, আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩০৩।

পারিভাষিক অর্থে যুহদ হলো- পার্থিব সম্পদের মায়া ত্যাগ করে শুধুমাত্র পরকালের উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে ঐকান্তিকভাবে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সোপর্দ করা। খ্যাতিমান দার্শনিক ইমাম গাযালী (রহ) বলেন:

انما الزهد ان تترك الدنيا لعلمك بحقارتها بالاضافة الي نفاسة الاخرة

"যুহদ হলো আখিরাতের উৎকৃষ্টতার তুলনায় দুনিয়াকে নিকৃষ্ট জেনে তা তা বর্জন করা।"[৭]

Dictionary of Islam-এ যুহদ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে[৮]: "The divine love, expelling all worldly desires from his heart. Leads him to the next stage which is "زهد" or "Seclusion".

আল-মু'জামু মুসতালাহাতিল আদব গ্রন্থকার زهد -এর সংজ্ঞায় বলেন:[৯]

الزهد هو بالعنى الإسلامي الانصراف عن الدنيا ومفاتنها والتمسك بالتقوي والعمل الصالح مع الكسب والعمل

"ইসলামী পরিভাষায় যুহদ হচ্ছে, দুনিয়া এবং তার অনিষ্টসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং জীবিকা অন্বেষণ ও ব্যক্তিগত কার্যসমূহের পাশাপাশি তাকওয়া (খোদাভীতি) এবং সৎকার্যকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা।"

আল-মু'জামুল ওয়াসিত অভিধানে বলা হয়েছে-

زهد في الدنيا ترك حلالها مخافة حسابه وترك حرامها مخافة عقابه

"যুহদ হলো-পারলৌকিক হিসাবের ভয়ে বৈধবস্তু পরিত্যাগ করা এবং আখেরাতের শাস্তির ভয়ে অবৈধ জিনিস থেকে বিরত থাকা।[১০]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র)-এর মতে[১১]-

الزهد مشروع ترك مالاينفع في الدار الآخرة

"যুহদ হলো- এমন বস্তু পরিত্যাগ করা যা আখিরাতে উপকারে আসবেনা "

---

৬ মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ফিরোজাবাদী, আল কামুসুল মুহীত (বৈরুত: দারুল এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), ১ম খ-, ১ম সংস্করণ, পৃ.৪১৮

৭ ইমাম গাযালী (রহ), এহইয়াউ উলুমিদ্দীন (বৈরুত: দারুল মারেফা, তা.বি.), খ.৪, পৃ.২১৬

৮ Theomas Patrick Hughes, Dictionary of Islam (New Delhi: Cosmo Publications, 1978), p. 610; Textual Sources for the Study of Islam, edited and translated by Andrew Rippin, Jan Knappert (Manchester University Press, 1986), p. 175.

৯ মাজদী অহবু, মু'জামু মুসতালাহাতিল আদব (ইংরেজি, ফরাসী-আরবী), (বৈরুত: মাকতাবাতু লুবনান, তা.বি.), পৃ. ৬১৬।

১০ ইবরাহিম আনিস (সম্পাদনা), আল-মু'জামুল ওয়াসিত (দিল্লি: দারুল ইশায়াত আল-ইসলামিয়া, তা.বি.), পৃ. ১৩৭।

১১ ইবনে তাইমিয়া, মাজমু'উল ফাতাওয়া (ইস্কানদারিয়া: দারুল অফা, ২০০৫খ্রি.), ৫ম সং, খ. ১, পৃ. ১২।

মুফতি আমীমুল ইহসান যুহদ সম্পর্কে বলেন:

الزهد في اللغة ترك الميل إلى الشيء وفي إصطلاح أهل الحقيقة هو الإعراض عن الدنيا وبغضها فمن فرح بفقدما يحتاج إليه وكره الزاهد على الضرورة فهو زاهد

"যুহদের আভিধানিক অর্থ হলো- কোনো জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করা, বিমুখ হওয়া। হাকীকতপন্থিদের মতে, দুনিয়া থেকে বিমুখ হওয়া, বিরাগী হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু হারালে আনন্দিত হলো এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসকে অপছন্দ করলো সে যাহিদরূপে আখ্যায়িত হলো।"[১২] জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ বলখী বলেন:

الفقر فقد ما يحتاج اليه فان فرح و كره الزائد علي الضرورة فهو زاهد

দারিদ্র্য হলো প্রয়োজনীয় বস্তু না পাওয়া (হারানো), যদি প্রয়োজনীয় বস্তু না পেয়েও খুশি থাকে এবং বেশি বা প্রয়োজনাতিরিক্ত পাওয়াকে অপছন্দ করে তাহলে সে যাহেদ।"[১৩]

মুহাম্মদ আলী আত-তানুভী (র) যুহদ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনায় উল্লেখ করেন[১৪]:

وشرعا أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن الحل فهو أخص من الورع إذ هو ترك المشتبه ، وهذا زهد العارفين. وأعلى منه زهد المقربين، وهو الزهد فيما سوى الله تعالي من الدنيا وجنة وغيرها إذ ليس لصاحبه هذا الزهد مقصد إلا الوصول إليه تعالي، والقرب منه ، ويندرج فيه كل مقصود لغيرهم "كل الصيد في جوف الفرا". وما الزهد في الحرام فواجب عام اي في حق العارفين والمقربين وغيرهم، وفي المشتبه فمندوب عام، وقيل واجب.

"শরীয়াতের পরিভাষায় নিশ্চিত হালাল বস্তু থেকে প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করা। অতএব যুহদ ওয়ারা' বা পরহেযগারী থেকে আরও বিশেষ উচ্চস্তরের জীবন পদ্ধতি। ওয়ারা' হলো- হারামের সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করা। উক্ত স্তরের যুহদকে যুহদুল 'আরিফিন (আরিফগণের যুহদ) বলা হয়। আর সেটির সংজ্ঞা হলো, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত দুনিয়ার ভোগসামগ্রী ও আখিরাতে জান্নাতের নি'আমত ইত্যাদি সকল কিছু থেকে বিমুখ হওয়া। কেননা এ স্তরের যাহিদের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছা। হারাম বিষয় পরিহারের ক্ষেত্রে যুহদ 'আরিফ, নৈকট্যপ্রাপ্ত ইত্যাদি সকলের জন্যই ওয়াজিব এবং সন্দেহযুক্ত বস্তু পরিহার করা মুস্তাহাব, কারো কারো মতে ওয়াজিব।"

---

১২ মুফতী আমীমুল ইহসান, আত তা'রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ (ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮১হি./১৯৬১খ্রি.) পৃ.৩১৫।

১৩ জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ বলখী, আইনুল ইলম (ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃ. ১২৬।

১৪ মুহাম্মদ 'আলী থানুভী, কাশ্শাফু ইসতিলাহিল-ফুনূন, খ.২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।

হাসান বসরী (র) বলেন:

ليس الزهد بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يد نفسك، وأن تكون حالك في المصيبة، وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء

"সম্পদ বিনষ্ট ও হালালকে হারাম মনে করে নেওয়ার মধ্যে যুহদ নেই। বরং আল্লাহর হাতে যা রয়েছে তার প্রতি অধিক আস্থাশীল হও তোমার হাতে যা আছে তা অপেক্ষা। বিপদে ও নিরাপদে সর্বাবস্থায় তোমার অবস্থা যেন সমান হয়। তোমার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী হকের ক্ষেত্রে যেন সমান হয়।

তাসাঊফ শাস্ত্রে যুহদ একটি প্রায়োগিক পরিভাষা। যাহিদের গুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো যুহদ। যুহদ বলতে বুঝায় প্রথমত গুনাহ থেকে, যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা থেকে এবং আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় বা বিচ্ছিন্ন করে দেয় এমন যে কোনো জিনিস থেকে সংযম অবলম্বন বা আত্মসংবরণ। তারপর মনের নিরাসক্তি ও নির্লিপ্ততা সহকারে যাবতীয় নশ্বর দ্রব্য থেকে সংযম ও মিতাচার অবলম্বন এবং কঠোর সংযম ও সকল সৃষ্ট জিনিসকে বর্জন করা।

আরবী সাহিত্যে যুহদ কবিতা হলো- দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের প্রতি বিরাগভাব এবং তার প্রতি অনাসক্তিমূলক কবিতাই زهديات বা দুনিয়া বিমুখতামূলক কবিতা।[১৫]

পবিত্র কুরআনও হাদিসে যুহদ শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনে এসেছে:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

"তারা তাঁকে কম মূল্যে বিক্রয় করে দিল গুণাগুণতি কয়েক দেরহাম এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল।[১৬]

হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন: أزهد فى الدنيا يحبك الله "...তুমি দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন।.."[১৭]

---

১৫ ড. আবদুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ১৭৪

১৬ সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২০

১৭ মুহাম্মদ ইবন মাজাহ, সুনানু ইবন মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭৩।

আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে যুহদ

মানবজীবন দু'ভাগে বিভক্ত। একটি দুনিয়ার জীবন অপরটি আখেরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী অন্যদিকে আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ভোগবিলাস ও প্রাচুর্যের প্রতি বিরাগভাব এবং তার প্রতি নিরাসক্তিই হল-যুহদ। পবিত্র কুরআনে যুহদ সম্পর্কে বহু আলোচনা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো-

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

"যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্যে আমি তার ফসল বর্ধিত করে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে ওর কিছু দেই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।"[১৮] অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

"জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। যাকে নরকাগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলকাম। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।"[১৯] আল্লাহ আরও বলেন:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। এর উপমা বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্যসম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নয়।"[২০]

---

১৮ আল-কুরআন, সূরা শুরা, আয়াত: ২০

১৯ আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৮৫

২০ আল-কুরআন, আল-হাদিদ, আয়াত: ২০

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন[২১]:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا – وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।"

আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার জিন্দেগি সম্পর্কে বলেন[২২]:

قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً

"তুমি বলে দাও যে, দুনিয়ার সম্পদ তুচ্ছ। আর আল্লাহভীরুদের জন্য আখেরাতই উত্তম। সেদিন তোমরা সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।"

আল্লাহ আরও বলেন[২৩]:

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু ও শোভাবর্ধক মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী। এরপরেও কি তোমরা বুঝবে না।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন[২৪]:

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً

"তাদের নিকট পার্থিব জীবনের উপমা পেশ করুন; এটি পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"

হাদিসে যুহদ সম্পর্কে অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো। আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا

"তোমরা বাগ-বাগিচা ও ক্ষেতখামার (আগ্রহের সাথে) গ্রহণ করো না। অন্যথায় তোমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।"[২৫]

---

২১ সূরা আল-'আলা, আয়াত: ১৬-১৭।

২২ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৭।

২৩ সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬০।

২৪ সূরা কাহাফ, আয়াত: ৪৫।

২৫ মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত্-তিরমিযি, জামি'উত তিরমিযী (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজর, ১৪২৪হি./২০০৪খ্রি.), ১ম সং, কিতাবুয-যুহদ, বাবু মাজা'আ ফী ইলাহাম্মি ফিদ-দুনইয়া ওয়া হুব্বিহা, হাদীস-২৩২৮, পৃ. ৬৫২-৬৫৩।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অধিক সম্পদ সংগ্রহের প্রতি মনোনিবেশ আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে ফেলে।

রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়ার জিন্দেগীর দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে বলেন[২৬]:

ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع.

"দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত আখেরাতের জীবনের তুলনায় এমন, যেমন, তোমাদের কেউ অকুল সমুদ্রে একটি আঙ্গুল রাখ, তারপর তা তুলে ফেলল, তখন তার আঙ্গুলের সাথে যতটুকু পানি ওঠে আসে দুনিয়ার জীবনও আখেরাতের তুলনায় তার মত। সে যেন চিন্তা করে দেখে সমুদ্রের পানির তুলনায় তার আঙ্গুলের সাথে ওঠে আসা পানির পরিমাণ কতটুকু।"

আবু যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন[২৭]:

ما زهد عبد في الدنيا الا أنبت الله الحكمة فى قلبه، وانطق بها لسانه، وبصره عيب الدنيا وداءها، ودواءها، واخرجه منها سالما إلى دار السلام

"যে বান্দা দুনিয়ার সম্পদ হতে বিমুখ থাকে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে সূক্ষ্ম জ্ঞান সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ তার রসনা দ্বারা তা প্রকাশ করান। দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি, তার ব্যাধি ও নিরাময় তাকে দেখিয়ে দেন। এবং তাকে দুনিয়া হতে নিরাপদে বের করে দারুস-সালামে অর্থাৎ জান্নাতে পৌছিঁয়ে দেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও ইরশাদ করেন[২৮]:

لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء

"যদি আল্লাহর নিকট মাছির ডানার সমান দুনিয়ার মূল্য থাকতো, তাহলে তিনি কোন কাফিরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।"

---

২৬ মুহাম্মদ ইবন মাজাহ, সুনানু ইবন মাজাহ, কিতাবুয যুহদ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যুহদ ও কিতাবুর রিকাক, খ. ৪, ২২৭২।

২৭ মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ আল-খাতীব আত-তাবরিযী, মেশকাতুল মাসাবীহ (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি.), সং.৩, খ. ৩, কিতাবুর রিকাক, পৃ. ১৪৩৫।

২৮ ইমাম তিরমিযী, জামি তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, খ.৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০।

অন্য হাদিসে এসেছে- হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর খেদমতে এসে বললো:

يا رسول الله دلني على عملٍ إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس"

আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে। তিনি বললেন, দুনিয়া ত্যাগ করো, আল্লাহ তোমাকে ভালো বাসবেন এবং মানুষের নিকট যা আছে তার প্রতি লালসা করো না। তাহলে লোকেরা তোমাকে ভালোবাসবে।"[২৯]

এ হাদীসে দুনিয়াত্যাগী হওয়া অর্থ সম্পদের প্রতি লিপ্সা না করা। আর 'মানুষের কাছে যা আছে' অর্থ দুনিয়ার পদমর্যাদা ও পার্থিব ধন-দৌলত ইত্যাদি। জীবনধারণের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ করার নাম যুহদ। রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের যুহদের মাঝেই জীবন অতিবাহিত করেছেন। মূলত: যুহদ হলো হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন সেটা থেকেও বেঁচে থাকা। বিলাসিতা প্রকাশ ও অতিমাত্রায় দুনিয়া উপভোগ থেকে দূরে থাকা এবং পরকালের জন্য উত্তম সম্বল গ্রহণ করা।

আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করার জন্য দুনিয়ার মানুষের আগমন। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পরীক্ষাস্বরূপ পাঠিয়েছেন। তবে দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে একেবারে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করাও ইসলাম অনুমোদন করে না। বরং আখিরাত অর্জনের চেষ্টায় সে নিয়োজিত থাকবে আবার দুনিয়ার অংশও সে গ্রহণ করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:[৩০]

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা আখিরাতের অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন:[৩১] "হালালকে হারাম ভাবা এবং সম্পদ বিনষ্ট করার নাম যুহদ নয়; বরং দুনিয়ায় যুহদ অবলম্বন করার অর্থ হল- তোমার হাতে যা আছে তার চেয়ে বেশী ভরসা কর যা আল্লাহর হাতে আছে তার উপর এবং তোমার উপর বিপদাপদ পতিত হলে তা তোমার উপর পতিত না হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করার চেয়ে সওয়াবের আকাঙ্ক্ষা বেশি কর।"

---

২৯ সুনানু ইবন মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, বাব-১, হাদিস নং-৪১০২।

৩০ সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৭৭।

৩১ তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ, মাওলানা মুহাম্মদ মানযুর নোমানী, মা'আরিফুল হাদিস, খ. ২, পৃ. ৮৮-৮৯।

ইসলাম রুহবানিয়াত (বৈরাগ্য)-কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ভোগ-বিলাসকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি হালাল ও পবিত্র খাদ্য খাওয়া এবং মাত্রাতিরিক্ত সৌন্দর্যচর্চাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং মাধ্যম ধরনের তাকওয়া সহকারে দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করতে কুরআন ও হাদিসে যে নির্দেশনা এসেছে, তা-ই যুহদ। যুহদ অর্থ এই নয় যে, দুনিয়ার মানুষ ও সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল ইবাদতে মশগুল থাকবে। একজন সম্পদশালী মানুষও দুনিয়াবিমুখ বা যাহেদ হতে পারে। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) কে জিজ্ঞেস করা হলো সম্পদশালী মানুষ কি যাহেদ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ- ان كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه "যদি সম্পদ বৃদ্ধিতে আনন্দিত না হয় এবং কমে যাওয়াতে চিন্তিত না হয়।"[৩২] তিনি আরও বলেন:

الزهد في الدنيا قصر الأمل، وقال مرة قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس

"যুহদ বা দুনিয়া বিমুখতা হল- অল্প আকাঙ্ক্ষা, তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন, অল্প আকাঙ্ক্ষা ও লোকদের হাতে যে সম্পদ রয়েছে তা থেকে নিরাশ থাকা।"[৩৩]

মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (র) বলেন, "যুহদ-এর আভিধানিক অর্থ হল-দুনিয়ার মোহ হতে অন্তরকে ফিরিয়ে রাখা। বস্তুত এটি শুধুমাত্র অন্তরেরই কাজ। কেউ কেউ মনে করেন, "দুনিয়াদারী হতে বিরত থাকা, তাকে বর্জন করাই প্রকৃত যুহদ এবং এমন ব্যক্তিই যাহিদ; কিন্তু এ ধারণাটি ঠিক নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন: "যারা লেনদেন বিশুদ্ধতা যাচাই করে না, হালাল-হারামে তারতম্য করে না সে যাহেদ বা পরহেযগার নয়।"[৩৪]

যুহদ কবিতার প্রেক্ষাপট ও উৎপত্তি

পবিত্র কুরআনের অনুপম ভাষাশৈলী–এর শব্দ চয়ন, অলঙ্কার, উপমা-উৎপ্রেক্ষা সাহিত্য সমঝদার আরব জাতিকে বিস্মিত ও হতবাক করে দেয়। গোটা আরব জাতির মধ্যে ইনকিলাব (জাগরণ/প্রাণস্পন্দন) সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় নয়া সমাজ ব্যবস্থা– কুরআনের সমাজ ব্যবস্থা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর হিসেবে কুরআনের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আরব জাতিকে নতুন রঙে রাঙিয়ে দেয়। প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড- থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত পবিত্র কুরআন এক আকর গ্রন্থ হিসেবে পরিণত হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়।।

---

৩২ ইবন রজব হাম্বলী, জামে'উল উলুম ওয়াল হিকাম (তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৮৩।

৩৩ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৪।

৩৪ নুর মুহাম্মদ আজমী, মেশকাত শরীফ (ঢাকা: ইমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৮খ্রি.), ৫ম মুদ্রণ, খ.৯, পৃ. ২৪৫।

নতুন কিছু বিষয়ে কবিতা রচনা হতে থাকে। এ সব বিষয়গুলোকে মোটা দাগে 'ইসলামী ভাব ধারার' কবিতা বললে অত্যুক্তি হবে না। ইসলামী ভাবধারার কবিতার মধ্যে অন্যতম সংযোজন হচ্ছে 'যুহদ' কবিতা। যুহদ কবিতার ভাব ও ভাষা ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট। এ জাতীয় কবিতা আব্বাসী যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। উমাইয়া যুগে খুব সামান্য পরিমাণে এর চর্চা লক্ষ্য করা যায়।[৩৫] আধ্যাত্ম্যবাদী কবিতার উন্মেষ মূলতঃ হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে আব্বাসীয় শাসনামলের প্রারম্ভিককালে হয়েছিল। বস্তুবাদী ও ভোগবাদী চেতনার বিপরীতে এই বিশেষ ধারার কাব্য সংস্কৃতির উদ্ভব হয়।

মানবীয় গুণাবলীর সৌকর্যবৃদ্ধি, অন্তরাত্মার পরিশীলন এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে সুশোভিত করণার্থে যুহদ বা যুহদিয়াত-এর ভূমিকা অপরিসীম। ফলে ইসলামে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। লোভ-লালসা, মোহ-পরশ্রীকাতরতা, পার্থিব ভোগ-বিলাস, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, চাকচিক্য প্রভৃতি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য মানবীয় মর্যাদার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে। তাই আত্মার পরিশুদ্ধি ও মানোন্নয়নের জন্য যুহদিয়াত এর বিকল্প নেই। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো- মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভেজাল ভালবাসা ও প্রেম নিবেদন এবং তাঁর অপার সন্তুষ্টি অর্জনে ধন্য হওয়া। এ সময় যুহদ কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে আল্লাহর প্রশংসা, দুনিয়ার তুচ্ছতা, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, ইবাদত, পরহেযগারিতা, দুনিয়ার সীমাবদ্ধতা, অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ, প্রবঞ্চনাপূর্ব দুনিয়া, সম্পদ জমা করা পূঞ্জিবুত করা লাঞ্চনার, মৃত্যু, পরকাল, কবর, হাশর-নাশর, কিয়ামত ইত্যাদি বিষয়াদি সংযোজিত হয়।

আরবী সাহিত্যের পণ্ডিত ও গবেষকগণ সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই বিশাল সাহিত্যাঙ্গনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে সবিস্তার আলোকপাত করেছেন। বিশেষতঃ এর কাব্য সাহিত্য এবং কবিগণকে উপজীব্য করে বিভিন্নভাবে (various dimensions) আলোচনা-সমালোচনা ও গবেষণা করেছেন এবং নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। ইসলামের আবির্ভাব থেকে হিজরী তৃতীয় শতক অবধি আরবী কাব্য সাহিত্যের একটি নবতর সংযোজন হলো- যুহদিয়াত (Asceticism)। এই সময়ে এই ভাবধারার কবিতাসমূহ গণসঙ্গীতের ন্যায় জনসাধারণের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। ফলে নিস্তেজ হয়ে পড়া অনুভূতিতে জাগরণ এবং সচেতন অন্তরে নতুন শিহরণ সঞ্চারিত হতো। ঈমানী চেতনা অধিকতর শানিত হতো আর বিভ্রান্ত ও সংশয়বাদীদের সামনে তৈরি করত এক অদৃশ্য অচলায়তন। এ যেন এক নব চেতনা বা রেনেসাঁর সূচনা। কাব্য সাহিত্যের অপরাপর শ্রেণিবিভাগের ওপর এর বিশেষ

---

[৩৫] আহমদ রাদী, শি'র আল-যুহদ ফী আল-আসর আল-উমাবী (কুল্লিয়াহ আল-আদাব বিজামি'আ আল-নাজাহ আল-ওয়াত্বানিয়্যাহ, ২০০১খ্রি.), পৃ. ০১-২।

প্রাধান্য এ যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই কবিতার মর্মস্পর্শী ভাবদ্যোতনা ও এর সুর ঝংকার গণমানুষের হৃদয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন গেঁড়ে বসে এবং এ ধরণের আধ্যাত্মবাদী কবিগণের কদরও তদানীন্তন সমাজে আকাশচুম্বী ছিল।

বিভিন্ন যুগে যুহদ কবিতা

প্রাক-ইসলামী যুগে যুহদ কবিতা: জাহিলী[৩৬] যুগের কবিতাসমূহ বেশিরভাগই প্রেয়সীর পরিত্যক্ত বাস্তুভিটায় দাঁড়িয়ে রোদন, রমনীর আকৃতি-প্রকৃতি ও গুণাগুণ বর্ণনা, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, প্রশংসা ও নিন্দাবাদ, শোঁকগাথা, গর্ব ও আত্মগৌরব ইত্যাদি বিষয়ে রচিত।[৩৭] এ যুগে ভাবের পরিবর্তে বাস্তবতা ও বাহ্যজগৎ নিয়ে মেতে থাকা ছিল সময়ের দাবি এবং তাঁদের রুচি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। চিন্তা, দর্শন ও আদর্শবাদের কক্ষপথে ঘুরপাক না খেয়ে, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়, জৈবিক কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তির সেবা, ইন্দ্রিয়তুষ্টি, দৈহিক শৌর্যবীর্য প্রদর্শন, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, রোমান্টিকতা, এককথায় ভোগের ভুবনে বিচরণ করাই ছিল তাঁদের কবিতার প্রধান উপজীব্য।[৩৮] তবে আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শিক ভাবনা, সৃজনশীল চিন্তা ও কর্ম, গোত্রীয় ও জাতীয় উন্নয়নচিন্তা তাঁদের কবিতায় একেবারে ছিল না তা নয়। কোনো কোনো জাহিলী কবির কবিতায় উপর্যুক্ত গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে নতুন কিছু বলার, সৃষ্টি করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[৩৯] এ যুগের কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরবী সাহিত্য সমালোচক ইব্ন কুতাইবা (৮২৮-৮৮৯ খ্রি.) বলেন, কবি ঘোড়ার বা উটের পিঠে করে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ভ্রমণে বের হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি প্রেমিকার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষে তাঁর প্রিয়তমার স্মৃতি রোমন্থন করে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন।

---

৩৬ জাহিলী যুগ (العصر الجاهلى): জাহেলী শব্দের অর্থ- অজ্ঞতা বা অন্ধকারাচ্ছন্ন। তৎকালীন আরবের সামাজিক অনাচার ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছিল বিধায় ঐ সময়কালকে জাহিলী যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কে জাহিলী যুগ হিসেবে বলা হয়। অনেকের মতে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে রাসুল (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি অর্থাৎ ৬১০ খ্রি. পর্যন্ত ব্যাপৃত সময়কালকে জাহিলী যুগ বলে থাকে। (দ্র. রাগিব ইস্পাহানী, মুফরাদাত (মিসর: ১৯৬১খ্রি.), পৃ. ১০২; আব্দুল জলিল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ১৩)

৩৭ ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, আল-'আসরুল জাহিলী (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৮খ্রি.), খ.১, পৃ. ১৮৯-১৯৫; হান্না আল-ফাখুরী, আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯৫খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪০-১৪৯।

৩৮ আব্দুল জলিল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল ও সাহাবীদের মনোভাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

৩৯ শাওকী দ্বায়ফ, তারীখ, খ.১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯৫; এ.কিউ.এস. আবদুস শাকুর খন্দকার, আরবি কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, কলা অনুষদ পত্রিকা, খ-৫, সংখ্যা-৭, জুলাই ২০১১-জুন-২০১২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই-২০১৩ খ্রি., পৃ. ৪৯।

কবি প্রিয়তমার সৌন্দর্য, রূপ, প্রেম ও বিরহের নানারকম হৃদয়গ্রাহী চিত্রের বর্ণনা কবিতার মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। এরপর সফরের দুঃখ, কষ্ট, বিনিদ্র রজনী যাপন প্রভৃতির বিবরণ এসে যায়। এ ছাড়া এক সময় শ্রোতাকে আকর্ষণ করে তিনি পারিতোষিক ও পুরস্কারের আশায় কোন ব্যক্তির প্রশংসায় অবতীর্ণ হন। ব্যক্তির পরোপকারিতা, বদান্যতা ও মহানুভবতা প্রভৃতি উল্লেখ করে তাঁকে পুরস্কার দেয়ার জন্য কবি উৎসাহিত করেন।"[৪০] জাহিলী যুগে প্রত্যক্ষরূপে যুহদিয়াত কবিতা রচিত না হলেও এর আভাষ পাওয়া যায়। জাহিলী কবিগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিয়ে মত্ত থাকলেও এদের কেউ কেউ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। এ যুগে সমগ্র আরব উপদ্বীপে ধর্মীয় অঙ্গনে পৌত্তলিক ও বহু ঈশ্বরবাদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলেও কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় জীবন-যাপন করতেন এবং কোন প্রকার মূর্তি পূজায় অংশগ্রহণ করতেন না।[৪১] জাহিলী যুগের কবিতা তথা মু'আল্লাকায়[৪২] মহান আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যের বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। সে যুগের কবিতায়ও তাঁরা আল্লাহ মহান ও সর্বশক্তিমান, জীবন-মরণের একক নির্মাতা, শক্তির একমাত্র আধার, ধন-সম্পত্তি প্রদানের মালিক ইত্যাদি বহুগুণে আল্লাহকে ভূষিত করে কবিতা রচনা করেছেন। তৎকালীন সময় আল্লাহর প্রশংসা আখিরাতের ভয়-ভীতি তাদের কবিতায় ফুটে উঠেছে। এজন্য এ যুগকে যুহদিয়াত কবিতার উন্মেষকাল বলা যেতে পারে।

মু'আল্লাকার রচয়িতাদের অন্যতম জাহিলী কবি লাবিদ ইবনে রাবি'আহ আল-আমিরী (৫৬০খ্রি.-৬৬১খ্রি.)[৪৩] মুখাদরাম[৪৪] কবি। অমুসলিম ও মুসলিম উভয় অবস্থাতেই তিনি

---

৪০ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৬; আব্দুল্লাহ ইবন কুতাইবা, আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৬খ্রি.), পৃ. ৭৪-৭৫।

৪১ হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরি, তা.বি.), পৃ. ৪৩-৪৪।

৪২ মুয়াল্লাকা শব্দের অর্থ- ঝুলন্ত ও টাঙ্গানো। এ জাহেলী যুগে কবিতাগুলো পবিত্র কাবা ঘরের সাথে দামী মিশরীয় বস্ত্রে সোনালী অক্ষরে লিখে ঝুলানো হতো বলে এগুলোর নাম মুয়াল্লাকা। আরবী সাহিত্যে সাবআ মুআল্লাকা (গীতিকা সপ্তম বা সপ্ত ঝুলন্ত কাব্য) ইসলাম-পূর্ব যুগের সৃষ্টিশীল সাহিত্য-সম্পদ।

৪৩ প্রাক ইসলাম ও ইসলামী যুগের কাব্য সম্ভারে যে কজন কবি সেতু বন্ধনে এগিয়ে আসেন তাঁদের অন্যতম কবি লাবীদ। তিনি 'আমির গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। কবি লাবিদ মু'আল্লাকার রচয়িতাদের অন্যতম ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁর কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ হয়। মু'আল্লাকায় তাঁর কবিতা অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় তিনি কাব্য জগতে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ১১৬ বছর বয়সে তিনি স্বগোত্রীয় লোকজনের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে কাব্য রচনা করেছেন বিধায় তাঁকে মুখাদরাম কবি হিসেবেও অভিহিত করা হয়। (দ্র. আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, কিতাবুল আগানী, খ. ১৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১; আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারিখুল

কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর জাহিলী যুগের কবিতায় মহান আল্লাহর প্রশংসা ও কুদরতের বিষয়টি ফুঠে উঠে। কবি বলেন:

فاقنع بما قسم المليك فإنما ** قسم الخلائق بيننا علامها

وإذا الأمانة قسمت في معشر ** أوفى بأوفر حظنا قسامها

"অতএব, আল্লাহ যেভাবে (গুণাবলী) বন্টন করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক; কারণ যিনি আমাদের মধ্যে ঐ গুণাবলি বা চরিত্র নির্ধারণ করেছেন তদ্বিষয়ে তিনিই (মানব চরিত্র সম্পর্কে) অধিক পরিজ্ঞাত।

আর যখন গোত্রসমূহের মধ্যে আমানতদারী বণ্টিত হচ্ছিল, তখন এর বণ্টনকারী মহান প্রভু আমাদের অংশকে পরিপূর্ণভাবে দান করেছেন।"

সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা রচয়িতাদের অন্যতম জাহিলী প্রসিদ্ধ কবি ত্বারাফা ইবন আল-আবদ আল-বিকরি (৫৩৮-৫৬৪খ্রি.)।[৪৫]

'সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল'-এ বিষয় ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি তাঁর মু'আল্লাকায় বলেন:

فلو شاء ربي كنت قيسَ بن خالد ** ولو شاء ربي كنت عَمْرَو بن مَرْثَدِ

"যদি আমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তাহলে আমি (ধন-সম্পদে) কায়েস-বিন খালেদের সমতুল্য হতে পারতাম অথবা প্রভু (আল্লাহ) ইচ্ছা করলে আমি (সন্তান-সম্পদে) মারছাদ-নন্দন আমরের তুল্য হতে পারতাম।"

কবি ত্বারাফা জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে বলেন[৪৬]:

أر الموت أعداد النفوس ولا أرى ** بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد

أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة ** وما تنقص الأيام والدهر ينفد

আদাবুল আরাবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭; মুহাম্মদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১৩ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ১৭৭)

৪৪ মুখাদরাম শব্দের শাব্দিক অর্থ-সম্পৃক্ত। পরিভাষায়- যেসব কবি ইসলামপূর্বযুগ ও ইসলাম-উত্তর উভয়যুগ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদেরকে মুখাদরাম কবি বলে। (দ্র. আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারিখুল আদাাবিল আরাবী, উর্দু অনুবাদ, আবদুর রহমান তারি সুরতী (লাহোর: ১৯৬১খ্রি.), পৃ. ১০৭-১১৩।)

৪৫ কবি ত্বারাফা আরবি সাহিত্য জগতে তাঁর মু'আল্লাকার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা রচয়িতাদের মধ্যে দ্বিতীয়। তাঁর মু'আল্লাকা জাহিলী যুগের এক নিখুঁত চিত্র। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতার একটি দীওয়ান রয়েছে। ৫৬৪খ্রি. মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (দ্র. ড. আবদুল হালিম নদভী, আরবী আসলী তারীখ (দিল্লি: তা.বি.), খ. ১. পৃ. ২৪২; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দিন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪)

৪৬ ড. ইয়াহইয়া আল-শামী, শারহুল মু'আল্লাকাতিল 'আশার (বৈরুত: দারুল ফিকর আল-'আরাবী, ১৯৯৪খ্রি.), পৃ. ৪০।

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى ** لكا لطول المرخى وثنياه باليد

متى ما يشأ يوما يقده لحتفه ** ومن يك في حبل المنية ينقد

“আমি মৃত্যুকে আত্মাকুলের সমসংখ্যক দেখতে পাচ্ছি এবং আগামীকালকে খুব বেশি দূরে মনে করি না। আজকের দিনটা আগামী দিনের কত না কাছাকাছি;

আমার জীবন এক ধনাগার স্বরূপ, যা দিনে দিনে হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে, আর দিন ও কালের গর্ভে ক্ষয়িষ্ণু সেই ধনাগার এক সময় বিলীন হয়ে যাবে;

তোমার জীবনের শপথ, মৃত্যু কোন ব্যক্তিকে সাময়িক অব্যাহতি দিলেও তা একটি দীর্ঘ রজ্জু সদৃশ, যার প্রান্তদেশ হস্তমুষ্ঠিতে ধৃত;

সে যেদিনই ইচ্ছে করবে সেদিনই মৃত্যুর জন্য রশি টান দেবে। আর যে ব্যক্তি মৃত্যু রজ্জুর সাথে বাঁধা আছে তাকে অনুগত হতেই হবে।”

কবি ক্ষণিকের পার্থিব জীবনের অশ্চিয়তা অবলোকন করত: সৎকর্মের মাধ্যমে পাথেয় অর্জন করার উপদেশ দিয়ে বলেন:

ومن يوف لا يذمم ومن يفض قلبه ** إلى مطمئن البر لا يتجمجم

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ** ولو رام أسباب السماء بسلم

“তোমার জীবনের শপথ! এই বহমান কালতো ধার নেয়া বস্তুর ন্যায় ক্ষণিক ও সাময়িক। সুতরাং যত পার সৎকর্ম কর, এতে তোমার পাথেয় সংগ্রহ হবে;

কালচক্রে তোমার কাছে এমন অনেক বিষয় প্রকাশিত হবে যে সম্পর্কে তুমি অজ্ঞ ছিলে। তোমার নিকট যাবতীয় তথ্য নিয়ে আসবে এমন ব্যক্তি, যাকে তুমি কোন পাথেয় দান (নিযুক্ত) করনি।”[৪৭]

জাহিলী যুগের খ্যাতিমান কবি যুহাইর ইবন আবী সুলমা (মৃ. হি. পূ. ১৩/ ৬০৯/১০ খ্রি.)[৪৮] কবিতায়ও যুহদিয়াত-এর আভাষ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মু‘আল্লাকায় মৃত্যু সম্পর্কিত কাব্য লক্ষ্যণীয়। মানুষের কর্মফল লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তা সংরক্ষণ করা হয়। মৃত্যুর পর

---

৪৭ ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, প্রাচীন আরবি কবিতা, ইতিহাস ও সংকলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

৪৮ **যুহাইর বিন সুলামা:** জাহিলী যুগের শীর্ষস্থানীয় কবিদের অন্যতম। আরবি সাহিত্য জগতে তাঁর কাব্য প্রবাদ বাক্য ও তত্ত্বজ্ঞানের আধার। মিথ্যার আশ্রয় ব্যতিরেকে সত্যনিষ্ঠ বক্তব্য, সুন্দর-উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও মার্জিত সাবলীল ভাষায় তাঁর কাব্য রচিত। কাব্যের মানোন্নয়নে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখ করার মত। একটি কাসিদা রচনা করতে তিনি প্রায় এক বছর সময় নিতেন। তিনি আনুমানিক ৯০ বছর বয়সে ৬০৯/১০ খ্রি মৃত্যুবরণ করেন। (দ্র. ড. শাওকী দ্বাফয়, তারীখুল ‘আদাবিল ‘আরাবী: আল-আসরুল জাহিলী, পৃ. ৩০০; আহমদ হাসান যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; ড. উমর ফাররূখ, তারীখুল আদাবিল ‘আরাবী (বৈরুত: দারুল ‘ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৪খ্রি.), খ.১, পৃ. ১৯৫)

মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং দুনিয়ার কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে। ইসলামের এ ভাবধারাটিই কবির নিম্নোক্ত কবিতায় ফুটে উঠে[৪৯]:

فلا تكتمن الله ما في صدوركم ** ليخفى ومهما يكتم الله يعلم

يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ** ليوم الحساب او يعجل فينقم

"তোমাদের অন্তরের দুরভিসন্ধি যা আছে তা গোপন থাকবে ভেবে তোমরা আল্লাহর নিকট হতে কোন কিছু লুকিয়ে রেখোনা; কারণ যখন আল্লাহর নিকট থেকে কোন কিছু গোপন রাখা হয় তিনি তা অবগত হন। (তোমরা যা কিছু কর) তা বিলম্বিত হয়ে একটি খাতায় লিপিবদ্ধ অবস্থায় বিচারের দিনের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত থাকে; অথবা অবিলম্বেই (তোমাদের) কোন কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করা হয়।"

মানুষ মৃত্যু ও তার কারণসমূহকে যতই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেন মৃত্যুবরণ তাকে করতেই হবে। এ সম্পর্কে কবি বলেন[৫০]:

ومن يوف لا يذهم ومن يفض قلبه ** إلى مطمئن البر لا يتجمجم

ومن هاب اسباب المنايا ينلنه ** وإن يرق اسباب السماء بسلم

"ওয়াদাপূরণকারী কখনো নিন্দিত হয় না। বস্তুত যাকে তার অন্তর পূণ্যের দিকে পরিচালিত করে সে কখনো অস্থিরতায় ভোগে না; যে মৃত্যুর কারণাদিকে ভয় করে, সে সুউচ্চ সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশের তোরণদ্বারে পৌঁছানোর আশা পোষণ করলেও তাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে।"

জাহিলী যুগের বিখ্যাত কবি নাবিগা আয-যুবইয়ানী (মৃ. হি. পূ. ১৮/৬০৪খ্রি.)-এর কবিতায় 'যুহদিয়াত ফুটে উঠে। তিনি বলেন[৫১]:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ** وليس وراء الله للمرء مذهب

"আমি শপথ করেছি (আল্লাহর নামে), তাই তোমার জন্য কোন সন্দেহের অবকাশ আমি রাখি নি। আর জেনে রেখো মানুষের জন্য আল্লাহকে ছেড়ে পালিয়ে যাবার কোন জায়গা নেই।"

জাহিলিয়্যা যুগে পৌত্তলিকতার বন্ধনমুক্ত হয়ে যাঁরা দ্বীনে হানিফ বা সত্যধর্মের সন্ধানে তৎপর ছিলেন, যুহাইর ইবন আবী সুলমা তাঁদের অন্যতম ছিলেন। প্রজ্ঞা, ন্যায়নীতি, মঙ্গল

---

৪৯ মুহাম্মদ মতিউর রহমান, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫; আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ১৯৯৫খ্রি.), সং. ৩, পৃ. ৭৬।

৫০ দীওয়ানু যুহাইর, পৃ. ১১১; আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবন কুতাইবাহ আল-দীনাওয়ারী, আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা আও তাবাকাতুশ শু'আরা (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫খ্রি.), পৃ. ১৩২।

৫১ মাওসূ'আতুশ-শি'রিল জাহিলী, খ. ২, পৃ. ২৭১।

কামনা ও মহৎচিন্তার প্রবক্তা কবি যুহাইরের কবিতায়ও যুহদিয়াত লক্ষ্য করা যায়। কবি মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করে বলেন[৫২]:

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ** تمته ومن تخطىء يعمر فيهرم

"আমি মৃত্যুকে অন্ধ উষ্ট্রীর মত (ইতস্তত:) পদচারণা করতে দেখেছি; সে যাকে আঘাত করে তার মৃত্যু হয় আর যে তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় সে দীর্ঘায়ু হয় আর বয়োবৃদ্ধ হয়।"

জাহিলী যুগের কবি মুহালহিল ইব্ন রাবী'আ আত-তাগলিবী (মৃ. ৫১৩খ্রি.-৬০০খ্রি.)[৫৩]-এর কবিতায় দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি তথা যুহদিয়াতের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন, তিনি তাঁর ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে বলেন[৫৪]:

كليب لا خير في الدنيا ومن فيها ** إن أنت خليتها في من يخليها

"হে কুলায়ব! দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু রয়েছে তার কোনটিতেই কোন মঙ্গল নেই। যদি তুমি দুনিয়া ছেড়ে দাও, আর কে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল সে সংবাদেও নেই কোন গুরুত্ব ও আকর্ষণ।"

কবি মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী ও অবধারিত মৃত্যু সম্পর্কে বলেন:

وإنا سوف تدركنا المنايا ** مقدرة لنا ومقدرينا

"অচিরেই মৃত্যু আমাদেরকে পাকড়াও করবে, যে মৃত্যু আমাদের ভাগ্যে লিখিত আছে এবং ঐ মৃত্যু আমাদের সকলের জন্য অবধারিত।"

ইয়াহুদী কবি আস সামাও'আল ইবন আদিয়া মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের ব্যাপারে রচনা করেন[৫৫]:

ميت دهر قد كنت، ثم حييت ** وحياتي رهن بأن سأموت

অর্থ: "আমি তো যুগ যুগ ধরে মৃতই ছিলাম। অতঃপর জীবিত হলাম আর আমার জীবন তো বন্ধক রাখা এই শর্তে যে, অচিরেই আমাদের মরতে হবে।"

---

৫২ আবূ যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবীল খাত্তাব আল-কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব (বৈরুত: দারু সাদির, তা.বি.), পৃ. ১১১।

৫৩ মুহালহিল ইব্ন রাবী'আ: জাহিলী যুগের কবিদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কবি। কবি তাঁর ভাই কুলাইবের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকগাঁথা রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত কাসিদার সংখ্যা ৩০টি। ৫১৩ খ্রি. কবি মৃত্যুবরণ করেন। (দ্র. আবু তাম্মাম, দিওয়ান আল-হামাসাহ (মিসর: মাতবা'আহ আল-তাওফিক, ১৩২২হি.), খ. ১, পৃ. ২৭৭)

৫৪ আতম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৯০-৯১

৫৫ ইবন সাল্লাম, ত্বাবাকাতুশ শু'আরা (বৈরুত: ১৯৮০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭১।

ইসলামী যুগে যুহদ কবিতা

জাহিলী যুগের যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ইসলাম নতুনত্ব আনে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কবিতা ও খুতবা। এ দুটি জাহিলী যুগেরই শিল্প। জাহিলী যুগ থেকেই কবিতা ছিল আরববাসীর ভূষণ। সে যুগে আরবি কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। ইসলামী যুগেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে কবি ছিলেন না। তবে তিনি কবিতা শুনেছেন, আবৃত্তি করেছেন

কবিদেরকে উৎসাহ এবং মর্যাদা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ কবিতা সম্পর্কে (সা) বলেন:

إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق فلا خير فيه

"কবিতা সুসামঞ্জস্য কথামালা, যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ সে কবিতা সুন্দর, আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ সে কবিতায় কোন মঙ্গল নেই।" [৫৬]

ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব জাতির সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ করে ইসলাম তাদেরকে একই জাতিভুক্ত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো প্রদান, খালিস দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ, সামাজিকভাবে বিভিন্ন মতাদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে সহস্রাধিক স্বত্ত্বার পূজা-অর্চনা থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি মনোনিবেশের কথা বাতলে দিয়েছে।[৫৭] কাব্য সাহিত্যেও এই নতুন আন্দোলনের ঢেউ লাগে। সাহিত্যের বিষয়বস্তুতেও নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা হতে থাকে। কুরআনের প্রভাবে চিন্তা-চেতনায় নতুনত্ব এবং কুরআন ও হাদিসের ভাষা, বর্ণনা শৈলী, কৌশল এ সময়ের কাব্যধারাকে প্রভাবান্বিত করে। এ সময়ের কাব্য চর্চার ভাষা ও ভাবে, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে, উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় শক্তিশালী ও প্রভাবময় আল-কুরআনের সুস্পষ্ট প্রভাব ফুটে উঠতো।[৫৮] কাফির-মুশরিক কবিরা নানা কবিতার মাধ্যমে ইসলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবীদের[৫৯] নিয়ে কুৎসা ও নিন্দা করতো। সাহাবী কবিগণ রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলিমদের

---

৫৬ ইবনু রশীক আল-কায়রাওয়ানী, কিতাবুল উমদা (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯০৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪।

৫৭ আশরাফ আলী, আল-আদাবুল 'আরাবী (সৌদিআরব: ১৯৯০ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫০-৫১।

৫৮ আবদুল মুনঈম আল-খাফাজী, আল্ হায়াতু আল্-আদাবিয়্যা ফী আসরি সাদরিল ইসলাম (বৈরুত: ১৯৮৪ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৬৯; মুহাম্মদ ইবন আবু বকর আর-রাযী, মুখতার আস-সিহাহ (বৈরুত: ১৯৮৭খ্রি.), পৃ. ২৮৮।

৫৯ সাহাবী শব্দের অর্থ- সঙ্গী, সাথী, সহচর ইত্যাদি। পরিভাষায়: সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হয়েছেন এবং ইসলামের ওপর থেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। (দ্র.ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (ঢাকা: বি.আই.সি. ১৯৮৭খ্রি.), খ. ১, ভূমিকা।

মর্যাদা সুখ্যাতি প্রচার করে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।[৬০] যুহদ কবিতাও এ সময় সংযোজিত হয়। এজন্য এ যুগকে যুহদিয়াত কবিতার প্রস্তুতির যুগ বলা হয়। এ সময় সীমিত আকারে বিভিন্ন কবির কবিতায় যুহদিয়াত লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি কবিতা রচনা করেন কবি হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা)। যাঁকে 'শা'য়েরুর-রাসূল' নামে আখ্যায়িত করা হয়। আরবদের মতে তিনি মক্কা, মদিনা ও তায়েফের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। জাহিলী যুগে ৫৬৩ খ্রি. মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন।[৬১] জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই তিনি কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। উকায মেলায় তিনি খ্যাতিমান কবিদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। রাসূল (সা) হিজরত করে মদিনায় এলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কবিতার মাধ্যমে ইসলামকে কটাক্ষকারী কাফিরদের জবাব দিতেন।[৬২] তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর যুগে ৫৪হি./৬৭৪খ্রি. ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও আল্লাহর প্রশংসায় তিনি লিখেন[৬৩]:

نبي اتانا بعد ياس وفترة *** من الرسل , والاوثان في الارض تعبد

فأمسى سراجًا مستنيرًا وهاديًا** يلوح كما لاح الصقيلُ المهندُ

وأنذرَنا نارًا وبشّر جنةً** * وعلّمنا الإسلامَ فاللهَ نحمدُ

وأنت إلهَ الخلق ربي وخالقي** * بذلك ما عمّرتُ في الناس أشهدُ

"তিনি এমন নবী, যিনি নিরাশা ও রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। যখন বিশ্বে মূর্তি পূজা অবারিত ছিল। অতঃপর তিনি আলোকিত সূর্যরূপে এবং হিদায়াতকারীরূপে প্রতিভাত হলেন। তিনি ঝলমলিয়ে উঠলেন যেমন হিন্দুস্তানী স্বচ্ছ-ধারালো তরবারি ঝলমল করে। তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করলেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। আর আমাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন তা-ই আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি। হে আল্লাহ! তুমি সৃষ্টিকুলের ইলাহ! তুমি আমার প্রতিপালক ও স্রষ্টা, যতদিন আমি জীবিত থাকি, মানুষের মাঝে এ সাক্ষ্যই দিতে থাকবো।"

---

৬০ হান্না আল-ফাখুরী, আল-জামি ফি তারিখিল আদাবিল আরাবি আল-আদাবুল কাদিম, পৃ. ৩৮৮।

৬১ ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; ইবন কুতাইবা, কিতাবুশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা (লাইডেন: ই.জে.ব্রিল. ১৯০২ খ্রি.), পৃ. ১৭০

৬২ জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা, খ. ১, পৃ. ১৫০।

৬৩ হান্না আল-ফাখুরী, তারিখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ২৩১-২৩৭।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর তাঁর সুযোগ্য খলীফাগণ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এ যুগেও কবিতাচর্চায় তেমন ভাটা পড়েনি। খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রত্যেকে কবি ছিলেন। সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব বলেন:[৬৪] 'আবু বকর (রা) ও উমার (রা) কবি ছিলেন, আর 'আলী (রা) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।' রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা মসজিদে নববীতেও কবিতা আবৃত্তি করতেন।[৬৫] খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়, তাতে উভয়পক্ষে অসংখ্য কবি অংশ গ্রহণ করতেন এবং নিজ নিজ পক্ষের শৌর্য-বীর্যের বর্ণনা ও শত্রুর নিন্দামূলক কবিতা এবং যুদ্ধে হতাহতদের শোক প্রকাশ করে মরসিয়া বা শোকগাঁথা রচনা করতেন। খোলাফায়ে রাশেদার কারো কারো কবিতায় যুহদিয়াত প্রকাশ পেয়েছে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) কবি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় কবিতা আবৃত্তি করতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হাস্‌সান (রা)-কে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনার নির্দেশ দেন এবং তাকে আবু বকর (রা)-এর সহযোগিতা নেওয়ার জন্য বলেন[৬৬]:

اهجهم ومعك جبرئيل روح القدس ابابكر يعلمك تلك الهنات

"তুমি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কাব্য আবৃত্তি কর, জিব্রাইল (আ) তোমার সাথে রয়েছেন আর আবূ বকর-এর নিকট যাও, তিনি তোমাকে বংশ তালিকা সম্পর্কে জ্ঞাত করবেন।" আবু বকর (রা) মৃত্যু সম্পর্কে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করতেন[৬৭]:

كل امرئ مصبح في اهله ** والموت ادني من شراك نعله

"সকলেই তার পরিবারের সাথে সকাল কাটায়, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে।"

হিজরতের রাতের স্মৃতিচারণ করে তিনি রচনা করেন[৬৮]:

قال النبي ولم اجزع يؤقربي ** ونحن في سدف من ظلمة الغار

ولا تخش شيئا فان الله ثالثنا ** وقد توكل لي منه بإظهار

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যেন ভীতসন্ত্রস্ত না হই, তিনি আমাকে সম্মান করেন- এ সময় আমরা গুহায় আঁধারে নিমজ্জিত ছিলাম। তিনি অভয় দিয়ে

---

৬৪ শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবন আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদ আল-ফারীদ (মিশর: ১৩৫৩হি./১৯৩৫ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৮৩।

৬৫ ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারিখ আল-আদাব আল-আরাবি (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৩খ্রি.), ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৪৫।

৬৬ ইবন 'আবদি রাব্বিহি, আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫।

৬৭ শিহাব উদ্দিন আহমদ ইবন রাব্বিহ, আল-ইকদুল ফারিদ (মিসর: দারু মুস্তফা, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ৩১৫।

৬৮ ইবন কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (মিসর: দারুল ফিকর আল-'আরবী, ৩৫১হি./১৯৩৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৮৩।

বললেন: আমাদের সাথে তৃতীয়সত্ত্বা আল্লাহ রয়েছেন, ভয় করো না। তার পক্ষ থেকে আমার জন্য তাওয়াক্কুল ছিল একটি সুস্পষ্ট বিষয়।"

খলিফা ওমর (রা) কবিতা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতেন। কোনো প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তারা তাদের কবিদের কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো এবং তিনি নিজেও কোনো কোনো সময় সেসব কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করতেন। কাব্য চর্চাকে উৎসাহিত করতে তিনি শিশু-কিশোরদেরকে কাব্য শিক্ষা দিতে বলতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার ও তীরনিক্ষেপ শিক্ষা দাও। ঘোড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বল। আর তাদের উত্তম কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও।"[৬৯] তিনি কবিতা সম্পর্কে বলতেন[৭০]:

الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه

"কবিতা হল কোন জাতির এমনই এক জ্ঞান ভাণ্ডার, যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন জ্ঞান নেই।" ওমর (রা) শুধু কাব্যপ্রেমিই ছিলেন না, তিনি কাব্য-সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচকও ছিলেন।[৭১] ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন[৭২]:

له علينا اياد ما لها غير ** الحمد لله ذي المن وجبت

وأن أحمد نبي عنده الخير ** و قد بدأنا لكذبنا فقال لنا

نبي صادق أتي بالحق من ثقة ** وافي الأمانة ما في عوده خور

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি অনুগ্রহকারী, তাঁর প্রশংসা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, অন্য কারো নয়। আমরা মিথ্যায় আচ্ছন্ন ছিলাম, অতঃপর তিনি সত্য কথা বললেন, তিনি যে নবী তাঁর কাছে সকল খবর আছে। অনন্তর আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আর আহমদ আজ আমাদের মাঝে একজন কল্যাণকামী ব্যক্তি। তিনি সত্যনবী, পূর্ণ আশ্বাসে পূর্ণ ভরসায় তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন। তিনি পূর্ণরূপে আমানত আদায়কারী, তাঁর পথে কোন অত্যাচার নাই।"

---

৬৯ জাবী জাযাহ আলি ফাহমী, হুসনুস সাহাবা (কায়রো: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৩১৪ হি.), পৃ. ৫১।

৭০ ইব্ন রাশিক, আল-'উমদাহ (তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৯।

৭১ ইবন কুতাইবা, আশশির ওয়াশ শু'আরা (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৩১৫ হি.), পৃ. ৬৫।

৭২ ইবনু হিশাম, আল-সিরাতুল নববিয়্যা (কায়রো: ১৯৮৭খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪৩।

নম্রতা ও বিনয়ের গুণে গুণান্বিত হবার প্রতি উৎসাহ দিতে গিয়ে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:[৭৩]

خفِّض عليك فإنّ الأمورَ ** بكفِّ الإله مقاديرُها

فليس بآتيكَ منهيُّها ** ولا قاصرٌ عنك مأمورها

"নিজের ব্যাপারে কোমলতা অবলম্বন কর। কেননা সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রণাধিকার ও পরিমাপ নির্ধারণ আল্লাহর হাতে। সুতরাং নিষিদ্ধ বস্তু তোমার নিকট আসার নয় এবং নির্দেশিত কাজ তোমার থেকে হ্রাস পাবার নয়।" মৃত্যু শয্যায় খলিফা ওমর স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহর কোলে শায়িত অবস্থায় নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করেন[৭৪]:

ظلوم لنفسي ولكني مسلم ** أصلي الصلاة كلها وأصوم

"আমি আমার আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছি, আমি মুসলমান, আমি প্রত্যেক সালাত আদায় করি ও সিয়াম পালন করি।"

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) কবিতা পছন্দ করতেন। তিনি কিছু কিছু কবিতা রচনাও করেছিলেন। দানশীল ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইসলামের ইতিহাসে কিংবদন্তী হয়ে আছেন। তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়েও দুনিয়া ত্যাগী মানুষের মতোই জীবন-যাপন করেছেন। তাঁর সহায়-সম্পদ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন কাজে তিনি ব্যয় করেছেন। তাঁর রচিত নিম্নোক্ত পঙক্তিদ্বয় যুহদিতয়াত কবিতার অন্তর্গত : [৭৫]

غِنى النَفسِ يَكفي النَفسَ حَتّى يَكُفَّها ** وَإِن أَعسَرَت حَتّى يَضُرُّ بِها الفُقرُ

فَما عَسرةٌ فَاصبِر لَها إِن لَقيتَها ** بِدائِمَةٍ حَتّى يَكونُ لَها يُسرُ

"আত্মার ধনাঢ্যতা আত্মাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়; এমনকি সে যদি দরিদ্রও হয়ে যায় তবুও তার এই আত্মার ধনাঢ্যতা তাকে সর্ব প্রকারের ক্ষতি থেকে ফিরিয়ে রাখে; দুঃখ-কষ্ট কিছুই না; যদি তা তোমার উপর আপতিত হয় তাহলে ধৈর্য্যধারন কর। কেননা, এই দুঃখ-কষ্টের পর পরই সুখ ও শান্তি রয়েছে।"

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) একদল বিভ্রান্ত ও কুচক্রী বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের দিন ভালো জামা-কাপড় পরিধান করে নামায আদায়ের

---

৭৩ ইউসুফ কান্দলভী, হায়াতুস সাহাবা (লাহোর: ইশারায়ে নাশরিয়্যাত-ই-ইসলামী, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ৩৬।

৭৪ ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফীত-তারিখ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮৭খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৮।

৭৫ ড. আবদুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১২০

পর কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায়ই শাহাদাতের সূধা পান করেন। সেদিন তিনি নিম্নোক্ত চরণদ্বয় বেশি বেশি আবৃত্তি করেন[৭৬]:

أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع ** لعاذ ملاذا في البلاد ومرتعا

يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ** ويأتي الجبال الموت في شماريخها العلا

"আমি মৃত্যুকে দেখেছি কোন ক্ষমতাবানকেও অব্যাহতি দেয় না। সে 'আদ জাতির জন্য নগরসমূহে না রেখেছে কোন ঠাঁই, আর না রেখেছে কোন চারণভূমি, দুর্গবাসীগণ দুর্গের দ্বার বন্ধ করে বসবাস করা সত্ত্বেও মৃত্যু পাহাড়ের চূড়ায় মুহূর্তেই হাজির হয়।"

দুনিয়ার জিন্দেগি মুমিনের নিকট তুচ্ছ বৈ কিছুই নয়। অপরদিকে আখেরাতের চূড়ান্ত সফলতাই মুমিনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে উসমান (রা) সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন[৭৭]-

وما عسرة فاصبرلها ان لقيتها ** بكائنة الا ستعبها يسر

"দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে; কেননা দুঃখের পরই রয়েছে অনন্ত শান্তি।"

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী[৭৮] আরবী ভাষা ও সাহিত্যের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। অসাধারণ কাব্য-প্রতিভা ও বিরল পাণ্ডিত্যের কারণে তিনি আরবী সাহিত্যের অনেক উৎকর্ষ সাধন করেন। আরবী সাহিত্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সে যুগে তিনি আরব কবিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর কবিতা সংকলন "দীওয়ানু আলী" নামে খ্যাত। কবিতা সম্পর্কে তিনি বলতেন:[৭৯] "কবিতা হলো কোন জাতির পরিমাপযন্ত্র বা কথার পরিমাপদণ্ড।" হযরত আলী (রা.) বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন, তবে বীরত্ব, যুদ্ধ

---

৭৬ ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত: ১৯৬৮ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১৮৩-১০৮৪।

৭৭ ইউসুফ কান্দলভী, হায়াতুস সাহাবা, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

৭৮ আলী ইবনে আবু তালিব ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই, ইসলামের চতুর্থ খলিফা, ইসলামী উপাখ্যান ও কিংবদন্তির বীরপুরুষ, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের কনিষ্ঠতম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রা)-এর স্বামী ও ইমাম হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-এর পিতা। অতুলনীয় বাগ্মী মহান ও শ্রেষ্ঠ সিপাহসালার, অসাধারণ চিন্তাশীল ও দূরদর্শী পুরুষ এবং বহুবিধ গুণ ও মর্যাদার অধিকারী। নবুওয়াতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইবন মুলজিম নামক এক আততায়ীর হাতে চলিণ্ডশ হিজরির ১৭ রমযান সাহরির সময় জুমার দিন শাহাদাত বরণ করেন। (দ্র. ইবনে সাদ, তাবাকাত, ৩য় খণ্ড, (বৈরুত: ১৩৭৭/১৯৫৭), পৃ. ১৯-২২; ইবনে কাছির, আল-বিদায়াহ ওয়া আল-নেহায়াহ, ৭ম খণ্ড, (বৈরুত : মাতবা' আল-মা'আরিফ, ১৯৭৪ খৃ./১৩৭৪হি.), পৃ. ২৩০; ৩৩০-৩১-৩৫৯-৭০; আল্লামা সুলাইমান নদভী : সাহাবা চরিত, অনুবাদক, আখতার ফারুক, ১ম খন্ড, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৮৬), পৃ. ৩২৬-২৭, ৩৩১; The Encyclopedia of Islam, Vol. 1 (London: Seerah Foundation, 1981), p. 384; ড. আহমদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম (মিশর: মাকতাবাহ আল-নাহদাহ, ১৯৭৫), পৃ. ১৪৭)

৭৯ ইবন রশিক, উমদা ফি মাহাসিন আশশির ওয়া আদাবিহি ওয়া নাকদিহি, মহিউদ্দিন আবদুল হামিদ সম্পাদিত (বৈরুত: দারুর রশাদ আল-হাদিসাহ, ১৯৩৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০।

ও জ্ঞান গর্ভ বিষয়েই তাঁর কবিতা বেশি। তাঁর রচিত অনেক কবিতায়ই যুহদিয়াতের কথা উঠে এসেছে। আলী (রা) পার্থিব সম্পদের মোহ সম্পর্কে বলেন[৮০]:

جَميعُ فَوائِدِ الدُنيا غُرورُ ** وَلا يَبقى لِمَسرورٍ سُرورُ

فَقُل لِلشامِتينَ بِنا أَفيقوا ** فَإِنَّ نَوائِبَ الدُنيا تَدورُ

"পৃথিবীর যাবতীয় ধন স্রেফ প্রবঞ্চনা, এখানে কোন সুখীর সুখ-ই চিরন্তন নয়। কাজেই বিপদ দেখে যারা খুশী হয় তাদেরকে বলে দাও যে, আমাদের সাথে সম্বিত ফিরিয়ে নাও আর মনে রেখো-পার্থিব সংকট শুধু চক্কর লাগায়।"

কবি পৃথিবীর নশ্বরতা ও নিত্যতাকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করে বলেছেন: [৮১]

إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت ** إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت

ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ** ولعمري عن قليل كل من فيها يموت

"নিশ্চয় দুনিয়া নশ্বর, এর কোন স্থায়িত্ব নেই, এই দুনিয়ার উপমা হলো মাকড়সার তৈরি করা ঘর; ওহে দুনিয়ার অন্বেষণকারী ! দিনের খোরাকই তোমার জন্য যথেষ্ট, আর আমার জীবনের শপথ! খুব শিগগীর এ দুনিয়ার বুকে যারা আছে, সবাই মারা যাবে।"

আলী (রা) আখেরাতের হিসাব-নিকাশ এবং প্রকৃত মালিকের সাক্ষাত সম্পর্কে বলেন:[৮২]

إنما يحفظ التقى الأبرار ** وإلي الله يستقر القرار

وإلي الله ترجعون وعند الله ** هـ ورد الأمور والأصدار

كل شيء أحصي كتابا وعلما ** ولديه تجلت الأسرار

"নিশ্চয়ই খোদাভীতি কেবলমাত্র পূণ্যবানগণ সংরক্ষণ করে রাখে, আর আল্লাহর নিকট রয়েছে চির আরাম-আয়েশ স্থল। তোমরা আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন করবে এবং সকলেরই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হতে হবে। লেখনী ও জ্ঞানের দ্বারা তিনি সবকিছুর হিসাব-নিকাশ করে রেখেছেন, আর তাঁর নিকট প্রত্যেক গোপন বিষয় সুস্পষ্ট।"

ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল পৃথিবীতে স্থায়ী প্রশান্তি পাওয়া যাবে না। পার্থিব জীবনের অসারতা বর্ণনা করে আলী (রা) বলেন:

تحرز من الدنيا فإن فناءها ** محل فناء لا محل بقاء

---

৮০ আলী (রা.), দিওয়ান-ই-আলী (রা.) (ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০২ খ্রি:), খ. ১, পৃ. ১৮৮

৮১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৮২ ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখুল আদাব আল-আরবী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৯৩-৯৪।

فصفوتها ممزوجة بكدورة ** وراحتها مقرونة بعناء

“দুনিয়া হতে আত্মরক্ষা কর, কেননা এটি ধ্বংশীল, স্থায়ী নিবাস নয়; সুতরাং এর নির্মলতাও আবর্জনাময় এবং এর প্রশান্তিও শ্রান্তির সাথে সম্পৃক্ত।”[৮৩]

লাবীদ ইবন রাবীয়া (মৃ. ৪১ হি.) ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূল (সা)-এর সভাকবি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।[৮৪] ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী মূলনীতির অনুসরণ করে দুনিয়া ও তার ফিৎনার উপকরণ থেকে মানুষকে সাবধান করেছেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি পূর্ববর্তী জাতি সমূহের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করে মৃত্যু, হিসাব-নিকাশ, তাকওয়া, নেক আমল এবং দুনিয়া অস্থায়ীত্ব তুলে ধরেছেন। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, প্রতিটি মানুষেরই নিজের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করা অত্যাবশ্যক। কবি লাবীদ বলেন:[৮৫]

ألا كُلُّ شيءٍ ما خَلا الله باطِلُ ** وكلُّ نعيمٍ لا مَحالةَ زائِل

وكل ابن أنثى لو تطاول عمره ** إلى الغاية القصوى فللقبر ايل

وكلُّ أُنَاسٍ سوْفَ تَدخُلُ بَينَهُمْ ** دُوَيْهِيةٌ تصفَرُّ مِنها الأنَامِل

وكلُّ امرىءٍ يَوْماً سيعلمُ سعيهُ **إذا كُشِّفَتْ عندَ الإلَهِ المحاصِلُ

“আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু নশ্বর (ধ্বংসশীল) এবং সকল নিয়ামত (সুখ-সম্পদ) নিশ্চয়ই একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে;

সকল নারীর সন্তান যতদিন যত দীর্ঘায়ুই হোক না কেন, জগতের শেষাবধি দীর্ঘ হলেও তথাপি তাকে কবরেই যেতে হবে;

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতিসত্ত্বর এমন বেশে মৃত্যু প্রবেশ করবে, যার কারণে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে;

প্রতিটি মানুষ অতি শীঘ্র একদিন তার চেষ্টা-সাধনাকে জানতে পারবে। যখন আল্লাহর নিকট তার ফলাফল প্রকাশ পাবে।”

---

৮৩ ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাচীন আরবি কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০।

৮৪ ইসলাম গ্রহণের পর কুরআন অধ্যয়নে ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনেকের মতে এ সময় তিনি কুরআনের প্রভাবে কাব্যচর্চা পরিত্যাগ করেন। (দ্র. আতম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; হান্না আল-ফাখুরী, তারিখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫)

৮৫ ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৩।

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর উদাহরণ দিতে গিয়ে কবি বলেন:

وما الناس إلا كالديار وأهلها *** بها يوم حلوها وغدوا بلاقع

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه *** يحور رمادا بعد إذ هو ساطع

وما البر إلا مضمرات من التقى *** وما المال إلا معمرات ودائع

"পৃথিবীতে মানুষের উদাহরণ হল ঘর এবং সে ঘরে বসবাসকারীদের মত, যেদিন তারা সে ঘর খালি করে চলে যায় সেদিন তা বিরানভূমি হয়ে যায়। মানুষের উদাহরণ হল- উল্কা এবং তার আলোকরশ্মির মতো, যে প্রজ্জ্বলিত হবার পর বালুকারাশিতে পরিণত হয়। নেক কাজ, সেতো গোপন তাকওয়া। আর ধন-সম্পদ, সেতো ঋণ ও আমানত।"[৮৬]

কবি আরও বলেন:[৮৭]

والمال والاهلون الا ودائع ** ولابد يوما ان ترد الودائع

وما الناس الاعاملان: فعمال ** يتبر ما يبنى وآخر دافع

"দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমানত বৈ আর কিছু নয়, অবশ্যই এ আমানত একদিন ফেরত দিতে হবে। সকল মানুষ করে যাচ্ছে, কিন্তু দু'ভাবে; এক শ্রেণি ধ্বংসের জন্য কাজ করে, আর একদল প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।"

কবি সর্বদা প্রকৃত মালিকের সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতায় বলেন[৮৮],

إِنَّما يَحفَظُ التُقى الأَبرارُ ** وَإِلى اللَهِ يَستَقِرُّ القَرارُ

وَإِلى اللَهِ تُرجَعونَ وَعِندَ ** اللَهِ وِردُ الأُمورِ وَالإِصدارُ

إِن يَكُن في الحَياةِ خَيرٌ فَقَد أُن ** ظِرتُ لَو كانَ يَنفَعُ الإِنظارُ

عِشتُ دَهراً وَلا يَدومُ عَلى ال ** أَيّامِ إِلّا يَرَمرَمٌ وَتِعارُ

"নিশ্চয়ই খোদাভীতি কেবলমাত্র পূণ্যবান সংরক্ষণ করে রাখে, আর আল্লাহর নিকট রয়েছে চির আরাম-আয়েশ স্থল;

আল্লাহর নিকটই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে এবং আল্লাহর নিকট সকলকে উপস্থিত হতে হবে;

যদি জীবনের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত থাকতো, তবে আমি সুযোগ লাভ করতাম, কিন্তু সুযোগ কল্যাণকর নয়;

আমি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচেছিলাম। কিন্তু সময়ের বিচারে ইয়ারমুম ও তেয়ারের পাহাড়ই টিকে থাকতে পারে।"

---

৮৬ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২-৯৩।

৮৭ ড. আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

৮৮ ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৩-৯৪।

কবি লাবীদ তাকওয়া, পূণ্য ও নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন; যাতে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের সময় মানুষের অঞ্চল কলংকযুক্ত না হয়। কবি বলেন[৮৯]:

إِنَّ تَقوى رَبِّنا خَيرُ نَفَل** وَبِإِذنِ اللَهِ رَيثي وَعَجَل

أَحمَدُ اللَهَ فَلا نِدَّ لَهُ ** بِيَدَيهِ الخَيرُ ما شاءَ فَعَل

"আল্লাহ ভীতি হচ্ছে উৎকৃষ্ট নিয়ত। আমার বিলম্ব ও তাড়াহুড়া আদেশ প্রসূত। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, যাঁর কোন শরীক ও সমতূল্য নেই। তিনি কল্যাণের মালিক, তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রতিহত কর, প্রবৃত্তির চাহিদাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তার ইচ্ছা পূরণ করা খুবই অবমাননাকর। কিন্তু তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না, তাকে পূণ্যের অনুসারী করে গড়ে তোলো। সময় আল্লাহ তা'আলাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"

মু'আল্লাকার খ্যাতনামা কবি যুহায়র (রা) ইবন আবী সুলমা। নজদ প্রদেশের মুদার গোত্রের শাখা মুযায়না গোত্রের ঐহিত্যবাহী কবি পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি ও পুত্র কা'ব ইবন যুহায়র সকলেই বিশিষ্ট কবি ছিলেন।[৯০] তাঁর কবিতায় যুহদিয়াত পরিলক্ষিত হয়। যুহদিয়াতের অন্যতম বিষয় মৃত্যু সম্পর্কে তিনি বলেন[৯১]:

تراك الأرض امامت حقا ** وتحى ما حييت بها ثقيلا

"পৃথিবী তোমাকে দেখেছে যে, হয়তো তুমি সত্যের উপর মৃত্যুবরণ করবে অথবা পৃথিবীতে যতদিন জীবিত থাক ভারী বোঝা হয়ে জীবিত থাকবে।"

কামনা-বাসনা ও মৃত্যু সম্পর্কে তিনি আরও বলেন:

و المرء ما عاش ممدود له أمل ** لا تنتهى العين حتى ينتهي الأثر

"মানুষ যতদিন জীবিত থাকে তার কামনা বাসনা দীর্ঘতর হতে থাকে। চোখের কামনা শেষ হয় না যতদিন না তার নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয় (অর্থাৎ মৃত্যু হয়)।"[৯২]

জু'দা গোত্রের কবি আবূ লায়লা কায়স ইবন 'আব্দুল্লাহকে কবিতা বলার প্রবাহের জন্য নাবিঘাহ (প্রবহমান) বলা হয়।[৯৩] তিনি গৌরবগাঁথা, প্রশংসাগীতি, ব্যঙ্গ কবিতা, শোকগাঁথা

---

৮৯ ড. মুক্তাদা হাসান আয্হারী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৯০ ড. ত্বাহা হুসাইন, ফিশ শি'রিল জাহিলী, পৃ. ৩০৬-৩০৯।

৯১ ইবন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ (বৈরুত: দারুল কুতুব আর-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৩০২।

৯২ ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

ইত্যাদি সব ধরনের কবিতা রচনা করেছেন। 'যুহদিয়াত'-এর সংশ্লিষ্ট কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত তাঁর কবিতার নমুনা হচ্ছে:[৯৪]

الحَمدُ لِلَهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ ** مَن لَمَ يَقُلها فَنَفسَهُ ظَلَما

المولِجِ الليلَ في النهارِ ** وَفِي الليلِ نَهاراً يُفرِّجُ الظُّلَما

الخافِضِ الرافِعِ السَماءَ عَلى ال ** أَرضِ وَلَمَ يَبنِ تَحتَها دِعَما

الخالِقِ البارِئِ المصَوِّرِ في ال ** أَرحامِ ماءً حَتّى يَصِيرَ دَما

مِن نُطفَةٍ قَدَّها مُقدّرُها ** يَخلُقُ مِنها الأَبشارَ وَالنَسَما

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার, যার কোন শরিক নেই; যে ব্যক্তি একথা স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে সে নিজেই নিজের উপর জুলুম করবে। তিনি অন্ধকার বিদীর্ণ করে রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন, তিনি নির্যাতনকে লাঘব করেন। আকাশকে তিনি মাটির উপরের উর্দ্ধলোকে কোন স্তম্ভ ছাড়াই স্থাপন করেছেন। তিনি স্রষ্টা ও উদ্ভাবক। মায়ের গর্ভে পানিকে রক্তের রূপ দেন এবং তদ্বারা প্রাণীকুল সৃষ্টি করেন।"

কবির উপরোক্ত চরণদ্বয়ে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর প্রতিধ্বনি। আল্লাহ বলেন: [৯৫]

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ

"তিনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন, তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। তিনি যাকে ইচ্ছা অমরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন।"

আবস গোত্রের কবি আল-হুত্বাইয়াহ (রা) [মৃ. ৫৯হি.][৯৬]-এর প্রকৃত নাম জাওরওয়াল ইবন আউস। তিনি প্রশংসামূলক, ব্যাঙ্গাত্মক, গৌরবগাঁথা প্রভৃতি বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন।

---

৯৩ নাবিগাহ আল-জুদী (৫৬৮-৬৮৪খ্রি.): জু'দা গোত্রের দীর্ঘজীবী কবিদের অন্যতম। একাধারে ত্রিশ বছর যাবত কবিতা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর জন্য দু'আ করলে তিনি কবিতা বলার শক্তি ফিরে পান। তিনি গৌরবগাঁথা, প্রশংসা, ব্যঙ্গ কবিতা, শোকগাঁথা ইত্যাদি সব ধরনের কবিতা রচনা করেছিলেন। (দ্র. আতম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ১৬৪; ড. শাওকী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯)।

৯৪ আবূ যায়দ মুহাম্মদ ইবন আরাবী খাত্তাব আল-কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল 'আরব, পৃ. ৩৫৭।

৯৫ সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ২৭।

৯৬ কবি হুত্বাইয়ার প্রকৃত নাম আবুল মালিকা জরোয়াল ইবনু আউস আবসী। হুত্বাইয়া যুহাইর ইবনু আবি সালমার সাহচর্যে কবিতা ও সাহিত্য বিষয়ক শিক্ষা লাভ করেন। হুত্বাইয়া মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিংবা রাসূলুল্লাহ-এর ইন্তিকালের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় যে সব

তবে ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তিতে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৯৭] যুহদিয়াত সম্পর্কে তাঁর নিম্নরূপ কবিতা পাওয়া যায়।

কবি আল্লাহ ভীরুতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন:[৯৮]:

وَلَستُ أَرى السَعادَةَ جَمعَ مالٍ** وَلَكِنَّ التَقيَّ هُوَ السَعيدُ

وَتَقوى اللَهِ خَيرُ الزادِ ذُخراً ** وَعِندَ اللَهِ لِلأَتقى مَزيدُ

"ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকে আমি সৌভাগ্যের মাপকাঠি বলে মনে করি না। বরং আল্লাহকে যে ভয় করে সে-ই ভাগ্যবান ও পূণ্যবান। আল্লাহর ভয় উৎকৃষ্ট পাথেয় ও সঞ্চয় এবং আল্লাহভীরু লোকের জন্য আল্লাহর নিকট বিরাট সওয়াব রয়েছে।"

কা'ব ইবনু যুহায়র (রা) (মৃ. ২৬/৬৪৫খ্রি.)[৯৯] জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। যিনি মুখাদরাম কবির প্রথম স্তরের কবি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা রিযিকদাতা। তিনি কাউকে রিযিকবিহীন অবস্থায় রাখেন না। তাছাড়া মৃত্যু যখন এসে যাবে তখন কোন কিছু তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইসলামের এ মর্মবাণী কা'ব-এর নিম্নোক্ত শ্লোক গুলোতে প্রতিফলিত হয়[১০০]:

أَعلَمُ أَنّي مَتى ما يَأتِني قَدَري ** فَلَيسَ يَحبِسُهُ شُحٌّ وَلا شَفَقُ

وَالمرءُ وَالمالُ يَنمي ثُم يُذهِبُهُ ** مَرُّ الدُهورِ وَيُفنيهِ فَيَنسَحِقُ

লোক ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন হুত্বাইয়াও তাদের মধ্যে একজন। পরে অন্যদের সাথে পুনরায় তিনি ইসলাম কবুল করেন। ৫৯ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (দ্র. ড. মুক্তাদা হাসান আয্হারী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, খ.২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০)

৯৭ জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাবি আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ (বৈরুত: মাকতাবাতু দিরাসাত ফী দার আল-ফিকর ১৪১৬হি./১৯৯৬খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫৮।

৯৮ ড. শাওকী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

৯৯ কা'ব (রা) আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতের বিখ্যাত কবি যুহায়ের ইবনু আবি সুলমা-এর পুত্র। হুত্বাইয়ার (রা)-এর মত তিনিও যুহাইরের নিকট থেকে কবিতার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূল (সা)-এর শানে প্রশংসাসূচক কাব্য রচনা করে ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁর নবী স্তুতিমূলক অমর বাক্য قصيدة بانت سعاد/ البردة আরবী কাব্য জগতে অনবদ্য সৃষ্টি। ঐ কবিতার প্রথম পংক্তি নিম্নরূপ:

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول ** متيم اثرها لم يفد مكبول

তিনি ২৬হি./৬৪৫ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। (দ্র. দীওয়ানু কাব ইবন যুহায়র, ড. মুহাম্মদ য়ূসুফ নাজাম সম্পা., (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯৫খ্রি.), ১ম সং, পৃ. ৬-৭; ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫; আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, আল-'আগানী, অধ্যাপক সামীর জাবির সম্পা. (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬খ্রি.), ১ম সং, খ. ১০, পৃ. ৩৩৬ ; ইব্ন কুতাইবা, আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা, আহমদ শাকির সম্পা., (মিশর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৬খ্রি.), ২য় সং, খ. ১, পৃ. ১৩৭; E.J. Brill, Encyclopedia of Islam (Leiden, Netherlands: 1978), Vol. IV, p. 316;` বুতরুস আল-বুস্তানী, 'উদাবা'উল আরাব ফিল জাহিলিয়্যাহ ওয়া সাদরিল ইসলাম (বৈরুত: দারু নাযীর, 'আব্বূদ ১৯৮৯খ্রি.), পৃ. ১২৯)

১০০ ড. শাওকী দ্বায়ফ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৮৭ ; ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী, অনুবাদ, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (রাজশাহী: মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬৫।

فَلا تَخافي عَلَينا الفقرَ وَانتَظِري ** فَضلَ الَّذي بِالغِنى مِن عِندِه نَثِقُ

إِن يَفنَ ما عِندَنا فَاللَهُ يَرزُقُنا ** وَمَن سِوانا وَلَسنا نَحنُ نَرتَزِقُ

"আমি নিশ্চিতভাবে জানি, আমার চূড়ান্ত পরিণাম তথা মৃত্যু এসে পৌঁছলে কৃপণতা বা ভয় তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। মানুষ ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে কিন্তু কালের আবর্তন তা ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং তা বিলুপ্ত করে দেয়। অবশেষে মানুষও শেষ হয়ে যায়। তাই তুমি আমাদের উপর দারিদ্র্য আপতিত হওয়ার ভয় করো না এবং অপেক্ষা কর সেই অনুগ্রহের যা তাঁর নিকট থেকে আমাদের কাছে পৌঁছবে বলে আমি দৃঢ় আস্থা রাখি। আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আল্লাহই আমাদের ও অন্যদেরকে রিযিক দেবেন। আমরা নিজেরা রিযিক চাইবো না।"

কবি সাহম ইবন হানজালা ছিলেন মুখাদরাম কবি। তিনি ছিলেন শামের অধিবাসী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এবং পরে প্রচুর কবিতা তিনি রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় দুনিয়া বিমুখতা লক্ষ্যণীয়। যেমন:[১০১]

لا يَحمِلَنَّكَ إِقتارٌ عَلى زَهَدٍ ** وَلا تَزَل في عَطاءِ اللَهِ مُرتَغِبا

اللَهُ يُخلِفُ ما أَنفَقتَ مُحتَسِباً ** إِذا شَكَرتَ وَيُؤتيكَ الَّذي كَتَبا

"দুনিয়া ত্যাগের উপর কৃপণতা যেন তোমাকে প্ররোচিত না করে, সর্বদাই তুমি আল্লাহর দান সম্পর্কে খুশী ও আগ্রহী থাক;

তুমি যা খরচ কর আল্লাহ তা হিসাব করে তোমাকে দিয়ে দেবেন, যখন তুমি শোকর করবে আর তোমাকে তিনি তা-ই দিবেন যা যা তিনি লিখে রেখেছেন।"

ওহী লেখক হযরত মু'আবিয়া (রা) বিভিন্ন সময় কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতেন। যুহদিয়াতের অন্যতম উপাদান মৃত্যু সম্পর্কে তিনি বলেন[১০২]:

وَتَجَلُّدي لِلشامِتينَ أُريهِمُ ** أَنّي لَرَيبِ الدَهرِ لا أَتَضَعضَعُ

وَإِذا المَنِيَّةُ أَنشَبَت أَظفارَها ** أَلفَيتَ كُلَّ تَميمَةٍ لا تَنفَعُ

"আমি কালো উষ্ট্রীদ্বয়ের জন্য ধৈর্যধারণ করি যেগুলো আমি দেখেছি। আমি যুগের সংশয়ের জন্য অপদস্থ নই। মৃত্যু যখন ছোঁ মেরে নখ ঢুকিয়ে দেবে, তখন তুমি দেখতে পাবে যে, কোন তাবীজ-কবজ কাজে আসছে না।"

---

১০১ ড. আবদুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

১০২ ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত্ তারীখ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭), খ. ১, পৃ. ৩৬৯।

নবী দৌহিত্র হযরত হাসান (রা) দুনিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নিম্নোক্ত কবিতা বার বার আওড়াতেন[১০৩]:

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها *** إن اغترارا بظل زائل حمق

"ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রেমিকেরা শোনো! পড়ন্ত ছায়ার ধোঁকায় পড়ে শুধু নির্বোধ ও আহম্মকরা।"

অন্য আরেকটি কবিতায় তিনি বলেন: [১০৪]

الا انما الدنيا كظل ثنية ** ولابد يوما ان ظلك زائل

"দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ছায়ার মত, নেই তার ভরসা;
ছায়ার মত সেই জেনো, শেষ হবে সহসা।"

উমাইয়া যুগে যুহদ কবিতা

খুলাফায়ে রাশেদীনের পর উমাইয়া যুগেও পবিত্র কুরআনের প্রভাবে আরবী কাব্য চর্চা এক নবদিগন্তের সূচনা করে। এ যুগের কবিতায় ইসলামের প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়। আরব জাতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি উমাইয়া খলিফাগণ বিশেষ নজর রেখেছিলেন। উমাইয়া যুগের সাহিত্যে খাঁটি আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। খলিফাগণ ভাষার বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকতেন।[১০৫] কবিগণ কুরআন, হাদিস ও ইসলামী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন বিধায় ইসলামের উপদেশসমূহ যা শুনতে পেতেন তা কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরতেন। কবিতায় কারো প্রশংসা করলে ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব গুণাবলী প্রশংসনীয় সে সব গুণ উপস্থাপন করতেন। বীরত্বসূচক কবিতায় জিহাদের গুরুত্বসহ দ্বীনের বিভিন্ন শিক্ষা ও নসিহতকে উপজীব্য করে কবিতা রচনা করতেন।"[১০৬] কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে উমাইয়া যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ যুগের কার্যক্রমকে তিনভাবে দেখতে পাওয়া যায়: (১) জাহিলী কবিতার আঙ্গিকে যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনাবাহী কাব্য; (২) ইসলামী চিন্তা-চেতনায় কাব্য রচনা; (৩) ভিনদেশী কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা।[১০৭] তবে এ সময়ে কবিতায় نقائض (পাস্পরিক বিরোধপূর্ণ কবিতা), غزل (প্রেম), خمريات (মদের স্তুতি)মূলক নতুন ভাবধারার

---

১০৩ ইমাম গাযালী, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ২১৪।

১০৪ প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১৫।

১০৫ আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২ (টীকা দ্রষ্টব্য)

১০৬ ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (রাজশাহী: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০৭-১০৮।

১০৭ ড. মুহাম্মদ আবদুল হামীদ আল-রিফায়ী, দিরাসাতু ফী আল-'আসর আল-উমাবী (কায়রো: ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৫১।

কবিতার সৃষ্টি হয়।[১০৮] উমাইয়া যুগের কবিতায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী পরিলক্ষিত হয়, যথা- গাযল (প্রেম) কবিতা, মাদ্হ (প্রশংসা) কবিতা, খামরিয়্যাহ (মদ) বর্ণনা বিষয়ক কবিতা, মারছিয়্যাহ (শোকগাঁথা)মুলক কবিতা, হিজা তথা ব্যঙ্গ কবিতা, ফাখর ও হামাসাহ (গৌরব ও বীরত্বমুলক) কবিতা, আল-হিকমাহ ও ফালসাফাহ (প্রজ্ঞা ও দার্শনিক) কবিতা ইত্যাদি বিষয়াবলী। উমাইয়া যুগের আরবী সাহিত্যে যুহদিয়াত সম্পর্কিত বহু কবিতা রচিত হয়েছে। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মিসকীন আদ দারেমী ৭০৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বেশ কিছু যুহদ কবিতা রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর রচিত কিছু পঙক্তি পেশ করা হলো :[১০৯]

وسميت مسكينا و كانت لحاجة ** و إني لمسكين الي الله راغب

ما انزل الله من امر فاكرهه ** الا سيجعل لي من بعده فرجا

"আমি মিসকীন নামে পরিচিত হয়েছি, আর এটা ছিল বিশেষ প্রেক্ষাপটে; আর নিশ্চয় আমি আল্লাহর নিকট মিসকীন, তাঁরই প্রতি আসক্ত; আল্লাহ এমন কোন বিষয় অবতীর্ণ করেননি যা আমি অপছন্দ করি; এটা ব্যতীত যে, আমার জন্য এরপর স্বস্তি আসবে।"

উমাইয়া যুগের অন্যতম দুনিয়া বিমুখ কবি ও খতীব ছিলেন সাবিক আল বারবারী। আলিম হিসেবেও তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি আল মাওসিলের অন্তর্গত রিক্কার কাযী ও সেখানকার মসজিদের ইমাম ছিলেন। খতীব হিসেবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাক্ওয়া ও দুনিয়া বিরাগমূলক প্রচুর কবিতা তিনি রচনা করেছেন। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ ক্ষণস্থায়ী –একদিন এসব ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষ জমাকৃত সম্পদ রেখে যায় – তা তাঁর অধিকারে থাকে না। এগুলো তাঁর ওয়ারিশদের মালিকানায় চলে যায়। এ সম্পর্কে কবি বলেন :[১১০]

اموالنا ذوي الميراث نجمعها ** ودورنا لخراب الدهر نبنيها

والنفس تكلف بالدنيا و قد علمت ** ان السلامة منها ترك مافيها

"আমাদের যে সম্পদ আমরা জমা করি তাতো উত্তরাধিকারীদের (ওয়ারিসদের), আর যে সব ঘর-বাড়ি আমরা তৈরি করি তাতো সময়ের আবর্তনে একদিন ধ্বংস হবেই; নফস দুনিয়ার

---

১০৮ আল-ফাখুরী, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী (বৈরুত: আল-মাতবা'আতুল বুলিসিয়্যা, তা.বি.), পৃ. ২৬৪।

১০৯ ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, খ.২, পৃ. ৩৭৩

১১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫।

প্রতি আসক্ত, অথচ সে জানে যে, তা থেকে নিরাপদ থাকার উপায় হলো তার মধ্যে যা কিছু আছে তা পরিত্যাগ করা।"

আবুল আসওয়াদ আল দুয়াইলী (রহ.) বানু কিনানা গোত্রের দুওয়াইল শাখায় হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি বসরায় বসবাস করতে থাকেন। তিনি আলী (রা.)-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁর কবিতায় যুহদিয়াত পরিলক্ষিত হয়। এর নমুনা নিম্নরূপ :[১১১]

وَإِذا طَلَبتَ مِنَ الحَوائِجِ حاجَةً ** فادعُ الإِلَهَ وَأَحسِنِ الأَعمالا

إِنَّ العِبادَ وَشَأنَهُم وَأُمورَهُم ** بِيَدِ الإِلَهِ يُقَلِّبُ الأَحوالا

"তুমি যখন তোমার কোন প্রয়োজন চাইবে তখন আল্লাহকে ডাকবে এবং ভালো কাজ করবে;

বান্দা ও তাদের অবস্থার বিষয়াবলী আল্লাহর হাতেই; তিনি অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেন।"

উমাইয়া যুগের বিখ্যাত কবি ফারাযদাক (২০-১১৪হি./৬৪১-৭৩৩খ্রি.)[১১২]-এর কবিতায় যুহদিয়্যাত লক্ষণীয়। মৃত্যুর পূর্বে পরকালের পাথেয় অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেন:

تزود فما نفس بعاملة لها ** إذا ما أتاها بالمنايا حديدها

فيوشك نفس ان تكون حياتها ** وان مسها موت طويلا خلودها

"মৃত্যু আসার পূর্বে তুমি পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ কর, কেননা মৃত্যুর পর সৎকর্ম মানুষকে তার স্মরণ ও স্মৃতিচারণের মাধ্যমে মানুষের মাঝে দীর্ঘদিন জীবিত রাখে।"

উমাইয়া সেনাপতি নাসর ইবনু সাইয়ার (৬৬৩-৭৪৮ খ্রি.)[১১৩] মুজাহিদদেরকে আল্লাহর ভয় সম্পর্কে নসীহত পেশ করতে গিয়ে বলেন:

دع عنك دنيا واهلا انت تاركهم ** ما خير دنيا واهل لا يدومونا

---

১১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪।

১১২ আল-ফারাযদাক: কবি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হতেই কবি কাব্যরচনা আরম্ভ করেন। ফারাযদাক উমাইয়া যুগের তিন সেরা কবির অন্যতম। অপর দুজন হচ্ছেন- আল-আখতাল ও জারীর। তাঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফারাযদাকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর অহংকার ও গৌরব নির্ভর কবিতা। গৌরব ও ফখরকে ভিত্তি করেই তাঁর ব্যঙ্গকাব্য ও নাকায়িদ প্রতিষ্ঠিত। কবি হযরত আলী (রা) ও আহলে বায়তের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি আহলে বায়তদের নিয়ে প্রশংসাগীতি ও কাসিদা রচনা করেন। 'দীওয়ানু ফারাযদাক' নামে কবির দীওয়ান রয়েছে। (দ্র. ইবনে কুতায়বা, আশ-শি'রু ওয়াশ শু'য়ারা, আহমদ মুহাম্মদ শাকির সম্পা., ২য় সং (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৭১-৭২; আল-ফারাযদাক, কারাম আল-বুস্তানী সম্পাদ. (বৈরুত: দারু সাদির, ২০০৬ খ্রি.), ১ম সং., ভূমিকা; দীওয়ানু ফারাযদাক, মাজীদ তারাদ সম্পাদ. (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী), ভূমিকা; আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ২০০খ্রি.), ৬ষ্ঠ সং, পৃ. ১২১)

১১৩ **নসর ইবনু সাইয়ার:** উমাইয়া শাসক কর্তৃক নিয়োজিত খোরাসান প্রদেশের সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন।

واكثرة تقى الله في الاسرار مجتهدا ** ان التقوى خيره ما كان مكنونا

واعلم بانك بالاعمال مرتهن ** فكن لذالك كثيرا لهم محزونا

"দুনিয়া এবং পরিবার-পরিজনকে পরিত্যাগ কর। যে জিনিস চিরকাল থাকবে না তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। গোপনভাবে আল্লাহকে ভয় কর। যে পরহেজগারী গোপনে করা হয় সেটাই কল্যাণকর। জেনে রেখো যে, তোমাকে আমল করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই সব সময় চিন্তাযুক্ত থাকো।"[১১৪]

আব্বাসী যুগে যুহদ কবিতা

আব্বাসীয় যুগকে আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। এ সময় আরবী কবিতা বেদুঈন জীবনের প্রভাব মুক্ত হয়ে নগর জীবনে পদার্পণ করে এবং দরবার অভিমুখী হয়। ফলে কবিতায় অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ যুগের কবিতার বিষয়বস্তুতে ইসলামী জীবন দর্শন প্রকাশ পেলেও বস্তুবাদী দর্শনেরও সাক্ষাৎ মেলে। উমাইয়া যুগের ন্যায় আব্বাসী যুগেও কবিগণ আমীর-উমারাহদের সাহচর্য অবলম্বন করতেন। তাদের অর্থ ও উচ্চাভিলাসই ছিল এর লক্ষ্য। আব্বাসী যুগের কাব্য সাহিত্য পর্যালোচনা করলে এ যুগের কবিতার নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু ফুটে ওঠে। যেমন, মাদ্হ তথা প্রশংসামূলক কবিতা, যুহদ (তথা আধ্যাত্মবাদ বিষয়ক কবিতা), নাছীহ তথা উপদেশমূলক কবিতা, ফাখর ও হামাসাহ তথা গৌরব ও বীরত্ব বিষয়ক কবিতা; গাযাল (প্রণয়) মূলক কবিতা, মারছিয়াহ (শোকগাঁথা) কবিতা, হিকমাহ ও ফালসাফা বিষয়ক কবিতা, খামরিয়্যাত (মদ) বিষয়ক কবিতা, হিজা (ব্যঙ্গ) ও ইতাব (তিরস্কার) কবিতা ও ওয়াছ্ফ তথা বর্ণনামূলক কবিতা।[১১৫] সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত চিন্তার মননশীল কবিগণ আপন গতিতে নিজস্ব চিন্তাধারার বিকাশ ঘটান। আব্বাসীয় কাব্য-সাহিত্যকে বিষয়গত দিক থেকে প্রাচীন ধারার আবর্তন মনে হলেও এ যুগের কবিগণ প্রাচীন অবয়বের উপর কারুকার্য প্রদর্শনে নতুনত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এই নতুনত্ব কেবল সহজ-সরল শব্দ চয়নেই নয়; বরং উক্ত শব্দাবলির অলঙ্করণ ও শোভাবর্ধনেও দেদীপ্যমান।[১১৬] সাহিত্যে বেদুঈন আরবের মরুপ্রীতি ও গোত্রপ্রীতির পরিবর্তে নগর জীবনের

---

১১৪ ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী, অনুবাদ, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (রাজশাহী: মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০৯।

১১৫ জুরজী যায়দান, তারীখ আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যা (কায়রো: দারুল হিলাল, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৫৬।

১১৬ বতুরুস আল-বুস্তানী, 'উদাবাউল 'আরব ফিল আ'সরিল 'আব্বাসিয়্যাহ (বৈরুত: দারু নযীর, 'আব্বূদ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ২০।

বিস্তৃত আলোচনা আব্বাসীয় সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করছে। এ সময়কার রচনায় সংক্ষিপ্ত ছন্দে নাতিদীর্ঘ কবিতা অধিকহারে লক্ষণীয়।[১১৭] আব্বাসীয় সমাজে নির্লজ্জতা ও ইন্দ্রিয়লালসার সয়লাব সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে। লাম্পট্য ও পাপাচারের খোলামেলা আলোচনা সাহিত্যে বিশেষত কাব্যে ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে ড. ত্বহা হুসায়ন বলেন: "আলোচ্য যুগের বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনা বাস্তবে ও লেখনীতে এত বেশি সীমালঙ্ঘন করে যে, এমন বহু কবিতা রয়েছে যা কাব্যগ্রন্থে পড়া যাবে কিন্তু শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করা যায় না।" যদিও কালের আবর্তনে ইসলাম বিরোধী কবিতাগুলো হারিয়ে গেছে।[১১৮] এ সকল কবিতার বিপরীতে এ সময় চারিত্রিক পদস্খলন ও ধর্মীয় শৈথিল্যের প্রতিকার স্বরূপ সুফিবাদ ও পার্থিব বিষয় নির্ভর এমন কিছু কাব্য সৃষ্টি হয় যা ইতোপূর্বে আরবী সাহিত্যে দেখা যায়নি। আব্বাসী যুগের কবিতার নতুন বিষয়বস্তু সমূহের মধ্যে দর্শন ও যুক্তিনির্ভর কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে সৃষ্টিজগত, জীবন-মৃত্যু, ইহকাল ও পরকাল, পাপ-পূণ্য, দেহ ও আত্মা এবং ঈমান-'আক্বিদা প্রভৃতি সম্বন্ধে কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। সূফীদের মরমী কবিতাও এ যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে আল্লাহ প্রাপ্তির সাধনা, তাঁর বৈশিষ্টারাজি ও গুণাবলী এবং তাঁর প্রতি প্রবল অনুরাগের বিষয়গুলো আবেগ-উচ্ছল ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। শিক্ষামূলক কাব্য এ যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনার একটি নিদর্শন। শেখা ও মুখস্থ করার সুবিধার্থে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে কাব্যিক ভাষায় রূপ দান করা হয়। এর পাশাপাশি তখন গল্প, উপাখ্যান, সফর ও অভিযানের বিবরণ প্রভৃতিও কাব্যের রূপ দানের প্রয়াস শুরু হয়। কাব্যিক ভাষায় চিঠিপত্র লেখার প্রচেষ্টাও এ যুগের কবিতায় পরিলক্ষিত হয়।[১১৯]

আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করলেও পরবর্তীতে সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসে। ক্রমে সমাজে বৈষয়িক প্রাচুর্যের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে পরকাল বিবর্জিত বৈষয়িক ভোগ-বিলাস এবং সমাজ-সংসার বহির্ভূত নির্জন জীবন যাত্রার (যুহদ)

---

১১৭ ড. 'উমার ফাররুখ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৪ খ্রি.), ৫ম সংস্করণ, খ. ২, পৃ. ৪০।

১১৮ ড. ত্বহা হুসায়ন, হাদিসুল আরবি'আ (মিশর: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), খ. ২, পৃ.২৪; ড. য়ুসুফ খালীফ, তারীখুশ শি'র ফিল 'আসরিল 'আব্বাসী (কায়রো: দারুস সাকাফাহ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২৪-২৫।

১১৯ ড. আহমদ আলী, আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস (চট্টগ্রাম: আল-আকিব পাবলিকেশন্স, ২০১৬খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ২১ (ভূমিকা)।

ধারা পরিলক্ষিত হয়। নৈরাশ্যবাদী চিন্তার অধিকারী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য না হলেও সমাজে এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিতান্ত কম ছিল না।

আব্বাসী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। আরবী ভাষা ও সাহিত্য এ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভে সক্ষম হয়। আরবী কবিতার বিষয়বস্তুও প্রসারিত হয়।[১২০] বিশেষ করে যুহদ কবিতা এ সময় পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। সমকালীন বহু কবি যুহদ কবিতা রচনা করেন। এছাড়াও এ যুগে দুনিয়া বিমুখ সুফী শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা ব্যক্তি জীবনে ছিলেন দুনিয়া বিমুখ। তাঁরাও কম বেশি যুহদিয়াত কবিতা রচনা করেছেন। এ অঙ্গনে কবি আবুল 'আতাহিয়া ও আবু নুওয়াসের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা যায়। এছাড়াও এ যুগের যুহদ কবিতা রচনাকারীদের মধ্যে যারা অগ্রগামী- ইমাম আবু হানিফা (৮০হি./৬৯৯খ্রি.-১৫০হি./৭৬৭খ্রি.), ইবরাহিম ইব্ন আদহাম (৭১৮-৭৮১খ্রি.), আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (৭২৬-৭৯৭খ্রি.), বাহলুল উমর ইবন সায়রাফী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আর-রূআসী-এর নাম প্রণিধানযোগ্য। এ যুগের যুহদিয়াত কবিতার প্রবর্তক আবুল 'আতাহিয়ার দীওয়ানে পুরো অংশ জুড়ে সংশ্লিষ্ট কবিতামালার সন্নিবেশ ঘটেছে। আধুনিক ভাবধারার কবিদের প্রতিনিধি কবি আবু নুয়াস অনেক যুহদিয়াত কবিতা রচনা করেন। আব্বাসী যুগে এসে যুহদিয়াত কবিতা বৈরাগ্য কবিতায় রূপ লাভ করে। দুনিয়া বিমূখিতাকে অতিরঞ্জিত করে তারা বিবাহ ও সংসার ত্যাগ বর্জন করা শুরু করে। অথচ এটি ইসলাম সমর্থন করে না।

ইসলামের প্রাথমিককালে এবং উমাইয়া যুগে যুহদ বলতে যেখানে কেবল দুনিয়া-বিমুখতা, আল্লাহভীতি, মৃত্যুচিন্তা বা ঈমানের কোনো অবস্থার বিবরণকে বোঝাতো, সেখানে আব্বাসী যুগে যুহদ কবিদের একটি নিজস্ব চিন্তাধারায় পরিণত হয়, যাকে তাঁরা কাব্যের তুলিতে ভাষার লালিত্যে অপূর্ব রূপ প্রদান করেন। তদুপরি তখন অশ্লীলতা ও ধর্মদ্রোহিতার যে প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিল, তার বিরুদ্ধে যুহদ একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।[১২১]

---

১২০ ড. শাওকী দ্বায়ফ, তারীখুল আদাব আল-আরাবী আল আসর আল-'আব্বাসী আল্ আওয়াল (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ), খ. ৩, পৃ. ১৫৯।

১২১ আল-আদাব ওয়ান নুছূছ লিছ ছাফফিছ ছানী আছ-আছাভী (সৌদিআরব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮১খ্রি.), পৃ. ৩২।

আব্বাসী যুগের বিখ্যাত কবি আবু আত-তাইয়্যেব আল-মুতানাব্বী (৩০৩হি.-৩৫৪হি.) প্রেম, প্রশংসা, বিদ্রুপ, যুহদ, গর্ব, শোঁকগাঁথা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। কবি যুহদিয়াতের অন্তর্ভূক্ত পার্থিব ক্ষণস্থায়ীত্ব ও ধ্বংস সম্পর্কে বলেন[১২২]:

نَبكي عَلى الدُنيا وَما مِن مَعشَرٍ ** جَمَعَتهُمُ الدُنيا فَلَم يَتَفَرَّقوا
أَينَ الأَكاسِرَةُ الجَبابِرَةُ الأُلى ** كَنَزوا الكُنوزَ فَما بَقينَ وَلا بَقوا
وَالموتُ آتٍ وَالنُفوسُ نَفائِسٌ ** وَالمستَعِزُّ بِما لَدَيهِ الأَحمَقُ

"আমরা পার্থিব জগতের জন্য ক্রন্দন করি। অথচ আমরা জানি এমন কোন ব্যক্তি নেই, যাদেরকে এ পার্থিব জগৎ এক জায়গায় জড়ো করেছিল এবং তারা আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। সেই পূর্ব যুগের প্রতাপশালী রাজা-বাদশাহগণ কোথায়? তারা অঢেল সম্পদ সংরক্ষণ করেছিলেন; আজ সেই সম্পদ ও নেই তারাও নেই।"

মৃত্যু থেকে কেউ পালাতে পারবে না, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেন[১২৩]:

نحن بنو الموت فما بالنا ** نعاف ما لابد من شربه
تبخل أيدينا بارواحنا ** علي زمان هن من كسبه

"আমরা মৃত্যুর অনুগত (সন্তান), তবে কি কারণে আমরা মৃত্যু থেকে বাঁচার চেষ্টা করি? অথচ এ ব্যাপারে রক্ষা পাওয়ার মত ও পালানোর মত কোন স্থান নেই, আমাদের হস্ত যুগলকে রূহ ফিরিয়ে দিতে কার্পণ্য করে পক্ষান্তরে আমাদের রূহ যুগের আবর্তনেই প্রত্যাগত।"

ইব্রাহীম ইবন আদহাম (মৃ. ১৬০হি.) মধ্য এশিয়ার বলখের রাজকুমার এবং যাহিদ ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মিতাচারী ও কঠোরভাবে ইসলামের অনুসারী ছিলেন। তিনি ইসলামী ভাবধারামূলক ও আধ্যাত্মিক অনেক কবিতা রচনা করেছেন। যুহদিয়াত সম্পর্কে তাঁর কবিতা রয়েছে। তিনি দুনিয়ার উপর দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বলেন[১২৪]:

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا ** فلا ديننا يبقى ولا ما نُرَّقع
فطوبى لعبد آثر اللهَ ربَّه **وجاد بدنياه لما يُتوقع

"আমরা আমাদের দ্বীনকে খণ্ডিত করে দুনিয়াকে ঠিক করছি। তাই আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া কোনটিই আর অবশিষ্ট থাকছেনা। অতঃপর সুসংবাদ সেই বান্দার জন্য, যে তার প্রতিপালক আল্লাহকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং দুনিয়ার বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত আখিরাতকে উত্তম বানিয়েছে।"

---

১২২ মাহমুদ সামীপাশা আল-বারূদী, আল-মুখতারাত (মিসর: আল-জারিদাহ প্রকাশনী, ১৩২৯হি.), খ.৪, পৃ. ৪৭৪।

১২৩ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখ, পৃ. ৪৫৪।

১২৪ আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দিমাশক্বী (র), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০খ্রি.), খ.১০, পৃ. ১৪১; আল-আন্দালুসী, আল-'ইকদুল ফারীদ, খ. ৩, পৃ. ১৩৪।

কবি ইবনুল ফারিদ (৫৭৬হি.-৬৩২হি.)[১২৫] দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে বলেন:

فلا عَيْشَ في الدُّنْيا لمن عاشَ صاحياً ** ومَن لم يَمُتْ سُكْراً بها فاته الحزم

على نفسه فليَبْكِ مَن ضاع عُمْرُهُ ** وليسَ لهُ فيها نَصيبٌ ولا سهمُ

"দুনিয়াতে তার আয়ুস্কাল কোন জীবনই নয়, যে দুনিযার সম্মোহন থেকে দূরে রয়েছে। আর যে দুনিয়ার নেশায় জীবন না-ই দিলো তার প্রকৃত জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে, যে ব্যক্তি তার জীবনকে শেষ করে দিয়েছে অথচ দুনিয়া থেকে প্রকৃত হিসসা বা অংশ পায়নি, তার ক্রন্দন করা উচিৎ। কেননা তার জীবনতো ধ্বংস হয়েই গেছে।"

আব্বাসীয় যুগের অন্যতম কবি ইবনুর রুমী (২২১-২৮৩হি./৮৩৫-৮৯৬খ্রি.) আরবী সাহিত্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কবি। তিনি কবি আবু তাম্মাম ও আল-বুহতরীর সমকক্ষ কবি। কবি আল-মুতানাব্বী ছিলেন তাঁর কবিতার সংগ্রাহক ও রাভী।[১২৬] কবি তাঁর কবিতায় মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। মুসলমানদেরকে বসরা নগরীর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবন সম্বন্ধে বলেন:

لا تطيلوا المقام عن جنة الخلد ** فأنتم في غير دار مقام

فاشتروا الباقيات بالعرض الأدنى ** وبيعوا انقطاعة بالدوام

"তোমরা (জিহাদ হতে নিবৃত্ত থেকে) তোমাদের অবস্থান চিরস্থায়ী জান্নাত হতে দূরে রেখোনা। বস্তুত তোমরা এই দুনিয়ায় অবিনশ্বর নিবাসে অবস্থান করছ না। সুতরাং তোমরা নশ্বর বস্তুর বিনিময়ে অবিনশ্বর সম্পদ আখিরাতকে ক্রয় করে নাও এবং অনন্তহীন জীবনের বিনিময়ে ক্ষয়িষ্ণু জীবনকে বিকিয়ে দাও।"

---

১২৫ ইবনুল ফারিদের প্রকৃত নাম ওমর। তাঁর পূর্বপুরুষ রাসূল (সা)-এর দুধমাতা হালিমার বংশানুক্রমে সাদ গোত্রভুক্ত ছিলেন। তিনি চারিত্রিক দিক থেকে কঠোর সংযমী, ধর্মানুরাগী ও আল্লাহর এবাদতগুজার ছিলেন। তিনি সূফিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কোলাহল মুক্ত হয়ে গভীর ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও আত্মশুদ্ধি কামনা করতেন। তিনি সূফিবাদের সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তৎকালীন সময় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তথা বিচারক, আমীর, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রী, সাধারণ দারিদ্র্যপীড়িত সর্বস্তরের মানুষ তার দরবারে অংশগ্রহণ করে তার নসীহত শুনতেন ও দু'আ নিতেন। দীওয়ান ইবনুল ফারীদ নামে তাঁর একটি দীওয়ান বা কবিতা সম্ভার রয়েছে। এতে ৮১টি কবিতা এবং ১৯২৭টি পংক্তি রয়েছে। এতে আধ্যাত্মিক কবিতা স্থান পেয়েছে। (দ্র. উমর ইবনুল ফারিদ, দীওয়ান (বৈরুত: আল-মাকতাবুল জামি'আ আল-মাতবা'আতুল আরাবিয়া, ১৮৯৯খ্রি.), ১৫শ সংস্করণ, পৃ. ৩-১৫; আব্বাস ইউসুফ আল-হাদ্দাদ, ইবনুল ফারিদ আল-আরাবী (কুয়েত: ২০০০খ্রি.), পৃ. ১২১-১২৫।)

১২৬ ড. আহমদ আল-ইস্কান্দরী ও অন্যান্য, আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১; আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

আব্বাসী যুগের স্বনামধন্য কবি আবুল 'আলা আল-মা'আর্‌রী (৯৭৩-১০৫৭খ্রি.)-এর কবিতায় যুহদিয়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী প্রকাশ পেয়েছে। কবির মতে, মৃত্যু যেহেতু জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দান করে তাই এটিকে মুবারক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। তাঁর মতে, সবকিছুই ধ্বংশীল। মৃত্যুর পর মানুষ মাটির সাথে মিশে যাবে, কিন্তু তার সৎ কর্মের দ্বারা সে চিরজীবি হতে পারে। কবি বলেন[১২৭]:

مضى الشخص ثم الذكر فانقرضا معا ** وما مات كل الموت من عاش منه اسم

"মানুষ চলে যায়, তারপর তার স্মৃতিও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর উভয়টিই বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু ব্যক্তি সম্পূর্ণ মৃত্যুবরণ করে না, যার নাম-ধাম বেঁচে থাকে।"

কবি পরকাল ও বেহেশত, দোযখ, পুনরুত্থান, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিচার দিবসের হিসাবের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। কবি আখিরাত সম্বন্ধে বলেন[১২৮]:

سَأَرحَلُ عَن وَشكٍ وَلَستُ بِعالِمٍ ** عَلى أَيِّ أَمرٍ لا أَبا لَكَ أَقدُمُ

"অচিরেই আমি প্রস্থান করব এ নশ্বর জগত থেকে, অথচ আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞ যে, পরকালে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি; তোমার পিতৃ বিয়োগ হোক।"

কবি সৃষ্টিজগতের ধ্বংস অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে বলেন[১২৯]:

بلى قد أتانا أن ما كان زائل ** ولكننا في عالم ليس يعلمُ

"আমাদের নিকট সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংসশীল, কিন্তু আমরা এমন এক রহস্যময় জগতে অবস্থান করছি, যার রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না।"

কবি পার্থিব জীবনের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করে তিনি বলেন[১৩০]:

وجدت ابن ادم في غرة ** بما يستفيد وما يطرف

تعلق دنياه قبل الفطام ** وما زال يدأب حتي خرف

"আমি আদম সন্তানকে এমন এক প্রবঞ্চনামূলক কাজে লিপ্ত অবস্থায় পেয়েছি, যা দিয়ে সে উপকৃত হতে চায় এবং বার বার সে দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মাতৃদুগ্ধ ছাড়ানোর পূর্বেই দুনিয়া তাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে যা বার্ধক্য তথা জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।"

---

১২৭ আবুল 'আলা আল-মা'আররী, আল-আলযামু মিন লুযূমি মা-লা-ইয়ালযাম (মিসর: মাতবা'আতু আল-জামহুর, ১৩২৩হি.), পৃ. ১৬৭।

১২৮ প্রাগুক্ত।

১২৯ আবুল 'আলা আল-মা'আররী, আল-লুযুমিয়্যাত (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ.২, পৃ. ২৭১।

১৩০ ড. কামাল ইয়াজিযী, আবুল 'আলা ওয়ালুযামিয়্যাতুহু, খ.১, পৃ. ৪৮৯।

অন্য কবিতায় তিনি কবর সম্পর্কে বলেন:

جَدَثٌ أُريحُ وَأَستَريحُ بِلَحدِهِ ** خَيرٌ مِنَ القَصرِ الَّذي آذى بِهِ

"কবর এমন একটি আবাসস্থল যেখানে বিশ্রাম করা হবে। তা বিশ্রামাগার হিসেবে রাজপ্রাসাদের চেয়ে উত্তম।"

কবি মানব জীবনকে চটকদার ও তাৎপর্যহীন কদর্য পাত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মানুষ যত বড় শক্তিধর কিংবা সুখী-সমৃদ্ধ হোক না কেনো তাকে প্রতিদিন পরকালের পথেই হাটতে হচ্ছে। কোনো মনীষীর বাণী, কোনো দার্শনিকের দর্শন কিংবা কোনো বিজ্ঞানীর সূত্র মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারবে না।

মৃত্যু সম্পর্কে কবি বলেন:

نُفوسٌ لِلقِيامَةِ تَشرَئِبُ **وَغَيٌّ في البَطالَةِ مُتلَئِبُّ

وَلَم يَدفَع رَدى سُقراطَ لَفظٌ ** وَلا بِقراطُ حامى عَنهُ طِبُّ

"আত্মাগুলো পরকালের জন্য উৎসুক হয়ে আছে; অথচ মানুষ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত; কোনো বাক্যবাণী সক্রেটিসের মৃত্যু প্রতিহত করতে পারেনি এবং কোনো চিকিৎসাই হিক্রোটিসকে মৃত্যু হতে সুরক্ষা দেয়নি।"

আব্বাসী যুগের বিখ্যাত কবি ইবনুল মু'তায-এর কবিতায় যুহদিয়াত পরিস্ফুট হয়। তিনি সময়ের প্রতি গুরুত্ব ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন:

جَدَّ الزَمانُ وَأَنتَ تَلعَب ** العُمرُ في لا شَيءَ يَذهَب

كَم قَد تَقولُ غَداً أَتو ** بُ غَداً غَداً وَالموتُ أَقرَب

"সময় নতুন রূপ ধারণ করেছে, অথচ তুমি হেলা-খেলায় মত্ত। আর জীবন অহেতুক কাজে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তুমি কতই না বলে থাকো, আমি আগামীকাল তাওবা করবো, অথচ মৃত্যু তোমার অতীব সন্নিকটে।"[১৩১]

পরিশেষে বলা যায় যে, যুহদ কবিতা কোনো নতুন বিষয় নয়। প্রতক্ষ্যরূপে যুহদিয়াত কবিতা রচিত না হলেও এর আভাষ পাওয়া যায়। জাহেলী যুগের কবিদের মধ্যেও অনেকে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। সেজন্য পরকাল বা আখেরাতের ভয়-ভীতি তাঁদের কবিতায় ফুটে ওঠেছে। ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবী সাহিত্যেও বিপ্লবের প্রভাব পড়েছে। বিষয়গতভাবে জাহিলী যুগের সাহিত্যের সাথে এর আমূল পার্থক্য সূচিত হয়।

---

১৩১ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ৪, পৃ. ৩৫১।

জাহিলী কাব্যে যেখানে বংশীয় অহমিকা, প্রেম-প্রণয়, বেপরোয়া জীবন ও প্রতিশোধমূলক স্পৃহার বর্ণনা রয়েছে সেখানে ইসলামী যুগের সাহিত্যে মহান আল্লাহ, তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও জিহাদের প্রসঙ্গ স্থান করে নিয়েছে। ইসলাম গোত্রীয় আভিজাত্যের মূলে কুঠারাঘাত করে তাকওয়াকেই মর্যাদার মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। এ যুগে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনার পাশাপাশি যুহদ কবিতাও এ যুগে সংযোজিত হয়। এ যুগকে যুহদিয়াত কবিতার প্রস্তুতির যুগ বলা হয়ে থাকে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় সমাজে অশ্লীলতার সয়লাব সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে। লাম্পট্য, পাপাচার ও অশ্লীলতার আলোচনা এ সময়ের সাাহিত্যে বিশেষত কাব্যে ব্যাপকহারে স্থান করে নেয়। এর বিপরীতে এ সময় চারিত্রিক স্খলন ও ধর্মীয় শৈথিল্যের প্রতিকার স্বরূপ সূফিবাদ ও দুনিয়া বিমুখ কাব্যের সৃষ্টি হয়। এ অঙ্গনে কবি আবুল আতাহিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমকালীন সাহিত্যে এজন্য ত্যাগ ও ভোগ এই দুই প্রধান বিপরীত জীবনধারার সর্বোত্তম প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। কবি আবু নুয়াস ও বাশ্শারদের মদ ও নারী নির্ভর কবিতায় যেমন ভোগবাদী জীবন ধারার প্রতিফলন ঘটেছে; তেমনি আবুল আতাহিয়া ও অন্যান্যদের রচনায় মৃত্যু, আখিরাত, কবর ও কিয়ামত ইত্যাদি রচনায় ত্যাগবাদী জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। জীবনকে যারা যুহদ ও ত্যাগের আদর্শে মহিয়ান করেছেন এ ধরনের সংকলন তাদের হৃদয় ও আত্মার খোরাক জুগিয়েছে-ক্ষুধা মিটিয়েছে। পরবর্তীতে অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকগণ তাদের নিজ নিজ কবিতায় ‘যুহদ’ বিষয়ক কবিতা রচনা কিংবা সংকলন করেছেন। যাঁদের এমন কবিতা পাঠকালে ভোগবাদী জীবনের আবিলতামুক্ত এক পবিত্র জীবন ধারার চিত্র পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে।

পঞ্চম অধ্যায়

আবুল আতাহিয়া বিরচিত যুহদিয়াত কবিতা

আব্বাসী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আবুল আতাহিয়া যুহদ কবিতার প্রবর্তক ছিলেন। আব্বাসী সমাজে ছড়িয়ে পড়া অশ্লীল কাব্য চর্চার বিপরীতে তিনি স্বতন্ত্রধারার যুহদিয়াত কবিতার প্রসার ঘটালেন। যুহদিয়াত কবিতার মাধ্যমে ভোগবাদী জীবনধারার বিপরীতে ভোগমুক্ত জীবনের উদাত্ত আহ্বান জানান। আখিরাত, পার্থিব জীবনের অসারতা, মৃত্যু ও মৃত্যুর চিরন্তন বাস্তবতা, কালের কুটিলতা, পরকালের পূণ্য সঞ্চয়, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ভয়াবহতা প্রভৃতি বিষয়াবলী তাঁর যুহদিয়াত কবিতায় ফুটে উঠে। নিম্নে আবুল আতাহিয়া রচিত যুহদিয়াত কবিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

আবুল আতাহিয়ার যুহদিয়াত রচনার প্রেক্ষাপট

দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণকারী কবি আবুল আতাহিয়া ছোটবেলা থেকেই জীবনকে গাম্ভীর্য ও বিরাগের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক মর্যাদাহীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় শিশু বয়সেই কবি নানাবিধ সমাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছিলেন। শ্রেণি বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে, নানাবিধ লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর শিশু হৃদয়ে ঝড় বয়ে যায়। এ ঝড়ই তাঁকে ভাব জগতের রাজপুত্র হিসেবে তৈরি করে। তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অজস্র পঙক্তিমালা। এতে তাঁর হৃদয় নিকুঞ্জে লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হয়। এভাবেই এক সময় তিনি হয়ে উঠেন উদীয়মান কবি।

কবি যখন বাগদাদ আসেন, খলীফা মাহদীর ক্রীতদাসী উতবার সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। নব যৌবনা-সুন্দরী এ রমনীর অপরূপ সৌন্দর্যে তিনি বিমোহিত হয়ে পড়েন। নির্মাণ করতে থাকেন অসাধারণ গযল বা প্রণয় কবিতা। কিন্তু অনন্য সাধারণ সৌন্দর্যের আধার উতবা কবির প্রণয়ে সাড়া দেননি। কবি অধৈর্য হয়ে উঠেন। প্রিয়ার প্রত্যাখ্যান তাঁর হৃদয়ের দহন যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দেয়। ব্যর্থ প্রেমের এ যন্ত্রণা তাঁকে দুনিয়া বিমুখ করে তুলে। তিনি হয়ে উঠেন 'যুহদ' কবিতার খ্যাতিমান কবি।[১]

---

১ আবদুল হক ফরিদি, আরব কবি আবুল আতাহিয়া, মাসিক মোহাম্মদী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮

সেই সাথে যুক্ত হয় তদানীন্তন দরবারী ও অভিজাত শ্রেণির ভোগ বিলাস, দুর্নীতি ও ধর্মের প্রতি উদাসীনতা। শাসক শ্রেণির এহেন অনৈতিক কার্যকলাপ তিনি খুব কাছে থেকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে ব্যথিত ও মর্মাহত হন। বিদগ্ধ কবি রচনা করতে থাকেন– ধর্মনিষ্ঠা, পার্থিব জীবনের অসারতা, মৃত্যুর চিরন্তন বাস্তবতা, কালের কুটিলতা, পরকালের পূণ্য সঞ্চয়, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ভয়াবহতা প্রভৃতি বিষয়ক কবিতা। তাঁর এসব কবিতা সমসাময়িককালে এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, তিনি একাগ্রচিত্তে এ জাতীয় কবিতা রচনাতেই ব্যাপৃত থাকেন এবং সুখ্যাতি অর্জন করেন। যুহদ কবিতায় তাঁর সফলতা প্রত্যক্ষ করে আরো অনেকে এতদ বিষয়ক কবিতা রচনায় এগিয়ে আসেন।[২]

আবুল আতাহিয়া মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, নশ্বর এ পৃথিবী চিরন্তন নয়, এটি দু'দিনের পান্থশালা, এক অনন্ত জীবন আমাদের সম্মুখে রয়েছে; সে জীবনে শুধু ধর্মনিষ্ঠা ও সৎকর্মই কাজে আসবে। সুতরাং সেজন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। এসম্পর্কে ইংরেজ সমালোচক নিকলসন বলেন:

"His poetry breathes a spirit of profound melancholy and hopeless pessimism. Death and what comes after death, the frailty of misery of man the vanity of worldy pleasures and the duty of renouncing them-these the subjects on which he dwells with monotonous re-iteration, exhorting his readers to live the ascetic life and fear God and lay up a stone of good works against the Day of Reckoning."[৩]

"তাঁর কাব্য গভীর বিষাদ ও নিরাশ দুঃখবোধে পরিপূর্ণ। মৃত্যু এবং তার পরবর্তী অবস্থা, মানবজীবনের অসহায়ত্ব ও দুঃখ, পার্থিব সুখের মিথ্যা গৌরব এবং তা বর্জন করার কর্তব্য এইসব বিষয় নিয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ একঘেঁয়েভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর পাঠকদেরকে ধর্মীয় জীবন যাপন করতে, আল্লাহকে ভয় করতে এবং শেষ বিচারের জন্য পূণ্য সঞ্চয় করে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন।"

কবি আবুল আতাহিয়া গণমানুষের কবি ছিলেন। খলীফার দরবারে থেকেও তিনি সাধারণ মানুষের কাতারে ছিলেন। দরবারী কবির বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল না বরং তাঁর কাব্যে ভোগ বিলাসের বিপরীত বক্তব্যই পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে গযল কবিতা লিখে পারদর্শীতা অর্জন করলেও শেষ বয়সে যুহদিয়াতই ছিল মূল প্রতিপাদ্য। কবির কবিতাই তাঁর স্বভাব, প্রকৃতি বা

---

২ প্রাগুক্ত, পৃ.৭-৮

৩ Nicholson, Literary History of the Arabs, p. 218.

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে সমকালীন সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফীসাধক হিসেবেই পেয়েছি। উন্নত নৈতিক চরিত্র তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুমহান করে তুলেছিল। এ জন্য তিনি আজও দুনিয়া বিমুখ সুফী বুজুর্গ হিসেবেই পরিচিত।

আবুল আতাহিয়ার একগুচ্ছ যুহদিয়াত কবিতা

আল্লাহর একত্ববাদ (التوحيد)

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। সত্ত্বাগত দিক দিয়ে তিনি যেমনিভাবে একক ও অদ্বিতীয়, অনুরূপভাবে গুণাবলীর দিক থেকেও তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি লা-শরীক। ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারেও তাঁর কোন শরীক নেই। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ– اللَّهُ الصَّمَدُ – لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ – وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

"বলুন! তিনিই আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নয়।"[৪]

আরো ইরশাদ হয়েছে:

وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

"তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু।"[৫] কবি আবুল আতাহিয়া খাঁটি মুসলমান ছিলেন। আল্লাহর একত্ববাদ, কিয়ামত ও পরকাল সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ ও অবিচল আস্থা ছিল। তিনি বলেন:

فَيا عَجَباً كَيفَ يُعصى الإِلَهُ ** أَم كَيفَ يَجحَدُهُ الجاحِدُ
وَلِلَّهِ في كُلِّ تَحريكَةٍ ** وَتَسكينَةٍ أَبَداً شاهِدُ
وَفي كُلِّ شَيءٍ لَهُ آيَةٌ ** تَدُلُّ عَلى أَنَّهُ واحِدُ

"হায় আশ্চর্য! কীভাবে মানুষ তার প্রভুর অবাধ্য হয়, কেমন করে অস্বীকারকারীরা তাঁকে অস্বীকার করে? প্রতিটি অনুররণ ও স্থিরতার মাঝেই আল্লাহর সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান। আর প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁর একত্বের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেদীপ্যমান।

---

৪ সূরা ইখলাস, আয়াত: ১-৪।

৫ সূরা বাকারা, আয়াত: ১৬৩।

কবি আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে বলেন[৬]:

لكَ الحمدُ ياذَا العَرشِ يا خيرَ معبودِ ** ويا خَيرَ مَسؤولٍ، ويا خيرَ مَحمودِ

شهدْنَا لَكَ اللهُمَّ أنْ لستَ محدَثاً ** ولكِنَّكَ المؤلَى ولستَ بمجحودِ

"হে আরশের অধিপতি, যাবতীয় প্রশংসা তোমার জন্যই নিবেদিত। ওহে মহামহিম, শ্রেষ্ঠ প্রার্থনাস্থল ও সপ্রশংসিত সত্ত্বা। আমরা তোমার সাক্ষ্য দিচ্ছি ওহে মাবুদ, তুমিতো নবাগত কেউ না। বরং তুমিই হলে অভিভাবক ও অনস্বীকার্য সত্ত্বা।"

কবি শুধুমাত্র আল্লাহর একত্ববাদের গানই গাননি তিনি মহান স্রষ্টার প্রশংসায় তাঁর হৃদয়ের অর্গল খুলে দিয়ে বলেছেন:

كل يوم يأتي برزق جديد ** من مليك لنا غني، حميد

قاهر، قادر، رحيم، لطيف ** ظاهر، باطن، قريب، بعيد

"প্রতিদিনই নতুন নতুন রিযিক আসে আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে যিনি ধনী, প্রশংসিত, ক্ষমতাবান; পরাক্রমশালী, শক্তিমান, সুক্ষ্মদর্শী, প্রকাশ্য, গোপন, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী।"

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা (في الحمد لله)

কবি আবুল আতাহিয়া মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেছেন। এসব কবিতায় আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। এসব কবিতায় আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাসের বিষয়টি ফুটে ওঠে। মহান আল্লাহর প্রশংসায় কবি বলেন[৭]:

جل رب احاط بالاشياء ** واحد ماجد بغير خفاء

جل عن مشبه له ونظير ** وتعالى حقا على القرناء

عالم السر كاشف الضر يعفوا ** عن قبيح الافعال يوم الجزاء

"মহান প্রতিপালক যিনি সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, তিনি একক, অতি মর্যাদাবান যাতে কোন সংশয় নেই। তিনি তাঁর তুলনা ও সাদৃশ্য হতে পূতপবিত্র, তিনি সকল তুলনা হতে অতি ঊর্ধ্বে। তিনি সকল গোপন বিষয়ে অবগত, দুঃখ-কষ্ট দূরীভূতকারী এবং প্রতিদান দিবসে (কিয়ামতের দিন) মার্জনাকারী।"

---

৬ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান (বৈরুত: দারু বৈরুত, ১৯৮৬খ্রি./১৪০৬হি.), কাফিয়া-দাল, পৃ. ১২২।

৭ দীওয়ানত, প্রাগুক্ত, কাফিয়া, আলিফ, পৃ. ১৬।

মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কথা বর্ণনা করে কবি বলেন[৮]:

وهو الخفى الظاهر الملك الذى ** هو لم يزل ملكا على العرش استوى

وهو المقدر والمدبر خلقة ** وهو الذى في الملك ليس له سوى

وهو الذى يقضى بما هو اهله ** فينا ولا يقضى عليه إذا قضى

"তিনি (আল্লাহ) প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে এমন মালিক, যিনি আরশের উপর সমাসীন এবং রাজকীয় ক্ষমতা তার কাছ থেকে বিদূরিত হবে না;

তিনি সৃষ্টির জন্য তাকদির নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তাদেরকে পরিচালনা করেন।

রাজত্বের বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই;

আমাদের মধ্যে যে যোগ্য তার জন্য তিনি ফয়সালা করেন। তার বিরুদ্ধে কোনো ফয়সালা চলে না। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দেন।"

আবুল আতাহিয়ার কবিতায় এরকম আল্লাহ প্রেমের বহু পঙক্তি লক্ষণীয়। তিনি যেমনি ছিলেন খোদাপ্রেমী ও তাঁর দাসানুদাস তেমনি তিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর প্রশংসা ও পদাঙ্ক অনুসরণে অগ্রগামী উম্মত। রাসূল (স.)-এর প্রশংসায় তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। নিম্নে কয়েকটি পঙক্তি পেশ করা হলো: [৯]

واحمدوا الله الذي اكرمكم ** بنذير قام فيكم، فنصح

بخطيب، فتح الله به **كل خير نلتموه وشرح

"তোমরা সেই আল্লাহর প্রশংসা কর যিনি তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এমন এক নবীর দ্বারা –যিনি তোমাদের মাঝে অবস্থান করে সদুপদেশ দিয়েছেন; যে নবীর দ্বারা আল্লাহ সেই সব কল্যাণের পথ খুলে দিয়েছেন–যা তোমরা লাভ করেছ, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।"

কবি আবুল আতাহিয়ার বেশির ভাগ কবিতাতেই ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন আদর্শের কথা উঠে এসেছে।

সবর ও সহনশীলতা (في الصبر والحلم)

সবর শব্দের অর্থ হলো- আটকে রাখা, বেঁধে রাখা (Patience)। পরিভাষায় সবর হলো- তিনটি বিষয়ে নিজেকে আটক বা বেঁধে রাখার নাম সবর বা ধৈর্য। প্রথমত: আল্লাহ

---

৮ দীওয়ানু আবুল আতাহিয়া (দারু বৈরুত: ১৯৮৬খ্রি./১৪০৬হি.), পৃ. ২৭।

৯ আবুল আতাহিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

তা'আলার আদেশ-নির্দেশ পালনে নিজেকে আটকে রাখা; দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন তার দিকে যেতে নিজেকে আটকে রাখা বা বিরত রাখা; তৃতীয়ত: যে সকল বিপদ-আপদ আসবে, সে সকল ব্যাপারে অসঙ্গত ও অনর্থক বা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।[১০] আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[১১]

কবি ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন, সত্যের সাধক ছিলেন। কবি এ বিষয়ে বলেন: [১২]

نِعمَ الفِراشُ الأَرضُ فَاقنَع بِهِ ** وَكُن عَنِ الشَرِّ قَصيرَ الخُطا

ما أَكرَمَ الصَبرَ وَما أَحسَنَ ** الصِدقَ وَما أَزيَنَهُ بِالفَتى

"কি সুন্দর! এই শ্যামসুন্দর বাগিচা; এতেই তুষ্ট থাক, পাপের পা হতে সংবরণ কর; ধৈর্য অতি মাধুর্যময়; সত্য অতি মনোরম এবং যে কোন তরুণের জন্য এটি শ্রেষ্ঠ ভূষণ।"

তাকওয়া অবলম্বন (الدعوة إلى التقوى)

তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ ভয় করা, বিরত থাকা, বাঁচিয়ে রাখা বা অনিষ্ট হতে নিজেকে দূরে রাখা (peity)। পরিভাষায় তাকওয়া হল- পরকালের হিসাব-কিতাব, পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাস নিয়ে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহিতা এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে সমূহ মন্দ ও অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে বেঁচে থাকা। আর আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।[১৩] আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোন, আনুগত্য কর, ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য। যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম।"[১৪]

---

১০ ড. সৈয়দ শাহ এমরান, ইসলামী পরিভাষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪১।

১১ সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ২০০।

১২ আব্দুল হক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯।

১৩ মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নো'মানী, ইসলাম ক্যায়া হায়, অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ মাহদী হাসান (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৫৭।

১৪ সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬।

কবি আবুল আতাহিয়া তাঁর কবিতায় তাকওয়া তথা খোদাভীতি অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং তিনি প্রবৃত্তির বিরোধিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রবৃত্তির জিহাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হিসেবে ঘোষণা করে কবি বলেন [১৫]

أَشَدُّ الجِهادِ جِهادُ الهَوى ** وَما كَرَّمَ المرءَ إِلّا التُقى

وَأَخلاقُ ذي الفَضلِ مَعروفَةٌ ** بِبَذلِ الجَميلِ وَكَفِّ الأَذى

"প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই কঠিনতম জিহাদ এবং তাকওয়া তথা খোদাভীতিই মানুষকে সম্মানিত করে;

মর্যাদাবান ব্যক্তির চরিত্র সর্বজন গৃহীত। আর তাদের এ মর্যাদা লাভের পেছনে রয়েছে উত্তম কার্য সম্পাদন এবং সৃষ্টির ক্ষতিকর কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা।"

অন্যত্র কবি বলেন:

ألا إن تقوى الله أكرم نسبة ** تسامى بها عند الفخار كريم

ويا رب هب لي منك عزما على التقى ** أقيم به ما عشت حيث أقيم

"আল্লাহর ভয়ই হল-সর্বোচ্চ নিসবত বা পরিচয়, যেটি নিয়ে ফখর বা গর্ব করার সময় সম্মানিত ব্যক্তি প্রতিযোগী হতে পারে। হে আমার মহান প্রতিপালক! আপনি আমাকে তাকওয়ার উপর অবিচলতা দান করুন। যার উপর আমি যেথায়, যেভাবে ও যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন দৃঢ় ও অবিচল থাকবো।"[১৬]

কবি তাঁর সমাধি ফলকে (tombstone) অংকিত করার জন্য যে কবিতা রচনা করেছিলেন তাতেও তিনি তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন:

عشت تسعين حجة ** في ديار التزعزع

ليس زاد سوي التقي ** فخذي منه أودعي

ভয় আর শঙ্কার জগতে আমি নব্বই বছর অতিবাহিত করেছি; তাকওয়া ব্যতীত আর কোন পাথেয় নেই, তা অর্জন কর না হয় দূর হও।"

---

১৫ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান (বৈরুত: দারু বৈরুত, ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.), পৃ.২০

১৬ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

ইবলিসের প্রবঞ্চনা (إبليس قد غرني)

ইবলিস অর্থ চরম হতাশাগ্রস্ত, শয়তানের আসল নাম।[১৭] ইবলিস মানুষের বহু বিচিত্র চাতুরি খেলে তাদেরকে বিপদগামী করে। কিন্তু সত্যিকারের ঈমানদাররা তাঁর ধোঁকায় ও চক্রান্তে পড়েন না। কবি আতাহিয়া ইবলিসের প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে বলেন[১৮]:

لا غذرلي! قد أتى المشيب، ** فليت شعري! متى أتوب؟
إبليس قد غرني ونفسي، ** ومسني منهما اللغوب
ولست أدري، إذا أتاني ** رسول ربي بما أجيب؟
هل أنا عند الجواب مني، ** أخطىء في القول أم أصيب
أم أنا، يوم الحساب، ناج، ** أم لي في ناره نصيب
يا رب جد لي على رجائي ** بمنة، منك، لا أخيب

"আমার কবিতার দোহাই, কবে আমি তাওবা করবো? ওযর আপত্তি পেশ করার সুযোগ তো আমার চলে যাচ্ছে, বার্ধক্যতো এসেই পড়েছে! ইবলিস ও নফসে আম্মারা আমায় প্রবঞ্চিত করেছে, উভয়ের দিক থেকেই অলসতা ও অবসন্নতা আমায় পেয়ে বসেছে। আমিতো জানিনা, আমার প্রভুর দূত (আযরাঈল) যখন আসবে, তখন আমি কী জবাব দেব? জবাব দান কালে আমি কি ভুল করবো, নাকি শুদ্ধ উক্তিই করবো? হিসাব-নিকাশের দিন আমি কি মুক্তিপ্রাপ্ত হবো নাকি নরকাগ্নিতেই আমার স্থান হবে। হে আমার প্রভু! আমার কামনা-বাসনা অনুযায়ী তুমি আমায় দান করো, যেন আমি ভাগ্যাহত না হই।"

কানা'আত বা অল্পে তুষ্টি (القناعة)

স্বল্পতুষ্টতার মতো প্রশংসনীয় বস্তু আর কিছুই হতে পারে না। দুনিয়ার স্বল্পকালীন জিন্দেগীতে অল্পে তুষ্ট থাকা উচিত। মানুষ অল্পে তুষ্ট না থাকার কারণে অশান্তির মধ্যে হাবুডুবু খায়। লোভ ধ্বংসের কারণ। লোভ, লোভাতুর ব্যক্তিকে মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বদা এমনভাবে ব্যস্ত রাখে, যার ফলে সে ইসলামী শরী'আতের হুকুম-আহকাম পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং হালাল হারাম পার্থক্য করার

---

১৭ হযরত আদম (আ)-কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়ার পর আল্লাহ ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন আদমকে সিজদা করার জন্য। আগুন দ্বারা সৃষ্ট বলে একমাত্র ইবলিস এই আদেশ অমান্য করে। এজন্য সে বেহেশত থেকে বহিস্কৃত ও অভিশপ্ত হয়। তবে সে কিয়ামত পর্যন্ত তার মৃত্যু মূলতবি রাখার প্রার্থনা জানায় এবং এটি মঞ্জুর করা হয়। অধিকন্তু তার প্রার্থনা অনুযায়ী মানুষকে বিপথগামী করার প্রয়াসে চক্রান্ত করার সামর্থ্যও তাকে দেওয়া হয়। (দ্র. ড. সৈয়দ শাহ এমরান, ইসলামী পরিভাষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮-২৯)

১৮ দীওয়ানু আবুল আতাহিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

বিবেচনাশক্তি হারিয়ে ফেলে।[১৯] লোভী ব্যক্তি কখনো মর্যাদাবান হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ - حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত)।"[২০]

কবি বলেন:

ما طلاب عيش الحريص قط ولا ** فارقه التعس منه والنصب
البغى والحرص الهوى فتن ** لم ينج منها عجم ولا عرب
ليس على المرء فى قناعته ** إن هي صحت أذى ولا نصب
من لم يكن بالكفاف مقتنعا ** لم تكفه الأرض كلها ذهب
وفى جمبل القنوعت ينخفض ** العيش وبالحرص يعظم التعب
ان الغنى في النفوس والعز ** تقوى الله لافضة ولا ذهب

"লোভীর জীবন কখনো সুখকর হয়না এবং বিপদ ও ধ্বংস তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। অন্যায়, অত্যাচার, লোভ-লালসা ও যথেচ্ছ চলা ফিতনাস্বরূপ। ঐ ফিতনা হতে আরব অনারব কেউ মুক্তি পাবে না। সঠিকভাবে কোনো ব্যক্তি স্বল্পে তুষ্ট হলে তার জন্য দুঃখ ও কষ্টের কোনো কারণ নেই। অপরদিকে যে ব্যক্তি স্বল্পে তুষ্ট হয় না তাকে পূর্ণ পৃথিবী স্বর্ণ করে দিলেও সে সন্তুষ্ট হবে না। সুন্দর স্বল্পতুষ্টিতে জীবনধারণ কিছুটা ছোট হলেও লোভ-লালসা নিয়ে জীবনধারণ দুঃখ-কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। ধনাঢ্যতা হলো অন্তরের বিষয়, আল্লাহর ভয় হলো মর্যাদা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক হওয়ার মধ্যে কোন মর্যাদা নেই।"

স্বল্পেতুষ্টি সম্পর্কে কবি অন্যত্র বলেন:

هو ربى وحسبى الله ربى ** فلنعم المولى ونعم النصير
اى شيئ ابغى اذا كان ظل ** وقوت حل، وثوب يسير
ما ياهل الكفاف فقر ولكن ** كل من لم يقنع فذالك فقير

"আমার মহান রব আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি কতইনা উত্তম মালিক ও উত্তম সাহায্যকারী। আমার কি-ইবা চাওয়ার থাকতে পারে, যদি আমার বাসস্থান, হালাল খাদ্য এবং লজ্জা ঢাকার মতো বস্ত্র থাকে। হাতপাতা লোকগণ দরিদ্র নয়, বরং তারাই দরিদ্র, যারা সল্পে তুষ্ট হয় না।"

---

১৯ ফকীহ আবুল-লায়েস সমরকন্দী, অনুবাদ, মাওলানা আবদুস শহীদ আনছারী, তাম্বীহুল গাফেলীন (ঢাকা: ফয়জুল্লাহ প্রকাশনী, তা.বি.), পৃ. ১২২।

২০ সূরা তাকাসুর, আয়াত: ১-২।

সল্পেতুষ্টি সম্পর্কে কবি আরও বলেন[২১]:

إن كان لا يغنيك ما يكفيكا ** فكل ما في الأرض لا يغنيكا

لن تصلح الناس وأنت فاسد * هيهات ما أبعد ما تكابد

"তোমার প্রয়োজন মাফিক সম্পদ যদি তোমাকে তুষ্ট না করে তবে ভূপৃষ্ঠের কোনো কিছুই তোমাকে তুষ্ট করতে পারবে না। তোমার মধ্যে গলদ থাকলে কখনো মানুষ তোমাকে শোধরাতে পারবে না। তুমি এগিয়ে না আসলে তোমার সংশোধন সুদৃঢ় হবে না।"

দুনিয়ার প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন (ذم الدنيا)

لَعَمرُكَ ما الدُنيا بِدارِ بَقاءِ ** كَفاكَ بِدارِ المَوتِ دارَ فَناءِ

فَلا تَعشَقِ الدُنيا أُخَيَّ فَإِنَّما ** تَرى عاشِقَ الدُنيا بِجُهدِ بَلاءِ

حَلاوَتُها مَمزوجَةٌ بِمَرارَةٍ ** وَراحَتُها مَمزوجَةٌ بِعَناءِ

فَلا تَمشِ يَوماً في ثِيابِ مَخيلَةٍ ** فَإِنَّكَ مِن طينٍ خُلِقتَ وَماءِ

"তোমার জীবনের শপথ! দুনিয়া স্থায়ী আবাসস্থল নয়; আর যেটি মৃত্যুর (অস্থায়ী) আবাসন সেটি তো ভঙ্গুর আবাসন;

হে আমার প্রিয় ভাই! তুমি কখনো দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ো না; কেননা দুনিয়া প্রেমিককে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত দেখা যায়;

দুনিয়ার স্বাদ তিক্ততায় মেশানো, এবং এর প্রশান্তি কষ্ট-ক্লেশে অবিমিশ্র;

অতএব, তুমি কখনো আত্মম্ভরী পোশাকে চলাফেরা করোনা; কেননা তোমাকে তো মাটি আর পানি দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

দুনিয়া-প্রীতি (حب الدنيا)

দুনিয়া প্রীতি শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় কাজ। দুনিয়ার মুহাব্বত একটি মারাত্মক ব্যাধি, যা মানবাত্মাকে ধ্বংস ও আখিরাত বিমুখ করে দেয়। দুনিয়ার মুহাব্বত ততটুকু করতে হবে; যতটুকু করলে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে যথেষ্ট হবে। দুনিয়ার মোহ ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল পাপের মূল। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন:

حب الدنيا رأس كل خطيئة

"দুনিয়াপ্রীতি সকল পাপের মূল।"

---

২১ আনিস মাকদিসী, উমারা'উ আশ-শি'র আল-আরাবী ফিল আসরিল আব্বাসী (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৭৯খ্রি.), ১২তম সং, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

দুনিয়ার নির্ধারিত ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে আখিরাতে পাথেয় অর্জনে উদাসীন হওয়া যাবে না। কবি আবুল আতাহিয়া দুনিয়ার প্রেমে যেন মানুষ মোহান্ধ না হয় সেজন্য উপদেশ দিয়ে বলেন:

المرءُ آفَتُهُ هَوى الدُنيا ** وَالمرءُ يَطغى كُلَّما اِستَغنى
إِنّي رَأَيتُ عَواقِبَ الدُنيا ** فَتَرَكتُ ما أَهوى لِما أَخشى
فَكَّرتُ في الدُنيا وَجِدَّتِها ** فَإِذا جَميعُ جَديدِها يَبلى
ما زالَتِ الدُنيا مُنَغَّصَةً ** لَم يَخلُ صاحِبُها مِنَ البَلوى
دارُ الفَجائِعِ وَالهُمومِ وَدا ** رُ البَثِّ وَالأَحزانِ وَالشَكوى
بَينا الفَتى فيها بِمَنزِلَةٍ ** إِذ صارَ تَحتَ تُرابِها مُلقى

"মানুষের আপদ হচ্ছে দুনিয়ার আসক্তি। মানুষ যখন অভাবহীন হয় তখন সে সীমালঙ্ঘন করে;

আমি তো দুনিয়ার পরিণতি অবলোকন করেছি: তাই মন যা চায় তা পরিত্যাগ করেছি আল্লাহর ভয়ে;

দুনিয়া ও দুনিয়ার নবরূপ নিয়ে আমি ভাবনা করেছি, দেখলাম এর সব নবরূপ জীর্ণতায় পরিণত হয়;

দুনিয়া বরাবরই কদর্যপূর্ণ, দুনিয়াদার কখনোই বিপদমুক্ত নয়;

দুনিয়া হচ্ছে ভয়, দুশ্চিন্তা, দুঃখ-দুর্দশা ও নানা অভিযোগের আলয়;

এ পৃথিবীতে যুবক যতই উঁচু মর্যাদার হোক না কেন পরিশেষে সে পৃথিবীর মাটির নিচেই সমাধিস্থ হবে।"

দুনিয়াপ্রীতি সম্বন্ধে তিনি আরো বলেন[২২]:

لِكُلِّ أَمرٍ جَرى فيهِ القَضا سَبَبُ ** وَالدَهرُ فيهِ وَفي تَصريفِهِ عَجَبُ
ما الناسُ إِلّا مَعَ الدُنيا وَصاحِبِها ** فَكَيفَ ما اِنقَلَبَت يَوماً بِهِ اِنقَلَبوا
يُعَظِّمونَ أَخا الدُنيا وَإِن وَثَبَت ** يَوماً عَلَيهِ بِما لا يَشتَهي وَثَبوا

"সব বিষয়ের মাঝেই তার ফলাফল ও পরিণতি প্রবহমান, তবে যুগ ও তার চক্রের মাঝে রয়েছে অদ্ভুত বিস্ময়। মানুষের ঘর-বসতি দুনিয়া ও দুনিয়াদার নিয়েই, দুনিয়াই যদি পরিবর্তিত না হয়, তবে মানুষ কিভাবে পরিবর্তিত হবে। মানুষ দুনিয়াদারকে সম্মান ও সমীহ করে, দুনিয়া যদি কোন দিন তার ওপর হামলে পড়ে, যা তার অপছন্দনীয় তখন মানুষও তার উপর হামলে পড়বে।"

---

২২ দীওয়ানু আবুল আতাহিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

পার্থিব ভ্রান্তি (غرور الدنيا)

পার্থিব জীবন একপ্রকার ভ্রান্তি। যখনই কোন অপ্রত্যাশিত প্রয়োজন পূরণ হয়, তখন অন্য কোনো প্রয়োজন এসে উপস্থিত হয়। কবি আবুল আতাহিয়া দুনিয়ার জন্য মানুষের অন্তহীন ও নিরন্তর চেষ্টা ও পার্থিব ভ্রান্তি নিয়ে বলেন-

نَصَبتِ لَنا دونَ التَفَكُّرِ يا دُنيا ** أَمانِيَّ يَفنى العُمرُ مِن قَبلِ أَن تَفنى

مَتى تَنقَضي حاجاتُ مَن لَيسَ واصِلاً ** إِلى حاجَةٍ حَتّى تَكونَ لَهُ أُخرى

لِكُلِّ امرِئٍ فيما قَضى اللَهُ خُطَّةٌ ** مِنَ الأَمرِ فيها يَستَوي العَبدُ وَالمولى

وَإِنَّ امرَأً يَسعى لِغَيرِ نِهايَةٍ ** لَمُنغَمِسٌ في لُجَّةِ الفاقَةِ الكُبرى

"ওহে দুনিয়া! তুমি তো আমাদেরকে ভীষণ চিন্তায় ফেলে দিলে। আমাদের কামনা-বাসনা পূরণের আগে আয়ু শেষ হয়ে যায়;

যখনই কোন অপ্রত্যাশিত প্রয়োজন পরিপূর্ণ হয়, তখনই অন্য কোনো প্রয়োজন সমুস্থিত হয়ে যায়;

প্রত্যেক বান্দার জন্য আল্লাহ যে ভাগ্য নির্ধারণ করেন তাতে কর্মপ্রণালি নির্ধারিত আছে, যেখানে প্রভু (মালিক) ও দাস একাকার হয়ে যায়;

যে ব্যক্তি সীমাহীনের (সম্পদের) জন্য ছুটে সে দারিদ্র্যের মহাসাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে।"

নশ্বর পৃথিবী (في زوال الدنيا)

দুনিয়া নশ্বর এবং আখেরাত স্থায়ী। এ দুনিয়া সৌন্দর্য ও আকর্ষণে ভরা কিন্তু আখেরাতের সৌন্দর্য অকল্পনীয় সীমাহীন। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিত স্বল্প সময়ের এ জিন্দিগীর মোহ ত্যাগ করে আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য কর্ম সম্পাদন করা। কবি বলেন[২৩]:

أَلا نَحنُ في دارٍ قَليلٍ بَقائُها ** سَريعٍ تَدانيها وَشيكٍ فَنائُها

تَزَوَّد مِنَ الدُنيا التُقى وَالنُهى فَقَد ** تَنَكَّرَتِ الدُنيا وَحانَ انقِضاؤُها

"হায়, আমরা তো এক ক্ষণস্থায়ী আবাসের বাসিন্দা, যার আবেদন দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু এবং ধ্বংস অনিবার্য। তুমি পৃথিবী থেকে তাকওয়া ও জ্ঞান গরিমার পাথেয় আহরণ কর। কারণ, পৃথিবী তার বিবর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং তার লয় অত্যাসন্ন।"

---

২৩ দীওয়ানু আবুল আতাহিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

পার্থিব জীবন (الحياة الدنيوية)

পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। এতে মুগ্ধ হওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক ও রিজিকদাতা। বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার রিজিক বৃদ্ধি করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে দারিদ্র্যপীড়িত করেন। দুনিয়ার সচ্ছলতা কারো শুভ লক্ষণের দলিল নয়। কেননা আখিরাতের সাফল্য নির্ভর করে নেক আমলের উপর। দুনিয়াতে রিযিকের হ্রাস-বৃদ্ধি পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন[২৪]:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, কখনো ভয়ভীতি, কখনো অনাহার দিয়ে, কখনো তোমাদের জান-মাল ও ফসলাদির ক্ষতির মাধ্যমে। এমতাবস্থায় আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দান করুন।"

মানুষ তার নির্ধারিত রিযিকের বেশি কিছুই গ্রহণ বা ভোগ করতে পারে না। যদিও মানুষ নিত্যদিন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। মানুষ যত সুদৃঢ় প্রাসাদ তৈরি করুক না কেন তা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। কবি বলেন[২৫]:

فيَجهَدُ النّاسُ، في الدّنيا، مُنافسة ** وليسَ للناسِ شيءٌ غيرَ ما رُزِقُوا

يا مَن بنى القَصرَ في الدّنْيا، وَشَيّدَه، ** أسّسْتَ قَصرَكَ حَيثُ السّيلُ وَالغرَقُ

لا تَغْفُلَنّ، فإنّ الدّارَ فانِيَة، ** وشربَهَا غصصٌ أو صفوهَا رنقُ

"মানুষ দুনিয়া লাভের জন্য প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। অথচ তার জন্য যে রিযিক বণ্টিত আছে তদপেক্ষা সে বেশি পাবে না;

হায় আফসোস! যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সুদৃঢ় প্রাসাদ তৈরি করলো, তুমি এমন একস্থানে তোমার প্রাসাদ তৈরি করলে যেথায় বন্যা এবং ভূমিকম্প রয়েছে;

তুমি ভুলে যেও না যে এ পৃথিবী ধ্বংসশীল। দুনিয়ার পানীয় গলায় আটকে থাকে আর তার স্বচ্ছ পানিও ঘোলাটে হয়।"

দুনিয়া ধন-সম্পদের অসারতা সম্পর্কে কবি বলেন[২৬]:

أبقيت مالك ميراثا لوارثه ** فليت شعري ما أبقى لك المال؟

القوم بعدك في حال تسرهم ** فكيف بعدهم دارت بك الحال

ملوا البكاء فما يبكيك من أحد ** واستحكم القول في الميراث والقال

---

২৪ সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫।

২৫ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

২৬ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

“তোমার সহায়-সম্পদতো শুধুই উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যাচ্ছ, হায় যদি আমার কবিতা তোমার সম্বিত ফিরাতো, এই সম্পদতো তোমার জন্য চিরস্থায়ী নয়। তোমার তিরোধানের পর তোমার জাতি-গোষ্ঠী স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থায় থাকবে। বলতো তখন তোমার অবস্থাই বা কেমন হবে, তারা কাঁদতে কাঁদতে অতিষ্ঠ হলেও তাদের কারো কান্না কি তোমাকে কাঁদাবে? বরং এই পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের মাঝে বিবাদ-বিসম্বাদকেই শক্তিশালী করবে।”

পৃথিবী ধ্বংসশীল (فناء الدنيا)

পৃথিবীর সবকিছুই নশ্বর ও ধ্বংসশীল। কবি অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ ধরাপৃষ্ঠে যে যত শক্তিধর হোক না কেন তাকে একদা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। পৃথিবীতে কত শক্তিমান ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা এক সময় বড় বড় আসনে অধিষ্ঠিত ছিল অথচ তারা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কবি বলেন[২৭]:

أَلا إِنَّنا كُلَّنا بائِدُ ** وَأَيُّ بَني آدَمٍ خالِدُ

وَبَدؤُهُمُ كانَ مِن رَبِّهِم ** وَكُلٌّ إِلى رَبِّهِ عائِدُ

فَيا عَجَبا كَيفَ يُعصى الإِلَ ** هُ أَم كَيفَ يَجحَدُهُ الجاحِدُ

وَفي كُلِّ شَيءٍ لَهُ آيَةٌ ** تَدُلُّ عَلى أَنَّهُ واحِدُ

“শুনে রাখো! আমরা প্রত্যেকেই ধ্বংসশীল। আর বনী আদমের কে আছে চিরঞ্জীব? তাদের সৃষ্টিসূচনা তাদের প্রভু হতেই এবং প্রত্যেককেই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। সুতরাং কী বিস্ময়কর! কীরূপেই বা আল্লাহর অবাধ্যতা প্রদর্শন করা হয় কিংবা কীরূপেই বা অস্বীকারকারী তাঁকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে? আল্লাহর সৃষ্টির সকল বস্তুর মাঝে আল্লাহর নিদর্শন বিদ্যমান, যা সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়।”

ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর ও নির্দয়। পূর্ববর্তীদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে কবি বলেন:

أَينَ الأُلى بَنوا الحُصونَ وَجَنَّدوا ** فيها الجُنودَ تَعَزُّزاً أَينَ الأُلى

أَينَ الحُماةُ الصابِرونَ حَمِيَّةً ** يَومَ الهِياجِ لِحَرِّ مُختَلَبِ القَنا

وَذَوُو المَنابِرِ وَالعَساكِرِ وَالدَسا ** كِرِ وَالمَحاصِرِ وَالمَدائِنِ وَالقُرى

وَذَوُو المَواكِبِ وَالمَراكِبِ وَالكَتا ** أَئبِ وَالنَجائِبِ وَالمَراتِبِ في العُلى

---

২৭ আবুল আতাহিয়া, দীওয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২; ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাচীন আরবি কবিতা : ইতিহাস ও সংকলন, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২৯-৬৩০।

أَفناهُمُ مَلِكُ المُلوكِ فَأَصبَحوا ** ما مِنهُمُ أَحَدٌ يُحَسُّ وَلا يُرى

কবি আবুল আতাহিয়া কবিতায় জগদ্বাসীকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন যে, "এককালে যারা বিপুল সৈন্য সামন্ত, বিশাল ধন-সম্পদের মালিক, বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিল তাদেরকে মহাশক্তিমান রাজাধিরাজ ধ্বংস করে দিয়ে এমন এক জগতের দিকে নিয়ে গেছেন, যা আমাদের পক্ষে দেখা বা অনুভব করা অসম্ভব। সুতরাং পূর্ববর্তীদের ইতিহাসে রয়েছে আমাদের জন্য উপদেশ।"

কবি অন্যত্র বলেন[২৮]:

ألا كل ما هو آت قريب ** واللأرض من كل حي نصيب

وللناس حب لطول البقاء ** فيهاوللموت فيهم دبيب

"ওহে! মনে রেখো, আগন্তুক (মৃত্যু) তো সমাগত, ভূতলের প্রাণীকুলকে একই ভাগ্যবরণ করতে হবে। দীর্ঘজীবনের মায়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং তাদের মাঝে রয়েছে মরণভীতি।"

পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা (الرغبة في الدنيا)

মানুষ অকল্পনীয় ও অবাস্তব আশায় বেঁচে থাকে। স্বল্পে তুষ্ট না হয়ে আরও অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। অথচ স্বল্পে তুষ্টি আর অল্প উপার্জনও মানুষের জন্য যথেষ্ট। কবি বলেন[২৯]:

خدعتنَا الآمالُ حتى طلبنَا ** وجمعنَا لغيرِنَا وسعينَا

وَابْتَنَيْنَا، وما نُفَكّرُ في الدّهْر ** وَفي صَرْفِهِ، غَداةَ ابْتَنَيْنَا

وَابْتَغَيْنَا مِنَ المَعَاشِ فُضُولاً، ** لو قنعنَا بدونهَا لاكتفينَا

"অতিরিক্ত কামনা-বাসনা আমাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে। এ প্রতারণার ফাঁদে পড়েই আমরা অন্যের জন্য সম্পদ পুঞ্জীভূত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমরা অট্টালিকা তৈরি করি। অথচ নির্মাণ কর্মের সূচনাকালীন সকালেও আমরা যুগের বিবর্তন বিষয়ে ভাবিনা। আমরা জীবন জীবিকার মোহে অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টায় রত। যদি আমরা অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা না করে স্বল্পে তুষ্ট হতাম তাহলে তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো।"

---

২৮ দীওয়ানু আবুল আতাহিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।

২৯ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬।

নির্জনতা অবলম্বন (الخلوة/التحنث)

আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন ও কল্যাণার্থে নির্জনতা অবলম্বন অত্যধিক ফলদায়ক। নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) হেরা গুহায় নির্জনতা অবলম্বন করতেন। নির্জনতা অবলম্বন সম্বন্ধে রাসূল (সা)-এর হাদীস।

أن رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسلم: فقال: أى الناس أفضل؟ قال: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من قال: ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره

"একব্যক্তি এসে রাসূল (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা) মানুষের মধ্যে কোন লোক উত্তম? জবাবে রাসূল (সা) বলেন: আল্লাহর পথে জান-মালসহ জিহাদকারী। লোকটি বললো, তারপর কে? তিনি বলেন: যে ব্যক্তি গিরিসংকটে (নির্জন স্থানে) অবস্থান করে মহান আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন থাকে এবং মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে।"[৩০]

কবি আবুল আতাহিয়া সাধুতা ও নির্জনতা পছন্দ করতেন। এজন্য তিনি সংসারত্যাগী সাধু ও প্রচার বিমুখদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন:

إذا أردت شريف الناس كلهم
فانظر إلى ملكٍ في زي مسكينِ

"যদি শ্রেষ্ঠ মানুষকে দেখতে চাও তবে কাঙ্গালবেশী রাজাধিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।"

দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্ম ও সংসার হতে পৃথক হওয়া ব্যতীত আখেরাতের পথে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। কেননা, নশ্বর সংসারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড মানুষকে অবিনশ্বর আখেরাতের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। এজন্য নিম্নলিখিত পংক্তিটি তাঁর শ্রেষ্ঠ পংক্তি বলে আখ্যা দেওয়া হয়:

تَجَرَّد مِنَ الدُنيا فَإِنَّكَ إِنَّما ** سَقَطتَ إِلى الدُنيا وَأَنتَ مُجَرَّدُ

"সংসার হতে পৃথক হও; কেননা এ জগতে তুমি একাই এ সংসারে এসেছ।"

কবি আবুল আতাহিয়ার দীওয়ানের শেষপূর্ব কবিতার অংশবিশেষ:[৩১]

رغيف خبز يابسٌ ** تأكله في زاويه
وكوز ماء باردٍ ** تشربُه من صافيه

---

৩০ ইমাম ইবনে মাজাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ, নাসির উদ্দীন আলবানী সম্পাদিত (মাকতাবাহ আশ-শামেলা), খ.৮, পৃ. ৪৭৮।

৩১ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০; অনুবাদ, আবদুল হক ফরিদি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

وغرفةٌ ضيّقةٌ ** نفسُك فيها خاليه

ومسجدٌ بمَعزِل** عن الورى بناحيه

تدرس فيها دفترا ** مستندا بساريه

معتبرا بمن مضى ** من القرون الخاليه

خير من الساعات في ** فِىء القصور العاليه

تعقُبها عقوبة ** تصلى بنار حاميه

فهذه وصيتي ** مُخبرَة بحاليَه

طوبى لمن يسمعها ** تلك لعمرى كافية

فاسمع لنصح مشفق ** بدعى أبا العتاهية

“এক খণ্ড শুষ্ক রুটি-কোণে বসে ভক্ষণ কর;

এক কলসী শীতল পানীয় পবিত্রভাবে পান কর;

একটি সংকীর্ণ কুটির-তুমি সেখানে একাকী থাক;

কিংবা বিজনে মসজিদ-লোকালয় হতে দূরে অবস্থিত;

কিতাব পাঠে তুমি রত তথায়-বালিশে হেলান দিয়ে অতীতের যারা চলে গেছে-তাদের থেকে জ্ঞানার্জন কর;

সুউচ্চ অট্টালিকার ছায়াতলে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়ার চাইতে ঢের ভালো; কেননা সে জীবনের পরিণামে তোমাকে ভয়ংকর আগুনে ঝলসানো হবে;

এ-ই আমার যথার্থ উপদেশ। সৌভাগ্য ঐ ব্যক্তির, যে তা গ্রহণ করবে। জীবনের শপথ! এই উপদেশই যথেষ্ট;

অতএব, আবুল আতাহিয়ার নামের এই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর উপদেশ মেনে চলো ভাই।”

পরকাল (الآخرة)

কবি আবুল আতাহিয়ার অধিকাংশ কবিতাই পরকাল সম্বন্ধীয়। তিনি আব্বাসীয় যুগের উন্নয়ন ও প্রাচুর্যের সন্ধিক্ষণে অশ্লীলতার জোয়ারে ভেসে যাওয়া কবিদের আখেরাত ও পরকাল সম্বন্ধে সজাগ করেন। আবু নুয়াস, বাশ্‌শার ইবনে বুরদের মদ, নারী ও অশ্লীলতাকে কটাক্ষ করে কবিতা রচনা করেন। কবি বলেন[৩২]:

لِدُوا للموتِ وابنُوا لِلخُرابِ ** فكُلّكُمُ يَصِيرُ إلى تَبابِ

---

৩২ কবি আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

سَأَسأَلُ عَن أُمورٍ كُنتُ فيها ** فَما عُذري هُناكَ وَما جَوابي

بِأَيِّ حُجَّةٍ أَحتَجُّ يَومَ الـ ** ـحِسابِ إِذا دُعيتُ إِلى الحِسابِ؟

"মৃত্যুর জন্যই বংশবৃদ্ধি; ধ্বংসের জন্যই অট্টালিকা নির্মাণ। সকলকেই ধ্বংস ও বিনাশের পথে যেতে হবে;

এখানে থেকে কি কি করেছি সে বিষয় যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে তখন কি ওজর পেশ করবো এবং কি উত্তরই বা দিব?

কিয়ামতের দিন যখন আমাকে হিসাবের জন্য ডাকা হবে, তখন কোন যুক্তি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করব?

আখেরাতের প্রস্তুতি (التزود للاخرة)

প্রতিটি মানুষ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে পড়ে চিরস্থায়ী আখিরাতকে ভুলে যায়। অথচ দুনিয়াতেই আখিরাতের পাথেয় অর্জন করাটা জরুরি। প্রতিদিন আমাদের সামনে কত মানুষ মৃত্যুবরণ করছে অথচ আমরা পরকালের পাথেয় অর্জন করছি না। কবি আবুল আতাহিয়া দুনিয়াতেই আখেরাতের পাথেয় অর্জন করার উপদেশ প্রদান করে বলেন[৩৩]:

مضى قبلنَا قومٌ قرونٌ نعدُّهم ** وَنحنُ وَشيكاً سوْفَ نمضي كَما مضوا

ألا في سبيلِ اللهِ أيُّ ندامةٍ ** نموتُ، كمَا ماتَ الأُلى، كُلمّا خلَوا

وَلَمْ نَتَزَوَّدْ لِلْمَعادِ وَهَوْلِهِ ** كَزادِ الَّذِينَ اسْتَعْصَمُوا اللهَ وَاتَّقَوْا

"আমাদের পূর্বে কতশত অগণিত মানুষ চলে গেছে, যাদের নিয়ে আমরা আলোচনা করি এবং আমরাও এক সময় চলে যাবো যেমনিভাবে তারা ইতোপূর্বে চলে গেছে;

মনে রেখো, আল্লাহর রাহে পথ চলায় কি কোনো লজ্জা বা শঙ্কা আছে? আমরা পূর্বসূরিদের মতো মৃত্যু বরণ করবো, যেমনিভাবে তারা আমাদেরকে রেখে চলে গেছে;

অথচ আমরা আখিরাতের ভীতিকর পরিস্থিতির জন্য কোনো প্রস্তুতি বা পাথেয় অর্জন করিনি যেমনিভাবে আল্লাহভীরুগণ পাথেয় সঞ্চয় করে তাঁর প্রতি প্রত্যাশা ও ভয় মনে নিয়ে।"

মৃত্যু সম্পর্কিত কবিতা (الموت)

মৃত্যু হল মানুষের ইহকালীন জীবনের পরিসমাপ্তি। মৃত্যু এক অলঙ্ঘনীয় ও অনিবার্য বাস্তবতা। পৃথিবীর সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। যদিও মৃত্যুর অবতরণস্থল অপছন্দনীয় ও তার আস্বাদন তিক্ত। মানুষ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তাকে স্মরণ করতে চায় না; দুনিয়ার মোহ তাদেরকে এমনই মত্ত করে রেখেছে।

---

৩৩ কবি আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

এ প্রসঙ্গে আবুল আতাহিয়া বলেন[৩৪]:

نراع لذكر الموت ساعة ذكره ** وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب

ونحن بنو الدنيا خلقنا لغيرها ** وما كنت منه فهو شئ محبب

"যখন মৃত্যুর ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় শুধুমাত্র তখনই আমরা তার ভয়ে ভীত হই। পরক্ষণেই দুনিয়ার মোহে পড়ে খেলা-ধুলায় মত্ত হয়ে যাই; অথচ আমাদের উচিত সব সময়ের জন্যই মৃত্যুকে ভয় করা। কেননা আমরাতো দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি হইনি, সৃষ্টি হয়েছি অন্য ভূবনের জন্য। এখানে আমরা আগেও ছিলাম না পরেও থাকবো না, কাজেই এ দুনিয়ার মোহময় ও ভালবাসা একেবারেই নিরর্থক।"

মৃত্যু মানুষের সন্নিকটবর্তী এক চিরন্তণ বাস্তবতা। সুতরাং মৃত্যুর হিমশীতল ছোবল থেকে পালানোর সুযোগ নেই। একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কবি বলেন:

أَلَم تَرَ أَنَّ كُلَّ صَباحِ يَومٍ ** يَزيدُكَ مِن مَنِيَّتِكَ اِقتِرابا

وَحَقَّ لِموقِنٍ بِالموتِ أَلّا ** يُسَوِّغَهُ الطَعامَ وَلا الشَرابا

"তুমি লক্ষ্য করছ না যে, প্রতিদিনের সকাল তোমার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করছে? মৃত্যু আর মরণের বাস্তবতায় আস্থাশীলের জন্য এটাই রূঢ় সত্য যে, তার পানাহার সুখকর নয়।"

কবি আরো বলেন,

أَينَ المَفَرُّ مِنَ القَضا ** ءِ مُشَرِّقاً وَمُغَرِّبا

اِنظُر تَرى لَكَ مَذهَباً ** أَو مَلجَأً أَو مَهرَبا

سَلِّم لِأَمرِ اللَهِ وَأَر ** ضَ بِهِ وَكُن مُتَرَقِّبا

يَزدادُ مِن حَذَرِ المَنِيـ ** ـيَةِ بِالفَرارِ تَقَرُّبا

"পূর্ব কিংবা পশ্চিম মৃত্যু হতে পলায়নের স্থান কোথায়? লক্ষ্য কর, তোমার আত্মগোপন ও আশ্রয়ের কোন স্থান পাও কিনা? সুতরাং আল্লাহর নির্দেশকে তুমি স্বাগত জানিয়ে অপেক্ষমান থাক।মরণের ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো বা মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা মৃত্যুর নৈকট্যকেই কেবল বৃদ্ধি করে।"

---

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

জীবন-মৃত্যুর দার্শনিক ব্যাখ্যা কবি নিঃসঙ্কোচে দিতে গিয়ে বলেছেন: [৩৫]

حياتك أنفاس تعد فكلما**مضى نفسٌ انتقصت به جزءا

يميتك ما يحييك، في كل ساعة، ** ويحدوك حاد ما يريد بك الهزءا

"তোমার জীবন কতিপয় হিসেব করা শ্বাস-প্রশ্বাস মাত্র, যখনই একটি শ্বাস অতীত হয়, তখনই তুমি জীবনের একটি অংশ হারাও; যা দ্বারা বেঁচে থাক, প্রতি মুহূর্তে তাই তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে আনে, তোমাকে এমন এক চালক হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যে কোনোরূপ ছাড় দেবেনা, ছেড়েও দেবেনা।"

জীবন সায়াহ্নে মৃত্যুর অনিবার্য আহবান কবি বেশি করে অনুভব করেছেন। এ সময়ের লেখা কবিতায় তাই ফুটে উঠেছে; যা কবির কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়পংক্তি ছিল: [৩৬]

لَيتَ شِعري فَإِنَّني لَستُ أَدري ** أَيُّ يَومٍ يَكونُ آخِرَ عُمري

وَبِأَيِّ البِلادِ تُقبَضُ روحي ** وَبِأَيِّ البِقاعِ يُحفَرُ قَبري

"হায় আফসোস ! আমি জানিনা কোন দিনটি হবে মোর অন্তিম দিন; কোন স্থানে মোর মৃত্যু হবে, এবং কোন ভূখণ্ডে মোর কবর খোঁড়া হবে।"

কবির এ দুটি কবিতার পঙক্তিমালা তাঁর কাব্যের গতি-প্রকৃতি, বিষয়বস্তু ও দার্শনিক মতাদর্শেরই পরিচয় দেয়।"

কবি জীবন সায়াহ্নে এসে পরকালীন জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত হয়ে উঠেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো প্রণিধানযোগ্য:[৩৭]

تَجَرَّد مِنَ الدُنيا فَإِنَّكَ إِنَّما ** سَقَطتَ إِلى الدُنيا وَأَنتَ مُجَرَّدُ

"সংসারের ঝামেলা হতে মুক্ত হও, তুমি তো নিঃসঙ্গ ও একাকীই এ জগৎ সংসারে পতিত হয়েছ।"

কবি অন্যত্র বলেন[৩৮]:

النَّاسُ في غَفَلاتِهِم ** و رَحى المَنِيَةِ تَطْحَنُ

كُلُّ حيٍّ عندَ ميتتهِ ** حظُّهُ من مالِهِ الكفَنُ

---

৩৫ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪

৩৬ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৩৮ শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী-৩, আল-আসরুল আব্বাসী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৬খ্রি.), ৬ষ্ঠ সং, পৃ. ২৪৯।

“মানুষ তাদের উদাসীনতায় বিভোর, অথচ প্রাণঘাতি মরণের চাকতি (যাঁতাকল) ঘূর্ণায়মান, সেতো পিষে দলিত-মথিত করে যাচ্ছে। জীবন্ত সকলেই তার মরদেহের নিকটেই অবস্থানরত, পার্থিব সম্পদ থেকে তার প্রাপ্য অংশতো শুধুই কাফনের (শুভ্র) বস্ত্রখানি।”

মৃত্যু নিকটবর্তী (الفناء قريب)

মহান আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক প্রাণীকেই নির্দিষ্ট আয়ু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। মৃত্যু যদিও অনিবার্য বাস্তবতা তবুও আমরা বারে বারে তা ভুলে যাই। সুতরাং প্রতিটি মানুষের কাজ হচ্ছে, সেই অনিবার্য মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা।

কবি বলেন[৩৯]:

أَيا إِخوَتي آجالُنا تَتَقَرَّبُ ** وَنَحنُ مَعَ اللاهينَ نَلهو وَنَلعَبُ
أُعَدِّدُ أَيّامي وَأُحصي حِسابَها ** وَما غَفلَتي عَمّا أَعُدُّ وَأَحسُبُ
غَداً أَنا مِن ذا اليَومِ أَدنى إِلى الفَنا ** وَبَعدَ غَدٍ أَدنى إِلَيهِ وَأَقرَبُ

“ওহে ভাইসব! আমাদের নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময় (মৃত্যু)তো সন্নিকটবর্তী, অথচ আমরা পরিজন সমভিব্যহার ও খেলতামাশায় মত্ত আছি। আমি স্বীয় দিন-ক্ষণ গণনা করছি এবং তার হিসেব কষছি, আমার ক্ষণ-গণনা ও হিসেব কষার ক্ষেত্রে কোন ঔদাসীন্য নেই। আমি আগামীকাল আজকের চেয়ে বিনাশ বা মৃত্যুর অধিক নিকটবর্তী এবং আগামী পরশুতো আরও অধিকতর নিকটবর্তী।”

কবর সম্পর্কিত কবিতা (القبر)

কবর হলো আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি। কবর এমন নির্বাক ছাদবিশিষ্ট গর্ত যেখানে শিশু, কিশোর, আবাল-বৃদ্ধ সবাইকে যেতে হবে। যেখানে এক বন্ধু অপর বন্ধুকে স্বহস্তেই সমাহিত করে। কবি জনৈক বন্ধুর শোক প্রকাশ উপলক্ষে বলেন[৪০]:

مالى مررت على القبور مسلما ** قبر الحبيب فلم يرد جوابي
لو كان ينطق بالجواب لقال لي:** اكل التراب محاسني وشبابي

“কি হলো আমার, বন্ধুর কবরের পাশ ঘেঁষে সালাম দিয়ে অতিক্রম করলাম কিন্তু সে আমার সালামের জাওয়াব দিচ্ছে না। যদি সে উত্তর দিত সে আমাকে বলতো, মাটি আমার রূপ-লাবণ্য ও আমার যৌবনকে গিলে ফেলেছে।”

---

৩৯ দীওয়ানু আবুল আতাহিয়া, আহমদ আবদুল মজিদ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৪০ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।

তিনি আরো বলেন:

ما لِلمَقابِرِ لا تُجيـ ** ـبُ إِذا دَعاهُنَّ الكَئيبُ
حُفَرٌ مُسَتَّرَةٌ عَلَي ** هِنَّ الجَنادِلُ وَالكَثيبُ
فيهِنَّ وِلدانٌ وَأَط ** ـفالٌ وَشُبّانٌ وَشيبُ

"দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি কবরকে ডাক দিলেও সে সাড়া না দিয়ে নির্বাক থাকে। কবর হলো এমন ছাদ বিশিষ্ট যার উপরে রয়েছে মাটি ও পাথরের চাঁই। যেখানে রয়েছে শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীরই সমান অবস্থান।"

কবর সম্পর্কে কবি আরও বলেন[৪১]:

نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية ** طفلُ الملوك هنا، كطفل الحاشية!!
ونغادر الدنيا ونحن كما ترى ** متشابهون على قبور حافية!!
أعمالنا تُعلي وتَخفض شأننا ** وحسابُنا بالحق يوم الغاشية!!
حور وأنهار، قصورعالية ** وجهنمٌ تُصلى، ونار حامية!!
فاختر لنفسك ما تُحب وتبتغي ** ما دام يومُك والليالي باقية!!
وغداً مصيرك لا تراجع بعده ** إما جنان الخلد وإما الهاوية!!

"পৃথিবীতে আগমনকালে আমরা সবাই সমান, রাজার সন্তান ও অতি সাধারণ প্রজার সন্তানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকেনা;
দুনিয়া থেকে চির বিদায়ের কালে কবরের গুহায়ও সবাই সাদৃশ্যপূর্ণ;
আমাদের আমল (পাপ-পূণ্য) আমাদের মর্যাদাকে উন্নত বা অবনত করবে কিয়ামত দিবসে সত্যের নিরিখে যখন আমরা হিসাবের মুখোমুখি হব;
সেখানে ভাগ্যে হয়তো হুর, ঝর্ণাধারা এবং সুউচ্চ হর্ম্যরাজি জুটবে অথবা উত্তপ্ত অগ্নিশিখা ও জ্বলন্ত নরক জুটবে;
সুতরাং নিজের পছন্দসই জিনিসটি বেছে নাও, দিবস যামিনী অবশিষ্ট থাকতে;
আগামীকাল তোমার ঠিকানা হবে সেই না ফেরার দেশে, হয়তো চিরস্থায়ী জান্নাত অথবা হাবিয়া (জাহান্নাম)।"

তাওবা (التوبة)

তাওবা শব্দের অর্থ- প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা।[৪২] অর্থাৎ গুনাহের কারণে নিজ মনে লজ্জিত হওয়া এবং পুনরায় না করার দৃঢ়সংকল্প করা।[৪৩] পাপ থেকে পরিত্রাণ বা

---

[৪১] আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

মুক্তিলাভের উপায় হলো- আল্লাহর নিকট তাওবা করা। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে সর্বান্তকরণে তাওবা কর। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান প্রস্রবনসমূহ।"[৪৪] রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষকে তাওবা করার উপদেশ দিয়ে বলেন[৪৫]:

يا ايها الناس! توبوا الى الله واستغفروه فانى أتوب في اليوم مائة مرة

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করো, কেননা আমি দৈনিক শতবার তাওবা করি।"

কবি আবুল আতাহিয়া তাওবা করতে অক্ষম হবার পূর্বেই নিজেকে নিজে উৎসাহ দিয়ে বলেন:

يا نَفسُ توبي قَبلَ أَن ** لا تَستَطيعي أَن تَتوبي
وَاستَغفِري لِذُنوبِكِ الرَ ** حمَنَ غَفّارَ الذُنوبِ

"হে আমার আত্মা! তুমি তাওবা করতে অক্ষম হবার পূর্বেই তাওবা কর। তুমি তোমার কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাওবা কর পরম করুণাময় ও দয়ার্দ্র আল্লাহর নিকট যিনি যাবতীয় পাপ মার্জনাকারী।"

কবি তাওবার ব্যাপারে আত্মজিজ্ঞাসার ছলে বলেন[৪৬]:

ألا لله أنت متى تتوب، ** وقد صبغت ذوائبك الخطوب
كأنك لست تعلم أي حث ** يحث بك الشروق، كما الغروب
ألست تراك كل صباح يوم، ** تقابل وجه نائبة تنوب

---

৪২ ইবনে মানযুর আল-আফরিকী, লিসানুল আরব (বৈরুত: মু'আস্সাতুত্-তারীখিল-'আরাবী, ১৪১৩হি./১৯৯৩খ্রি.), স.২, পৃ. ১৫০।

৪৩ ড. মুহাম্মদ রাওয়াশ ও ড. হামিদ সাদিক, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা (পাকিস্তান: ইদারাতুল-কুর'আন, তা.বি.), পৃ. ১৫০; মুহাম্মদ 'আলী থানুভী, কাশ্শাফু ইসতিলাহিল-ফুনূন (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮হি./১৯৯৮খ্রি.), ১ম সং, খ. ১, পৃ. ২১৮।

৪৪ সূরা তাহরিম, আয়াত: ০৮।

৪৫ ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আর-নিশাপুরী, সহিহ মুসলিম (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮খ্রি.), ১ম প্রকাশ, পৃ. ২৪।

৪৬ দীওয়ানু আবুল আতাহিয়া, আহমদ আবদুল মাজিদ গাযালী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

لعمرك ما تهب الريح،** إلا نعاك مصرحا ذاك الهبوب

ألا لله أنت فتى وكهلا، ** تلوح على مفارقه الذنوب

"মহান আল্লাহর শপথ! ওগো তুমি তাওবা কবে করবে? অথচ রকমারি ঝঞ্ঝায় তোমার কেশররাজি রঙিন হয়ে পড়েছে! যেন তুমি কোন প্রেরণাই জাননা, যা তোমাকে বেলার উদয়-অস্ত তথা জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে সমভাবে উৎসাহিত করবে। তুমি নিজেকে প্রতিদিন প্রাতে: কোননা কোন বিপদাপদের মুখোমুখি হতে দেখ না? তোমার জীবনের শপথ! প্রবাহমান বায়ু তোমারই সৌজন্যে সশব্দে বিলাপ করে চলেছে। মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, যৌবনে ও বার্ধক্যে পাপের ভেদ রেখা দীপ্তি ছড়াচ্ছে।"

পুনরুত্থান ও হাশর-নশর (البعث والنشور)

মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করে কেয়ামতের মাঠে হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। এরপর সকলের কাছ থেকে জাগতিক জীবনের সবকিছুর হিসাব গ্রহণ করা হবে। হিসাব-নিকাশের মানদণ্ডে আল্লাহর যেসব বান্দা উত্তীর্ণ হবেন তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। আর যারা হতভাগ্য তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কবি হাশর-নশর সম্পর্কে বলেন:

فلو أنا إذا متنا تركنا ** لكان الموت غاية كل حي

ولكنا إذا متنا بعثنا ** ونسأل بعده عن كل شيء

"আমরা যখন মরে যাই, সবই ছেড়ে চলে যাই। আর মৃত্যুই প্রাণীকূলের অবধারিত পরিণতি। কিন্তু মৃত্যুর পর আমরা আবার পূণরুজ্জীবিত হবো এবং সর্ববিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবো।"

নিজেকে সতর্ক করা (تنبيه النفس)

প্রত্যেক মানুষেরই আখিরাত সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া জরুরি। তেমনি প্রত্যেকে মৃত্যুর পূর্বে আত্মপর্যালোচনা ও নিজেই নিজের হিসাব নেওয়াও আবশ্যক। কবি নিজেকে নিজে সতর্ক করতেন। তিনি নিজেকে সতর্ক করে বলেন[৪৭]:

فَإِلى مَتى أَنا غافِلٌ ** يا نَفسُ وَيحَكِ خَبِّريني

وَإِلى مَتى أَنا مُمسِكٌ ** بُخلاً بِما مَلَكَت يَميني

يا نَفسُ لا تَتَضايَقي ** وَثِقي بِرَبِّكِ وَاستَعيني

وَتَفَكَّري في المَوتِ أَح ** ياناً لَعَلَّكِ أَن تَليني

"আর কতকাল আখিরাত সম্বন্ধে উদাসীন থাকবে, হে আমার অন্তরাত্মা! তোমার জন্য আফসোস, তুমি আমাকে সে দিনক্ষণ জানিয়ে দাও;

---

৪৭ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯।

আমার দক্ষিণ হস্ত যা উপার্জন করেছে, কার্পণ্যের বশে তা আমি আর কতকাল আঁকড়ে রাখবো;

হে আমার অন্তরাত্মা! তুমি আমার সাথে রুঢ় আচরণ করো না। তুমি তোমার রবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আমাকে এ কাজে সহযোগিতা কর;

হে আমার আত্মা! তুমি মৃত্যুর চিন্তা কর, তাহলে তুমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে গুনাহ কম করবে।"

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারীর প্রতি উপদেশ (النصيحة)

কু-প্রবৃত্তি মানুষকে দুষ্কর্মের দিকে ধাবিত করে। প্রবৃত্তির চাহিদা অন্তহীন। প্রবৃত্তি সর্বদা কামনা-বাসনা, লোভ-লালসায় লিপ্ত থাকতে চায়। যারা প্রবৃত্তির লাগাম নিজেদের হাতে নিতে পেরেছেন, প্রবৃত্তির ফাঁদে যারা পা দেননি তারাই সফলকাম হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন: প্রকৃত মুজাহিদ সেই, যে তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।" কবি প্রবৃত্তির দাসত্ব না করার উপদেশ দিয়ে বলেন[৪৮]:

يا ذا الهوى مه لا تكن ** ممن تعبده هواه

واعلم بان المرء مرتهن ** بما كسبت يداه

قد كان مغترا بيوم ** وفاته حتى اتاه

الناس في غفلاتهم ** والموت دائرة رحاه

"হে প্রবৃত্তির অনুসরণকারী, তুমি তার মতো হয়ো না, যে তার কুপ্রবৃত্তির পূজা করে;

জেনে রেখ, মানুষ হলো তার দু'হাতের কামাইয়ের নিকট বন্ধকিপ্রাপ্ত;

মানুষ তার মৃত্যু পর্যন্ত ধোঁকায় নিমজ্জিত থাকে এবং তার মৃত্যু নিয়েও সন্দিহান থাকে, এমনি এক মুহূর্তে তার মৃত্যু চলে আসে;

মানুষ মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন। অথচ মৃত্যু তাকে ভুলেনি, সে তার চাকতিকে ঘুরিয়ে যাচ্ছে।"

আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (مناجات)

মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব থেকে বন্ধুদের সংসর্গ পরিত্যাগ করে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। এর কিছুকাল পর তিনি 'কাল রোগে' আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পদধ্বনি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি বার বার নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতে থাকেন:[৪৯]

الهي لا تعذبني فإني ** مقر بالذي قد كان مني

---

৪৮ আবুল আতহিয়্যা, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬।

৪৯ আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

ومالي حيلة إلا رجائي ** وعفوك ان عفوت وحسن ظني
وكم من زلة لي في البرايا ** وأنت علي ذو فضل ومن
إذا فكرت في ندمي عليها ** عضضت أنا ملي وقرعت سني
يظن الناس بي خيرا وإني ** لشر الناس إن لم تعف عني

"হে আমার প্রভু! আমাকে শাস্তি দেবেননা, আমার থেকে যা কিছু হয়েছে (পাপকার্য) তার আমি স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি দিচ্ছি।

আপনার ক্ষমার আশা ব্যতীত আমার কোন উপায় নেই, আমার সেই শুভপ্রত্যাশা অনুসারে আপনি আমায় ক্ষমা করুন"

সৃষ্টিকুলের মাঝে আমার কত না পদস্খলন। তবে আপনিই আমার প্রতি দয়াবান ও অনুগ্রহশীল;

আমার পদস্খলনের কথা যখন ভাবি, তখন লজ্জা ও অপমানে আমি স্বীয় আঙ্গুল ও দাঁতে দাঁত কাটি।

মানুষ আমার প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে; অথচ আপনি যদি ক্ষমা না করেন তাহলে আমি মানবকুলের সর্বাপেক্ষা অধম ব্যক্তি।"

পরিশেষে বলা যায় যে, কবি আবুল আতাহিয়া আব্বাসী যুগের ক্ষমতাসীনদের খুব কাছ থেকে অবলোকন করে তাদের ভোগ-বিলাস ও অনাচার দেখে বিস্মিত হয়েছেন। তিনি দরবারী কবি হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি কালক্রমে হয়ে উঠেন দুনিয়াবিমুখ কবি। খলীফাদের সুদৃষ্টি তাঁকে বিশাল সম্পদের অধিকারী করলেও তিনি জাগতিক ভোগ বিলাসে ও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেননি। জীবন ও জগতে ছড়িয়ে থাকা অসঙ্গতি ও অভিজাত শ্রেণির ভোগবাদী চরিত্র তাঁকে দুনিয়া বিমুখ করে তোলে। তিনি নির্মাণ করতে থাকেন অসাধারণ সব যুহ্দ বা তাপস কবিতা। এক সময় তিনি হয়ে উঠেন যুহদ কবিতার প্রবর্তক (رائد)। তিনি তৎকালীন অশ্লীল ও ভোগবাদী কবিদের প্রত্যাখ্যান করে নতুন আঙ্গিকে যুহদ তথা দুনিয়ার অনাসক্তি ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করার আহ্বান জানিয়ে কবিতা রচনা করেন।[৫০]

---

৫০ হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আবু নুয়াস বিরচিত যুহদিয়াত কবিতা

আব্বাসী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আবু নুয়াস প্রাথমিক জীবনে ভোগবাদী জীবনধারার কর্ণধার ছিলেন। তাঁর জীবনে ভোগ ও ত্যাগ এই প্রধান বিপরীত জীবনধারার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আব্বাসীয় সমাজের একটা অংশের ভোগ-বিলাস যখন চরম মাত্রায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং খলিফাগণ ভোগ-উপভোগের নিত্য-নতুন উপায় উপকরণে মেতে উঠেছিল; ঠিক তখনই আবু নুয়াসের আবির্ভাব। ফলে তাঁর কবিতায় পাপাচারিতা ও ধর্মহীনতার স্থান পায় এবং তিনি উদ্ভট পাপাচারী হিসেবে পরিচিত হন। শেষ বয়সে এসে কবি ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং যুহদিয়াত কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর যুহদিয়াত কবিতায় অতীত কৃত জীবনের অনুশোচনা, দুনিয়ার প্রতারণা, আখিরাত, কবর ইত্যাদি বিষয়াবলী ফুটে ওঠে। নিম্নে আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

কবি আবু নুয়াসের যুহদ কবিতার প্রেক্ষাপট

কবি আবু নুয়াসের সমকালীন আব্বাসী যুগের প্রারম্ভিক সময় খলিফাগণ সম্পদ-প্রাচুর্য, সীমাহীন বিলাসিতা, পানাহার ও সাজ-পোশাকের বৈচিত্র্য ইত্যাদিতে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক-সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবন খালদুন (৭৩২-৮০৮হি./১৩৩২-১৪০৬খ্রি.), আল-মাসঊদী (৮৯৬-৯৫৬খ্রি.) আত-তাবারী (৮৩৯-৯২৩খ্রি.) এসবের নিজস্ব গ্রন্থে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১] সমাজে যখন বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, অনৈকিতা ও অশ্লীলতার সয়লাব তখনই আবু নুয়াসের আবির্ভাব। সেজন্য কবি আবু নুয়াসের প্রসঙ্গ সামনে আসলেই মদ্যপান, ভোগ-বিলাসিতা ও শরীয়াত নিষিদ্ধ নানা ভোগবাদিতার আলোচনা এসে যায়। জাগতিক উপভোগ এবং মহাজাগতিক আকর্ষণ মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, যা হতে আবু নুয়াসের মত কবিও মুক্ত নন। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে কবি আবু নুয়াস যুহদ কেন্দ্রিক যেসব কবিতা রচনা করেছেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শেষ বয়সে এসে তাওবা করেছেন এবং প্রবল ধর্মানুরাগী হয়ে পড়েছেন।[২] এ সময় কবি 'যুহদ' রচনার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে পাপ-পঙ্ক মোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মূলত: পার্থিব জীবন সম্পর্কে যখন কবির মোহমুক্তি ঘটে, তখন অনন্ত যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে তিনি 'যুহদ' কবিতা রচনা করেন। হয়তো বা অশ্লীলতা ও নোংরা জীবন ছেড়ে পবিত্রতার সাথে বাঁচতে, তাঁর

---

১ ড. আহমদ আমীন, দুহাল ইসলাম, খ.১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

২ ড. ইসমাঈল হোসেন চৌধুরী, প্রাচীন আরবী কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০২।

শৈশবের ধর্মীয় চেতনা তার মননে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। নিম্নে আবু নুয়াসের যুহদ কবিতাসমূহের আলোচনা করা হলো:

অতীত অনুশোচনা (اصبر لمر حوادث الدهر)

কবি আবু নুয়াস প্রাথমিক জীবনে মদ্যপান, বিলাসিতা ও শরীয়ত নিষিদ্ধ নানা ভোগবাদিতায় লিপ্ত ছিলেন। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে প্রায়শ্চিত্ত করেন। এসময় সর্বান্তকরণে তাওবা করেছেন এবং প্রবল ধর্মানুরাগী হয়ে পড়েন। কবি তাঁর অতীতের অনুশোচনা করে বলেন[৩]:

اصبر لمر حوادث الدهر ** فلتحمدن مغبة الصبر

واجهد لنفسك قبل ميتتها ** واذخر ليوم تفاخر الذخر

فكان أهلك قد دعوك فلم ** تسمع وأنت محشرج السدر

وكأنهم قد عطروك على ** ظهر السرير وأنت لا تدري

وكأنهم قد زودوك بما ** يتزود الهلكى من العطر

يا ليت شعري كيف أنت** إذا غسلت بالكافور والسدر

يا ليت شعري كيف أنت على ** نعش الضريح وظلمة القبر

"কালের দুর্বিপাকে তুমি ধৈর্যধারণ কর; কেননা ধৈর্যের পরিণতি অবশ্যই প্রশংসনীয়।

মৃত্যুর পূর্বে নিজেকে (মৃত্যুর জন্য) প্রস্তুত কর এবং (পাপ-পূণ্য) পার্থক্যসূচক দিবসের জন্য সঞ্চয় কর।

যেন তোমার স্বজনরা তোমাকে ডাকছে কিন্তু তুমি শুনছনা; অথচ তোমার বক্ষ হতে প্রাণবায়ু বের হওয়ার গড়গড়া শোনা যাচ্ছে।

মৃতদের যে আতর মাখা হয় তারা যেন তোমাকে সেই আতর দিয়ে মাখছে; অথচ তোমার অনুভূতি নেই (নির্বিকার)।

তারা যেন তোমাকে এমন ভাবে সজ্জিত করছে যেমন অন্তিম যাত্রায় সুগন্ধি মেখে সজ্জিত করা হয়।

আহারে যদি জানতাম, যখন তোমাকে কর্পুর ও কুলপাতা দিয়ে গোসল দেয়া হবে তখন তোমার কী অবস্থা হবে?

আহা যদি জানতাম, কীরূপে তুমি শবযান বা খাটিয়ায় অবস্থান করবে এবং শয়ন করবে অন্ধকার কবরে?"

---

৩ আবু নুয়াস আল-হাসান ইবন হানী, দীওয়ানু আবী নুয়াস, আহমদ আবদুল মজিদ আল-গাযালী সম্পাদিত (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরবী, ১৯৮২খ্রি.), পৃ. ১৫৭।

কবি আরও বলেন:

يا ليت شعري كيف أنت إذا ** وضع الكتاب صبحية الحشر

ما حجتي فيما أتيت وما ** قولي لربي، بل وما عذري

ألا أكون قصدت رشدي أو ** أقبلت ما استدبرت من أمري

يا سوأتا مما اكتسبت، ويا ** أسفي على ما فات من عمري!

আমি যদি জানতাম, হাশরের দিন প্রভাতে যখন হিসাবের জন্য আমলনামা বা মানদণ্ড স্থাপন করা হবে তখন তোমার কী পরিণতি হবে?

(হে আল্লাহ!) আমি যা নিয়ে আসলাম তাতে আমার নির্ভরযোগ্য কৈফিয়ত নেই, আমার প্রভুকে বলার মতো আমার কোনো বক্তব্য নেই; বরং (পেশ করার মত) আমার কোনো অজুহাতও নাই।

(আমার পেশ করার মতো কোনো অনুযোগ-অজুহাত নেই) এই জন্যই যে, আমি হেদায়াতের ইচ্ছা পোষণ করিনি; কিংবা পেছনে যা রেখে এসেছি তা নিয়ে অগ্রগামী হবার সেই সাহসও আমার নেই।

হায়! আমি কত অপকর্ম করেছি! হায় বিগত জীবনের (কৃতকর্মের) জন্য আমার অনুতাপ-অনুশোচনা!

তাওবা (التوبة)

তাওবা-ইস্তিগফারের অর্থ হল, যখন বান্দা কোন নাফরমানী বা পাপকর্ম করে ফেলে, তখন অনতিবিলম্বে কৃত অপরাধের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে যাবে, তার ভেতরে অনুশোচনা সৃষ্টি হবে এবং ভবিষ্যতে এমন অপরাধে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করবে। অতঃপর আল্লাহর দরবারে কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা চাইবে।[৪] মহান আল্লাহ তা'আলা তাওবা করার হুকুম দিয়ে বলেন:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৫]

---

৪ মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী, ইসলাম ক্যায়া হায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

৫ সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১

কবি আবু নুয়াস অক্ষম অর্থাৎ মৃত্যু আসার পূর্বেই নিজেকে সম্বোধন করে কৃত অপরাধের জন্য তাওবা করার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে মহান আল্লাহর নিকট তাওবা করে বলেন: [৬]

يا نفس توبي قبل أن ** لا تستطيع أن تتوبي

واستغفري لذنوبك ** الرحمن غفار الذنوب

"হে অন্তরাত্মা! তাওবাহ করতে অক্ষম হবার পূর্বে তুমি তাওবা কর;

আর তোমার কৃত অপরাধসমূহের জন্য অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

কবি অতীত কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর নিকট তাওবার অনুমতি প্রার্থনা করে বলেন: [৭]

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ** خلوت ولكن قل علي رقيب

ولا تحسبن الله يفعل ساعة ** ولا أن ما يخفى عليه يغيب

لهونا لعمرالله حتى ترادفت ** ذنوب على آثارهن ذنوب

فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ** ويأذن في توباتنا فنتوب

"তুমি যদি দীর্ঘকাল নির্জনবাস গ্রহণ কর, তবু তুমি একদিনের জন্যও বলোনা যে, আমি নির্জন ছিলাম বরং বলো-আমার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উপর একজন (অদৃশ্য) পর্যবেক্ষক সদা নিয়োজিত ছিলেন। তুমি আল্লাহকে বেখবর ভেবো না মুহূর্তকালের জন্যও, এটাও ভেবোনা যে, তাঁর কাছে কোনকিছু অদৃশ্য বা গোপন আছে। আল্লাহর নামে জীবনের শপথ করে বলছি, খেল-তামাশায় জীবন কাটালাম, ফলে পাপের পর শুধু পাপই সংঘটিত হলো। হায়, আল্লাহ যদি অতীত কৃতকর্ম ক্ষমা করতেন আর আমাকে তাওবার অনুমতি দিলে আমি তাওবাহ করতাম।"

---

৬ আবু নুয়াস, দীওয়ান (মিসর: মাতবা'আতুল উমূমিয়্যাহ, ১৮৯৮খ্রি.), ১ম সং, পৃ. ১৯৪।

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১০।

আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা (الاستعاذة بالله)

পবিত্র কুর'আন পাঠের পূর্বে তা'আউয পাঠ করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যে কোনো প্রকার অনিষ্ট, ফিতনা-ফাসাদ ও বালা-মুসিবতের সময় মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং উম্মতদেরকে আশ্রয় প্রার্থনা করা শিক্ষা দিয়েছেন। প্রতিটি মুসলমানের উচিত সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা। কবি একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন[৮]:

أَيا مَن لَيسَ لي مِنهُ مُجيرُ ** بِعَفوِكَ مِن عَذابِكَ أَستَجيرُ

أَنا العَبدُ المِقِرُّ بِكُلِّ ذَنبٍ ** وَأَنتَ السَيِّدُ المولى الغَفورُ

فَإِن عَذَّبتَني فَبِسوءِ فِعلي ** وَإِن تَغفِر فَأَنتَ بِهِ جَديرُ

عصيت وتبت من ذنبي واني** الي الغفران محتاج فقير

أَفِرُّ إِلَيكَ مِنكَ وَأَينَ إِلّا ** إِلَيكَ يَفِرُّ مِنكَ المستَجيرُ

"ওহে (আল্লাহ) যিনি ছাড়া আমার কোনো আশ্রয়দাতা নাই, তোমার ক্ষমার বদৌলতে তোমার শাস্তি হতে আমি আশ্রয় চাই।

আমি আপনার এমন বান্দা যে তার সমুদয় পাপ স্বীকার করছে, আর আপনিতো মহামহিম প্রভু, পাপমোচনকারী।

আপনি যদি আমাকে শাস্তি দেন, তবে তা আমার দুষ্কর্মের কারণে দিতেই পারেন; আর যদি ক্ষমা করেন তবে আপনিতো এর যথাযোগ্য স্বত্তা।

আমি অবাধ্য হয়েছি এবং বর্তমানে পাপ হতে তাওবা করছি; আমি মহাক্ষমাশীলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষার বড়ই কাঙ্গাল।

আপনার কাছ থেকে পলায়ন করে আপনারই কাছে আশ্রয় চাই। আশ্রয়প্রার্থী তো শুধু আপনার সমীপেই আশ্রয় নেবে।"

---

৮ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া (الإنابة إلى الله)

দুনিয়াতে কেউই স্থায়ী নয়। প্রত্যেককে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। সুতরাং আমাদের কৃত ভুল-ত্রুটি পাপ চিহ্নিত করে এগুলোর জন্য অনুতাপ-অনুশোচনার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। কবি মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন:

يا سائل الله فزت بالظفر ** وبالنوال الهني لا الكدر

فارغب إلى الله لا إلى بشر ** منتقل من صبا إلى كبر

وارغب إلى الله لا إلى جسد ** منتقل في الصروف والغير

إن الذي لا يخيب سائله ** جوهره غير جوهر البشر

“হে আল্লাহর সমীপে প্রার্থনাকারী, তুমি কোন ক্লেদ-কালিমা ছাড়াই দান ও কল্যাণ লাভে ধন্য হবে। সুতরাং তুমি আল্লাহর সমীপে মনোনিবেশ কর, কোন মানুষের কাছে নয়; কেননা তুমিতো শৈশব থেকে বার্ধক্যের দিকে ধাবিত হচ্ছ। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ এমন সত্ত্বা, যিনি কোন প্রার্থীকে নিরাশ করেননা, তাঁর রত্ন মনুষ্যরত্ন তূল্য নহে।”

পৃথিবী পরীক্ষাগার (الدنيا دار الابتلاء)

পার্থিব জীবনে মৃত্যু প্রতিটি মানুষের জন্য অবধারিত। কিন্তু মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মানুষের আর মৃত্যু নেই। এক অনন্ত জীবনে সে পদার্পণ করবে। পার্থিব জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষার স্থল। প্রত্যেকটি মানুষ এখানে এক একজন পরীক্ষার্থীও বটে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে অর্থাৎ এই দুনিয়ার জীবনের অবসান হলে প্রত্যেককেই উপস্থিত হতে হবে প্রতিফল দিবসের ময়দানে, অর্থাৎ ‘ইয়াওমুল হাশরে’। কবি আবু নুয়াস বলেন:

تبارك رب دحا أرضه ** وأحكم تقدير أقواتها

وصيرها محنة للورى ** تغر الغوي بغزواتها

فما نرعوي لأعاجيبها ** ولا لتصرف حالاتها

ننافس فيها وأيامها ** تردد فينا بأفاتها

أما يتفكر أحياؤها ** فيعتبرون بأمواتها

“কত মহিয়ান সেই প্রভু যিনি পৃথিবীকে সুবিস্তৃত করেছেন এবং এর জন্য নির্ধারিত খাদ্যের যোগান দিয়েছেন;

তিনি একে (পৃথিবীকে) সৃষ্টিজগতের জন্য পরীক্ষাগার করেছেন; যা ভ্রষ্ট লোককে তার সমরাঙ্গনে প্রতারিত করে;

কিন্তু আমরা এর (দুনিয়ার) নানা চমক ও অবস্থার পরিবর্তনে সতর্ক হচ্ছি না;

আমরা এতে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত; অথচ এর নানা দিনগুলো (কালের কষাঘাত) আমাদের উপর বিপদসমেত আপতিত;

এর (পৃথিবীর) জীবিত লোকেরা কি চিন্তা ফিকির করবে না? আর মৃতদের দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে না?”

দুনিয়ার সন্তুষ্টি (الرضاء في الدنيا)

দুনিয়ার ধন, সম্পদ ও প্রাচুর্য লাভে কখনো মানুষ পূর্ণাঙ্গ সন্তুষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয় না। পার্থিব সম্পদের চাহিদা মানুষের থেকেই যায়। কবি আবু নুয়াস বলেন-

متى ترضى من الدنيا بشئ * إذا لم ترضى منها بالمزاج

ألم تر جوهر الدنيا المصفي ** ومخرجه من البحر الأجاج

“বিস্বাদ ও তিক্ত বাদাম সদৃশ এই পৃথিবী নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট নও, তবে পৃথিবীর কোন বস্তু নিয়ে কবে কখন সন্তুষ্ট হবে তুমি?

তুমি কি পৃথিবীর স্বচ্ছ মণিমুক্তা দেখোনি? যার উৎপাদনস্থল হচ্ছে লবণাক্ত সমুদ্র!”

দুনিয়ার জীবন (الحياة الدنيوية)

মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আখিরাত বা পরকাল। আর পৃথিবী হলো তার শস্যক্ষেত্র। তাই ক্ষণস্থায়ী এ পার্থিব জীবনের মোহে পড়ে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ থেকে উদাসীন হওয়া যাবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا – وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ, পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী"[৯] নশ্বর এ দুনিয়ার জীবনকে অনেকে রঙ্গমঞ্চ মনে করে ক্রীড়া-কৌতুক ও আমোদফূর্তিতে কাটিয়ে দেয়। অপরদিকে আল্লাহর খালেস বান্দাগণ স্বল্পকালীন এ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে অনন্ত-অসীম জীবনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। দুনিয়ার এ প্রকৃতি সম্পর্কে আবু নুয়াস বলেন[১০]-

ألا إنما الدنيا عروس وأهلها ** اخو دعة فيها وأخر لاعب

وذوذلة فقرا وأخر بالغني ** عزيز ومكظوظ الفؤاد وساغب

"জেনে রেখ!, দুনিয়ার জিন্দেগি যেন বাসরঘর। এর অধিবাসীদের কতক শান্তপ্রকৃতির আর কতক যেন আনন্দফূর্তিতে মাতোয়ারা খেলোয়াড়;

এখানে দারিদ্র্যের কষাঘাতে অনেকে অপমান ও অপদস্থ যেমন হয়ে থাকে; তেমনিভাবে অনেকে আবার সম্পদের প্রাচুর্যের ফলে সম্মানিত ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে।"

দুনিয়া এক প্রকার প্রতারণার উপকরণ। মানুষ দুনিয়ার চাকচিক্য ও মরীচিকার পেছনে দৌঁড়ে প্রবঞ্চনার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে যায়। পার্থিব জীবনের প্রতারণা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন[১১]:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"পার্থিব জীবনতো প্রতারণার উপকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

কবি আবু নুয়াস দুনিয়ার প্রতারণা সম্পর্কে বলেন[১২]:

ولا يغرنك دنيا ** نعيمها عنك نازح

وبغضها لك زين ** وحبها فاضح

"দুনিয়া যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। কেননা এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তোমা হতে দূরীভূত হয়ে যাবে। আর এর ঘৃণ্য জিনিসসমূহ তোমার জন্য সুশোভিত করা হয়েছে এবং এর পছন্দনীয় বস্তুসমূহ তোমার জন্য তুচ্ছজ্ঞান করা হয়েছে।"

---

৯ সূরা আল-'আলা, আয়াত: ৮৭।

১০ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

১১ সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ২০।

১২ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

দুনিয়া অন্বেষণকারীদের প্রতি উপদেশ (النصيحة لطالب الدنيا)

কবি আবু নুয়াস দুনিয়ার সঞ্চয়কারীদেরকে আখেরাতের জন্য আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি দুনিয়া অন্বেষণকারীদের চিরস্থায়ী নিবাস আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করার উপদেশ দিয়ে বলেন[১৩]:

من كان جمع المال همته ** لم يخل من غم ومن كمدِ
يا طالب الدنيا ليجمعها ** جمحت بك الآمال فاقتصدِ
والقصد أحسن ما عملت له ** فاسلك سبيل الخير واجتهد
واعمل لدار أنت جاعلها ** دار المقامة آخر الأبد

"যার একমাত্র উদ্দেশ্য সম্পদ কুক্ষিগত করা, সে কখনো দুশ্চিন্তা ও অশান্তি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না। ওহে দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে পাগলপারা দুনিয়া অন্বেষণকারী! তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তাই তুমি মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমার সব আমলের মধ্যে মধ্যম পন্থাই শ্রেয়। তাই তুমি কল্যাণের পথে চল এবং যথাসম্ভব অধ্যবসায় চালিয়ে যাও। আর সেই ঘরের জন্য আমল কর, যাকে তুমি স্থায়ী নিবাস বানাবে।"

দুনিয়ার প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল-ধ্বংসশীল । কবি আবু নুয়াস মানুষকে স্থায়ী আবাস্থলের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন[১৪]:

ألا رب وجه في التراب عتيق * ويا رب حسن في التراب رقيق
ويا رب حزم في التراب ونجدة ** ويا رب رأي في التراب وثيق
الأ كل حر هالك وابن هالك ** وذو نسب في الهالكين عريق
فقل لقريب الدار إنك راحل ** إلى منزل داني المحل سحيق

"ওহে শুনে রাখ! কত মুখাবয়ব মৃত্তিকার মাঝে মুক্ত ও স্বাধীন, আর কত সৌন্দর্য মৃত্তিকার মাঝে দাসত্ববরণ করেছে। কত বুদ্ধিমান ও শক্তিসামর্থ্যবান মাটিতে মিশে গেছে, আর কত মতামতই ভূতল তলে প্রোথিত হয়ে গেছে। মনে রেখো, দুনিয়ার সব স্বাধীনচেতা ও সম্ভ্রান্ত বংশধররা ধ্বংশীল ও ও ধ্বংসশীলদের সন্তান, সেসব ধ্বংসশীলদের মাঝে কত সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্যক্তিও রয়েছেন। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে বলে দাও যে, নিশ্চয়ই তুমি ধ্বংসশীল, আর তুমি এমন একটি আবাস্থলের দিকে প্রস্থানকারী যার অবস্থান বহুদূরে।"

---

১৩ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

আত্মসমালোচনা (احتساب)

প্রতিটি মানুষের উচিত মহান আল্লাহর দরবারে হিসাব দেওয়ার আগে নিজের হিসেব নেওয়া এবং চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের জন্য তৈরি হওয়া। দুনিয়ার জিন্দেগিতে মানুষ বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত হয়। কবি প্রাথমিক জীবনে ভোগ-বিলাস ও গুনাহে মত্ত ছিলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আত্মোপলব্ধির বশে ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন। কবি স্বীয় অন্তরাত্মার মরণাপন্ন অবস্থা বর্ণনা করে বলেন[১৫]:

دب في الفناء سفلا وعلوا ** وأراني أموت عضوا فعضوا

ليس تمضي من ساعة بي إلا ** نقصتني بمرها بي جزوا

ذهبت جدتي بحاجة نفسي ** وتذكرت طاعة الله نضوا

لهف نفسي على ليال وأيام ** تجاوزتهن لعبا ولهوا

قد أسأنا كل الإساءة فالله ** هم صفحا عنا وغفرا وعفوا

"আমার মাঝে উপর ও নীচ থেকে ফানা বা বিনাশ হানা দিয়েছে এবং আমার স্বীয় অঙ্গসমূহ একেক করে অকোজো হবার মাধ্যমে নিজের মৃত্যু দর্শন করছি। আমাকে নিয়ে এগুলো এখন ঘন্টাকালও চলতে পারে না বরং এগুলোর সচলতা প্রতিমুহূর্তে আমাকে ক্ষয়িষ্ণু বানাচ্ছে। আমার নিজের প্রয়োজন পূরণেই যৌবন অতিবাহিত হয়ে গেছে, অলসতায় আল্লাহর ইবাদত করেছি। সেসব দিবস-যামিনীর জন্য আন্তরিক আফসোস! যেগুলো অতিবাহিত করেছি শুধুই খেল-তামাশায়। আমরা সকল প্রকার পাপে নিপতিত, হে আল্লাহ দয়াময়, আমাদের পাপরাশি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মার্জনা করুন।"

তাওয়াক্কুল (التوكل)

তাওয়াক্কুল অর্থ ভরসা করা, নির্ভর করা। সকল কাজে আল্লাহ তা'য়ালার ওপর ভরসা করতে হয়। মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা ছাড়া কোন বান্দা এক মুহূর্তও অতিবাহিত করতে পারে না। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারী কখনো হতাশ হয় না, আশা ভঙ্গ হলে মুষড়ে পড়ে না। যে

---

১৫ দীওয়ানু আবু নুওয়াস, আহমদ আবদুল মজিদ গাযালী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৮।

কোন বিপদ-মুসীবত, সংকটে আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা রাখে। মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন:

وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"[১৬] কবি আবু নুয়াসের নিম্নোক্ত কবিতায় কুরআনুল কারীমের আয়াতের ভাবধারাটিই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন[১৭]:

فعلى الله توكل ** وبتقواه تمسك

من اتقي الله فذالك الذي ** سيق اليه المتجر الرابح

شمر فما في الدين اغلوطة ** ورح لما انت له رائح

"আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং তাকওয়া তথা খোদাভীতিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর;

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তার দিকে লাভজনক ব্যবসা ধাবিত হয়;

তুমি (সত্যের দিকে) দ্রুত অগ্রসর হও, কেননা আল্লাহর দ্বীনে কোন প্রকার বক্রতা নেই। আর তুমি প্রস্থান কর সে পথে, যে পথের যাত্রী তুমি।"

কবি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং তাকওয়াকে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিয়ে বলেন[১৮]:

كن مع الله يَكن لك ** واتق الله لعلَّك

لا تكن إلا مُعِدّا ** للمنايا فكأنك

إنّ للموت لسهما ** واقِعا دونكَ أو بك

فعلى الله توكل** وبتقواهُ تَمَسّك

"তুমি আল্লাহর মুখাপেক্ষী হও, তিনি তোমার হয়ে যাবেন, আর আল্লাহকে ভয় করো, আশা করি তুমি পরহেযগার হয়ে যাবে। তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী হয়ে যাও, যেন সে-ই তোমার একান্ত আপনজন। নিশ্চয়ই মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট হিস্যা রয়েছে, তোমাকে বিনে কিংবা তোমাকে নিয়ে। সুতরাং আল্লাহর উপর নির্ভর করো এবং তাকওয়া আঁকড়ে ধরো।"

---

১৬ সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ২৩।

১৭ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৮।

১৮ দীওয়ান, আহমদ আবদুল মাজিদ গাযালী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৫।

মৃত্যু (الموت)

মৃত্যু এক অনিবার্য বাস্তবতা। জাগতিক জীবনের সমাপ্তি এবং আখিরাতের প্রবেশদ্বার। জগতের কোন কিছুই মৃত্যুহীন-অবিনশ্বর নয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ "প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারী।"[১৯] কোন কৌশল অবলম্বন করে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। কবি বলেন[২০]:

الموتُ مِنّا قَريبٌ ** وَلَيسَ عَنّا بِنازِح

في كُلِّ يَومٍ نَعيٌ ** تَصيحُ مِنهُ الصَوائِح

تَشجى القُلوبُ وَتَبكي ** مُوَلوِلاتُ النَوائِح

حَتّى مَتى أَنتَ تَلهو ** في غَفلَةٍ وَتُمازِح

وَالموتُ في كُلِّ يَومٍ ** في زِندِ عَيشِكَ قادِح

فَاِعمَل لِيَومٍ عَبوسٍ ** مِن شِدَّةِ الهَوَلِ كالِ

"মৃত্যু আমাদের অতি সন্নিকটে, যা মোটেও আমাদের থেকে দূরে নয়;

মৃত্যু সংবাদ ঘোষণাকারীরা প্রতিদিন সুউচ্চকণ্ঠে এ সংবাদ ঘোষণা করছে;

শোকার্ত অন্তকরণসমূহ ব্যথা-বেদনায় ব্যথিত হচ্ছে এবং বিলাপকারীদের ঘনিষ্ঠরাও ক্রন্দন করছে;

(এর পরও) তুমি কতদিন পর্যন্ত উদাসীনতা ও খেল তামাশায় মত্ত থাকবে;

অথচ মৃত্যু প্রতিনিয়ত তোমার বিলাসী জীবনের উপর নিন্দা করে যাচ্ছে;

সুতরাং তুমি ভীষণ ভয়ংকর ও বিভীষিকাময় সেই দিনের জন্য কাজ কর।"

কবি আবু নুয়াস মৃত্যুকে নবাগত অতিথির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবি বলেন, অতিথি আসার পূর্বে যেমন আপ্যায়ন ও আতিথেয়তার জন্য পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি মৃত্যু আসার পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ প্রয়োজন। তিনি বলেন[২১]:

منتك نفسك أن تتوب غدا ** أو ما تخاف الموت دون غد

---

১৯ সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩৫।

২০ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

২১ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

الموت ضيف فاستعد له ** قبل النزول بأفضل العدد

واعمل لدار أنت جاعلها ** دار المقامة آخر الأمد

“প্রবৃত্তি তোমাকে বার বার এ বলে প্রবঞ্চিত করছে যে, তুমি আগামীকাল প্রত্যাবর্তন করবে, তাওবা করবে, তুমি কি মৃত্যুকে ভয় পাওনা আগামীকালের পূর্বে?

মৃত্যু হচ্ছে- নবাগত অতিথিস্বরূপ তুমি তার আগমনের পূর্বেই তার সর্বোত্তম আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর;

আর তুমি নেক কাজ সাধনা করে যাও এমন এক আবাসস্থলের জন্য, যেটিকে তুমি অবস্থানের নিমিত্তে নির্ধারণ করবে অনন্তকালের জন্য।”

মৃত্যু সম্পর্কে কবি আরও বলেন[২২]:

كل ناع فسينعى ** كل باك فسيبكى

كل موجود سيفنى ** كل مذكور سينسى

ليس غير الله شيء ** من علا فالله أعلى

قد كفانا الرزق ربي ** وله نسعى ونشقى

كل مستخف بشيء ** فمن الله بمرأى

لاترى شيئا على الله ** من الأشياء يخفى

“সকল বিলাপকারীর জন্য বিলাপ করা হবে এবং প্রত্যেক ক্রন্দনকারীর জন্য ক্রন্দন করা হবে (অর্থাৎ অন্যের মৃত্যুতে যে শোক প্রকাশ করছে একদিন তাকেও মরতে হবে এবং অন্যেরা তার জন্য শোক প্রকাশ করবে, তেমনি ভূমিষ্ট হবার পর সব নবজাতকই কাঁদে, আবার মৃত্যুর পর তার জন্যই ক্রন্দন করা হয়)। অস্তিত্বশীল সবকিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে, আলোচিত সবকিছুই একদা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে। আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছুই স্থায়ী নয়, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহীয়ান, তাঁর তরেই আমাদের সাধনা। আমাদের জীবিকার জন্য আমাদের রবই যথেষ্ট, তাঁর ইশারাতেই আমাদের ভাগ্যবিড়ম্বনা। সকল রহস্যাবৃত গোপনীয়তা তাঁরই নখদর্পনে। তুমি মনে করোনা যে, আল্লাহর কাছে কোন কিছু গোপন থাকছে।”

---

২২ দীওয়ান, আহমদ গাযালী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯।

কবর (القبر)

পরকালীন জীবনের প্রথম ঘাঁটি কবর। কবি আবু নুয়াস কবরকে সর্বোত্তম উপদেশ দানকারী হিসেবে অভিহিত করে বলেন[২৩]:

وعظتك اجداث صمت ** ونعتك ازمنة خفت

وتكلمت عن أوجه ** تبلي وعن صور سبت

وارتك قبرك في القبو ** روأنت حي لم تمت

الا تأتي القبور صباح يوم ** فتسمع ما تخبرك القبور

فان سكوتها حرك تنادي * كان بطون غائبها ظهور

"কবরসমূহ যেন নীরবে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছে, কাল মহাকাল চুপিসারে তোমার গুণ-কীর্তন করছে;

মহাকাল যেন বিলুপ্ত ব্যক্তিদের এবং বিলীন হয়ে যাওয়া আদর্শ সম্পর্কেও কথা বলছে;

আর তোমার জীবদ্দশায়ই তোমার কবর তোমাকে অনেক বার দেখা দেখিয়েছে;

তুমি কি প্রত্যুষে সমাধিস্থলে গমন কর না? তাহলে তুমি শুনতে যে, কবরসমূহ তোমাকে কি সংবাদ প্রদান করে;

নিশ্চয় কবরের স্থবিরতা গতিশীল। তা যেন তোমাকে এ মর্মে আহ্বান জানায় যে, তার অভ্যন্তরীণ অদৃশ্য জিনিসসমূহ যেন স্বতঃই প্রকাশ্য।"

কিয়ামত (القيامة)

কিয়ামত শব্দের অর্থ মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান। কিয়ামত হচ্ছে-যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর সর্বশেষ পরিণতি অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার নাম। মানুষ, পৃথিবী ও সৌরজগতসহ মহাবিশ্বের ধ্বংসকেই কিয়ামত বলা হয়। কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা-আতঙ্ক বড়ই কঠিন। এ দিনে সবার মাঝে অসহনীয় আতঙ্ক ও ভীতি সঞ্চারিত হবে। কবি কিয়ামতের ভয়াবহতা স্মরণ করে বলেন:

وكم من سبيل لأهل الصبا ** سلكت سبيل غواياتها

فأي دواعي الهوى عفتها ** ولم تجر في طرق لذاتها

وأي المحارم تنتهك ** واي الفضائح لم تأتها

---

২৩ দীওয়ান (১৮৯৮খ্রি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

وهذي القيامة قد أشرفت ** تريك مخاوف فزعاتها

وقد أقبلت بمواعيدها ** وأهوالها، فارع لوعاتها

وإني لفي بعض أشراطها ** وأياتها، وعلاماتها

“ভোগবাদীদের জন্য অনেক রাস্তা রয়েছে, তুমিতো ভুল পথে যাত্রা করেছ;

কুপ্রবৃত্তির কোন্ উপকরণকে তুমি অপছন্দ করেছো? এবং তা ভোগের জন্য কোন্ পথে তুমি চলনি?

কোন্ নিষিদ্ধ পন্থা তুমি অবলম্বন করনি এবং কোন্ লজ্জাকর কাজ তুমি সম্পাদন করনি?

কিয়ামত বা মহাপ্রলয় তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে; এর মর্মভেদী ভয়াবহতা তোমাকে প্রতিনিয়ত প্রদর্শন করে চলেছে;

কিয়ামত তার প্রতিশ্রুত বিষয় ও এর ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে ধেয়ে আসছে, সুতরাং তুমি এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হও,

আমি নিজেই কিয়ামতের কতক পূর্বাভাস ও নিদর্শনের আওতাভুক্ত হয়ে পড়েছি।”

বিচার দিবসের হিসাব (الحسبا بيوم الدين)

মহান আল্লাহ তায়ালা বিচার দিবসে জান্নাত লাভকারী পূণ্যবানদের উদ্দেশ্যে সালাম দেবেন এবং তাদেরকে অনন্ত নেয়ামতে সিক্ত করবেন। অপরদিকে সেদিন যারা বিদ্রোহী, সীমালঙ্ঘনকারী ও পাপাচারী বলে চিহ্নিত হবে, জাহান্নামের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আগুনেই হবে তাদের ঠাঁই। সেদিন আল্লাহর এই ফয়সালাকে চ্যালেঞ্জ করা দূরে থাক, সামান্য প্রশ্ন করার মত শক্তি, যোগ্যতা ও সাহস কারো হবে না। প্রকৃতপক্ষে এক কল্পনাতীত অসহায়ত্ব ও অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে সকলকেই সেদিন এই ফয়সালাকে মেনে নিতে হবে। তাই দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর অনুগত মানুষের জন্য অবারিত থাকবে অফুরন্ত কল্যাণ। পক্ষান্তরে আল্লাহর অবাধ্য মানুষের জন্য রয়েছে সীমাহীন দুর্ভোগ।

কবি আবু নুয়াস বিচার দিবসে হিসাব দেওয়ার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা সেদিন কেউ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে না। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপরাধী ব্যক্তির পাপ-পঙ্কের সাক্ষ্য প্রদান করবে।

কবি বলেন[২৪]:

يا نفس موردك الصراط غدا ** فتأهبي من قبل أن تردي

ما حجتي يوم الحساب إذا ** شهدت علي بما جنيت يدى

“হে নসফ! আগামীকাল তোমার প্রত্যাবর্তনস্থল পুলসিরাত, তাই তুমি এতে আরোহন করার পূর্বেই তার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর;

বিচার দিবসে আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কি যুক্তি থাকবে? যখন আমার হস্তদ্বয় কৃত অপরাধ সম্পর্কে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে।”

কবি আবু নুয়াস বিচার দিবসের বাস্তবতা সম্পর্কে বলেন[২৫]:

باية حجة احتج يوم الحساب ** إذا دعيت إلى الحساب

هما امران فوز ام شقاء ** ألاقي حين انظر في كتابي

فاما أن اخلد في نعيم ** وأما أن اخلد في عذاب

“কোন যুক্তি প্রমাণ নিয়ে আমি বিচার দিবসে আত্মপক্ষ সমর্থন করব? যখন আমাকে হিসাব নিকাশের জন্য আহ্বান করা হবে;

যখন আমি আমার আমলনামা দেখবো, তখন হয়তোবা আমি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত হবো অথবা হতভাগাদের অন্তর্ভূক্ত;

সে সময় হয়তোবা আমি স্থায়ী সুখ-শান্তির নীড় জান্নাতে অবস্থান করবো অথবা চির যন্ত্রণাময় নরকাগ্নিতে অবস্থান করবো।”

মুনাজাত (مناجاة)

কবি আবু নুয়াস জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে অতীত জীবনের অনুচোনায় মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অনুতপ্ত কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করেন:

إلهى لست للفردوس اهلا ** ولا وأقوى علي النار الجحيم

فهب لي توبة واغفر ذنوبي ** فإنك غافر الذنب العظيم

وعاملني معاملة الكريم ** وثبتنى علي النهج القويم

ذنوبي مثل أعداد الرمال ** فهب لي توبة يا ذا الجلال

وعمري ناقص في كل يوم ** وذنبي كيف احتمالي

الهي عبدك العاصي اتاك * * مقرا بالذنوب وقد دعاك

---

২৪ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

২৫ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

فان تغفرلي وأنت لذاك أهل ** وإن تطرد فمن نرجو سواك

“হে আমার প্রভু! আমি তো জান্নাতুল ফিরদাউসের যোগ্য নই, অপরদিকে জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন সহ্য করার ক্ষমতাও রাখিনা;

সুতরাং আমাকে তাওবা করার সৌভাগ্য দান কর, তুমি যে মহাপাপ মোচনকারী;

আমার প্রতি সদয় হও এবং আমাকে সরল-সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখো;

ওহে মহামান্বিত! বালুকা রাশির ন্যায় অগণিত আমার পাপ, সুতরাং হে মহামহিম, আমাকে তাওবা করার সুযোগ দাও।

আমার জীবনতো প্রতিনিয়ত ক্ষয়িষ্ণু, অথচ আমার পাপ ক্রমবর্ধিষ্ণু, এই পাপ আমি কীরূপে বহন করব?

ওহে প্রভু! তোমার পাপী বান্দা পাপ স্বীকার করতঃ তোমারই দরবারে আগমন করেছে এবং তোমাকেই ডাকছে;

সুতরাং তুমি যদি ক্ষমা কর, তবে তুমিইতো ক্ষমার অধিকারী; আর তুমি যদি প্রত্যাখ্যান কর, তবে তোমাকে ছাড়া আমরা আর কার কাছে আশাবাদী হব?”

ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রত্যাশা (رجاء العفو)

কবি আবু নুয়াস স্বীয় অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রত্যাশ্যা ব্যক্ত করে বলেন:[২৬]

يا ربِّ إنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً ** فلقد عَلِمْتُ بِأَنَّ عفوك أَعْظَمُ

إِنْ كَانَ لاَ يَرْجُوكَ إِلاَّ مُحْسِنٌ ** فَمَن الذي يَدْعُو ويَرْجُو المجرم

أَدْعُوكَ رَبِّ كما أمرت تَضَرُّعاً ** فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي فمن ذا يَرْحَمُ

مَالِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ إِلاّالرَّجَا ** وَجَمِيلُ عَفْوِكَ ثُمَّ إِنِّي مُسْلِمُ

“হে আমার প্রভু! যদিও আমার অপরাধ গুরুতর হয়েছে, তবুও আমার জানা আছে যে, নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমা সর্বাপেক্ষা মহান;

যদি মুহসিন তথা সৎকর্মশীল ব্যক্তি ব্যতীত কেউ আপনার সমীপে ক্ষমার প্রত্যাশা না করে তবে অপরাধী বান্দারা কার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।”

হে আমার রব! আমি আপনার কাছে এমন বিনীত প্রার্থনা করছি, যেভাবে আপনি আমাকে আদেশ করেছেন। অতএব, আপনি যদি আমার হস্তদ্বয় ফিরিয়ে দেন তাহলে কে আমার প্রতি রহম করবে?

আপনার দরবারে ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রত্যাশা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। সর্বোপরি আমি একজন আত্মসমপর্ণকারী (মুসলমান)।”

---

[২৬] দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০৩।

অন্যত্র তিনি বলেন[২৭]:

رحم الله مسلما ** ذكر الله فازدجر

رحم الله مسلما ** سمع الوعظ فانتهر

رحم الله مسلما ** خاف واستشعر الحذر

"হে আল্লাহ! ঐ মুসলিমের প্রতি অনুগ্রহ করুন, যে আল্লাহকে স্মরণ করে অত:পর নিজেকে সংযত করে। হে আল্লাহ! দয়া করুন ঐ মুসলিমের প্রতি যে ওয়াজ-নসিহত শুনে, আর নিজেকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করে। হে প্রভু! ঐ মুসলিমের প্রতি কৃপা করুন, যে আপনার স্মরণে ভীত হয় এবং শঙ্কা অনুভব করে।"

পরিশেষে বলা যায় যে, কবি আবু নুয়াস যদিও অশ্লীলতার গড্ডালিকা প্রবাহে বুঁদ হয়ে ছিলেন। তিনি মদ্যপান, ভোগ-বিলাসিতা ও অশ্লীল কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু কবি জীবন সায়াহ্নে এসে এক নবদিগন্তের উন্মোচন করেন। এসময় তিনি ভুল বুঝতে পেরে অতীতের প্রায়শ্চিত্বের নিমিত্তে সানুনয় অনুশোচনা করে মহান স্রষ্টার সুমহান দরবারে পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এসময় তিনি বহু 'যুহদিয়াত' কবিতা রচনা করেন। আবু নুয়াসের কবিতায় যুহদিয়াত বিষয়টি মূলত: তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের মদ্যপান, নারীমোহ ও বিলাসী কর্মকান্ডের একটি বিরাট কালপর্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা হয়ে আসে। জাগতিক উপভোগ এবং আধ্যাত্মিক আকর্ষণ মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হতে আবূ নুয়াস মুক্ত ছিলেন না। তবে জীবনের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যখন পার্থিব জীবন সম্পর্কে কবির মোহমুক্তি ঘটে তখন পরকাল যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে তিনি 'যুহদ' কবিতা রচনা করেন। জীবনের শেষপ্রান্তে কবির আখেরাতের প্রতি গভীর উপলব্ধি আর পরকালীন কঠিন পরিস্থিতি তাকে ভীত করে তোলে, বাস্তব জীবনের এই অবস্থা থেকে কবি মৃত্যু, পরকাল, কিয়ামত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেন। 'যুহদ' রচনায় আবু নুয়াস কেবল শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হন নি বরং কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব রূপায়ন এবং হৃদয়ের গভীর অনুভূতি চিত্রায়নেও তিনি স্বীয় পারঙ্গমতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

---

[২৭] দীওয়ানু আবু নুওয়াস, আহমদ আবদুল মজিদ গাযালী সম্পাদি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৩।

সপ্তম অধ্যায়

কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতার তুলনামূলক আলোচনা

আব্বাসীয় যুগে আরবী কবিতার বিভিন্ন শাখায় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। কবিতার আঙ্গিকের পাশাপাশি এর শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক নতুনত্ব পরিদৃষ্ট হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে যুহদিয়াত ও দার্শনিক কবিতা (شعرالفلسفة)[১] অন্যতম। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিভাব প্রকাশ করে এ যুগের বিখ্যাত কবিগণ কবিতা রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। আব্বাসীয় যুগের বিখ্যাত কবিগণ হলেন: আবুল আতাহিয়া (১৩০-২১১হি./৭৪৭-৮২৬খ্রি.), আবু নুয়াস (১৪৫-১৯৯হি./৭৬৩-৮১৩খ্রি.), বাশ্‌শার ইবন বুরদ (৯৬-১৬৮হি./৭১৪-৭৮৪খ্রি.), আবু তাম্মাম (১৮৮-২৩১হি./৮০৪-৮৪৫-৪৬খ্রি.), ইবনুর রুমী (৮৩৬-৮৯৮খ্রি.), আবুল আলা আল-মা'আররী (৯৭৩-১০৫৭খ্রি.) প্রমুখ। তাঁদের কবিতায় যুহদিয়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর বিবেচনায় যেসব বিষয়ের অবতারণা ঘটেছে সেগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটে উঠলেও মূলভাব ছিল অভিন্ন। নিম্নে কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো।

আবুল আতাহিয়ার যুহদ কবিতার বিষয়বস্তু

ধর্মনিষ্ঠা, মৃত্যু, অল্পেতুষ্টি ও কালের কুটিল গতি-প্রকৃতি এ সমস্ত বিষয় নিয়েই আবুল আতাহিয়া অধিক কবিতা রচনা করেছেন।[২] ধর্মতাত্ত্বিক এসব কবিতার মাধ্যমে তিনি

---

১ আব্বাসীয় যুগে যেসব বিষয়ের জয়জয়কার অবস্থা ছিল তার মধ্যে দর্শনশাস্ত্র অন্যতম। এজন্য আব্বাসীয় আমলের কবিতায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়। এ সময়কার দার্শনিক মনোভাবের কবিদের অন্যতম ছিলেন-ইবনুর রুমী, আবুল 'আলা মা'আররী, মুসলিম ইবন আবদুল ওয়ালিদ, ইবনুল মুতায অন্যতম। (দ্র. হান্না আল-ফাখুরী, তারিখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুত: ১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ৩৫৮; মাহমুদ সামী আল-বারূদী, আল-মুখতারাত, খ.১, (তা.বি.), পৃ. ১৭)

২ সাইয়্যেদ আহমদ হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদব ওয়া ইনশাউ লুগাতুল আরব (বৈরুত: মু'আসসাতুল মা'আরিফ: তা.বি.), স. ১, পৃ. ১৭২।

জাতিকে বার্তা পাঠিয়েছেন – শুদ্ধতা, সততা, তাকওয়া ও সৎকর্মই গৌরবের বিষয়; বংশ গরিমা, আভিজাত্য, উচ্চ পদস্থ কর্মজীবন শ্রেষ্ঠত্বের কোন বিষয় নয়। দুনিয়াই চিরন্তন ও শেষ ঠিকানা নয়; অনিবার্য মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আখিরাতে পদার্পন করতে হবে। আর জবাবদিহিতার কঠিনতম স্থান এই আখিরাত। সেখানে যে ব্যক্তি মুক্তি অর্জন করবে সে-ই সফল। এই সফলতার স্বাদ অনিঃশেষ কাল ধরে ভোগ করতে থাকবে। আর এ জন্য প্রয়োজন অল্পে তুষ্টি, সৎ জীবন-যাপন, ধৈর্য ও সহনশীলতা, তাওবা ও ইস্তিগফার সর্বোপরি মহান স্রষ্টার নির্দেশ ও মহানবী (স.)-এর পদাংক অনুসরণ। এভাবেই তাঁর কবিতা মরমীবাদের পথিকৃৎ হয়ে উঠে। যুহদিয়াত কবিতার প্রবর্তক (Pioneer) কবি আবুল আতাহিয়ার যুহদিয়াত কবিতায় যেসব বিষয় ফুটে উঠে তা হলো- আল্লাহর প্রশংসা, এই দুনিয়া নশ্বর, প্রতারক, লোভাতুর, ক্ষণস্থায়ী, জীবন-মৃত্যু রহস্য, মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য, মৃত্যু সন্নিকটবর্তী, যুগের বিবর্তন, কবর, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি বিষয়।

আবুল আতাহিয়ার যুহদ কবিতার বৈশিষ্ট্য

১. স্বভাবজাত যুহদ কবি আবুল আতাহিয়ার কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-সহজ-সরল ভাষা ও অবাধগামী ছন্দ।[৩] আরবী কাব্য সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কবি যিনি প্রমাণ করেছেন যে, কাব্যের সৌন্দর্য কাব্যের সৌন্দর্যহানি না করেও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।[৪]

২. আবুল আতাহিয়ার কাব্যে ছন্দের অন্ত্যে বা অভ্যন্তরে কখনো তিনি দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেননি।[৫]

৩. মরু কাব্যের বাগাড়ম্বরকে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলতেন। কারণ, তা অবাস্তব কৃত্রিমতায় পর্যবসিত ছিল।[৬]

৪. আবুল আতাহিয়ার কবিতার ভাষা ও বিষয়বস্তু কৃত্রিমতামুক্ত ছিল। এ কারণেই তার যুহদ কাব্য সার্বজনীন হিসেবে পরিগণিত হয়।

---

৩ ড. উমর ফাররুখ, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, তা.বি.), স.৫, পৃ. ১৯; আনিস আল-মাকদিসী, উমারাউ শি'রিল আরাবী ফিল আসরিল আব্বাসী (বৈরুত: দারুল ইলম লিল-মালাঈন, ১৯৭৯খ্রি.), সং. ১২, পৃ. ১৬৭; ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৪ R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, ibid, p. 299

৫ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৬ প্রাগুক্ত।

৫. কবি আবুল আল-'আলা মা'আরীর মতে, আবুল আতাহিয়া সর্বপ্রথম মুদারি' (مضارع) ছন্দ আবিষ্কার করেন। আটটি দীর্ঘ শব্দাংশ বিশিষ্ট একটি ছন্দও তিনি কবিতায় ব্যবহার করেছেন।[৭]

৬. কবি আবুল আতাহিয়া মুযদাবিজ (مزدوج) অর্থাৎ দুই শ্লোকে অন্ত্যমিল পদ্য রচনা করেছিলেন।

৭. সমালোচকদের মতে, আবুল আতাহিয়ার যৌবনকাল গভীর বিষাদ ও নৈরাশ্যপূর্ণ দুর্বিপাকে পরিপূর্ণ। মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা, মানব জীবনের অসহায়ত্ব ও পার্থিব জীবনের মিথ্যা গৌরব এবং তা বর্জনের আবশ্যকতা ইত্যাদির পুনঃ পুনঃ আলোচনা।[৮]

৮. আবুল আতাহিয়া যুহদ কবিতা উপস্থাপনে পূববর্তীদের মতো উপদেশমূলক রীতি অবলম্বন করেননি। যেহেতু কবি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের জয়জয়কার-যুগের সন্ত ান, সেহেতু বিষয়বস্তু উপস্থাপনে তিনি জীবন-অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও প্রামাণিকতার আশ্রয় নিয়ে তা পেশ করার প্রয়াস পান।[৯]

৯. কবি আবুল আতাহিয়ার উপদেশ বাণী ছিল প্রামাণিক, দৃষ্টিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান নির্ভর। যেমন কবির ভাষায়:

وأراك تلتمس الغنى لتناله ** وإذا قنعت فقد بلغت غناك

"আমি দেখেছি তুমি স্বাচ্ছন্দ্যকে খুঁজছো, বাস্তবে তুমি যখন কানাআত বা অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করবে তখনই তুমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নাগাল পাবে।"[১০]

১০. কবি আবুল আতাহিয়ার কবিতা শিক্ষামূলক হলেও রস-কষহীন নয়; উপরন্ত সুরেলা, সমৃদ্ধ ধর্মীয় রসাশ্রিত এক নতুনধারা। যা তিনি দার্শনিকায়ন করে সহজ-সরল কাঠামোর উপর স্থাপন করেছেন।[১১]

---

৭ প্রাগুক্ত।

৮ R.A. Nicholson, ibid, p. 298

৯ হান্না আল-ফাখুরী, আল-জামি' ফিল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখিহী (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯১খ্রি.), ২য় সং, খ. ১, পৃ. ৮১৭-৮১৮।

১০ দীওয়ানু আবুল আতাহিয়া, মাজীদ তারাদ সম্পা., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭।

১১ ড. ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাচীন আরবী কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩।

সমকালীন যুহদ কবিদের মাঝে আবুল আতাহিয়ার স্থান নিরূপণ

আবুল আতাহিয়াকে আরবী সাহিত্যের প্রথম দার্শনিক কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তাঁর কবিতা দার্শনিক ভাবাপন্ন হওয়ার পাশাপাশি এতে যে ধর্মনিষ্ঠা ও ইসলামী ভাবাবেগের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, যা প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মানুষকে আকৃষ্ট করে।[১২] আবুল আতাহিয়া তাঁর অনন্য সাধারণ কাব্য প্রতিভা যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে এমন এক স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন যা তাঁর জন্যই সংরক্ষিত ছিল। সহজ-সরল-স্বাভাবিক লিখন ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে গভীর চিন্তাশক্তি তাঁকে এ স্থানে সমাসীন করে। ফারসী সাহিত্যে যুহদ কবিতায় শায়খ সা'দীর যে স্থান আরবী সাহিত্যে আবুল আতাহিয়ার সেই স্থান। তাঁর সমসাময়িক আরব কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আবু নুয়াস। ভনক্রেমারের মতে, আবুল আতাহিয়ার কাব্য-প্রতিভা আবু নুয়াস অপেক্ষা অধিকতর ছিল।[১৩]

আধুনিক যুগের জনৈক কাব্য সংকলক বলেন : "কাব্যের অন্তর্নিহিত মনোরঞ্জন প্রজ্ঞা ও চিত্তবিনোদন শক্তি উপলব্ধি করে আমি কয়েকটি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে মনস্থির করি। এ জন্য আমি অনেকগুলো দিওয়ান অধ্যয়ন করি। কিন্তু পবিত্র ভাবধারা, মার্জিত রুচি, সরল ভাষা ও মধুর ছন্দের দিক দিয়ে আবুল আতাহিয়ার দীওয়ানই আমার নিকট শ্রেষ্ঠতম মনে হয়েছে।"[১৪]

সমকালীন কবিগণ আবুল আতাহিয়া সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁদের মূল্যায়নে সমকালীন কবিদের মাঝে তাঁর স্থান নির্ধারণ করা যায়।

হারুন ইবন সাদান বলেন: "একদা আমি প্রখ্যাত কবি আবু নুয়াসের সঙ্গে কবিতা আবৃত্তির একটি আসরে উপস্থিত ছিলাম। তিনি (আবু নুয়াস) সে আসরে কবিতা আবৃত্তি করলেন। এ আসরে উপস্থিত জনৈক শ্রোতা তাঁকে প্রশ্ন করলো, আপনি কি সবচেয়ে বড় কবি? তিনি বললেন, বৃদ্ধ আবুল আতাহিয়ার জীবদ্দশায় আমি বড় কবি নই।"

---

১২ ড. শাওক্বী দায়ফ, আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবহু ফিশ শি'রিল আরাবী (কায়রো: মাকতাবাতু খানজী, ১৯৩১খ্রি.), স. ১, পৃ. ১৫২।

১৩ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান (বৈরুত: দারু বৈরুত, ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.), ভূমিকা, পৃ. ৩

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

আবু নুয়াস তাঁকে অনেক সম্মান করতেন এবং বলতেন:

والله ما رأيته قط إلا ظننت أنه سماء وأنا أرض

"আল্লাহর কসম ! আমি যখন তাঁকে দেখি, আমার মনে হয় তিনি আকাশ আর আমি জমিন।"[১৫]

আব্বাসীয় মন্ত্রী জাফর ইবন ইয়াহইয়া ও প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ ফাররা বলেন, "সমকালীন কবিদের মধ্যে তিনি (আবুল আতাহিয়া) সবচেয়ে বড় কবি।" স্বনামধন্য কবি দাউদ ইবন রাযীনকে জিজ্ঞেস করা হলো, এই সময়ের বড় কবি কে? তিনি বললেন, আবু নুয়াস। অতঃপর তাকে বলা হল, আবুল আতাহিয়া সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন, 'আবুল আতাহিয়া জ্বিন ও ইনসানের মধ্যে বড় কবি।"[১৬]

মুসা ইবনে সালেহ বলেন, আবুল আতাহিয়ার সমসাময়িক কবি سلم الخاسر-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বললাম, তাঁর নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে। তিনি বলেন, "তা নয় বরং আজ তোমাকে জ্বিন ও মানুষের বড় কবির কবিতা শোনাব।" অন্য এক বর্ণনা মতে রোজা ইবন মাসলামা বলেন, আমি سلم الخاسر -এর নিকট সবচেয়ে বড় কবির কবিতা শুনতে চাইলে তিনি বললেন, "আমি তোমাকে জ্বিন-ইনসানের মধ্যে বড় কবির কবিতা শোনাব।" অতঃপর তিনি আবুল আতাহিয়ার নিম্নোক্ত কবিতা শুনালেন :[১৭]

سَكَنٌ يَبقى لَهُ سَكَنُ ** ما هَذا يُؤذِنُ الزَمَنُ

نَحنُ في دارٍ يُخَبِّرُنا ** عَن بِلاها ناطِقٌ لَسِنُ

আহমাদ ইবনে যুহাইর বলেন, "আমি মুসআব ইবন আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি 'আবুল আতাহিয়া হলেন কবি গুরু, আমি বললাম কী জন্য তিনি আপনার নিকট এমন মর্যাদার অধিকারী হলেন? তিনি বললেন, কবির এ কবিতার জন্য : [১৮]

تعلقت بالمال ** طوال أي امال

واقبلت على الدنيا ** ملحا أيّ اقبال

মুসআব বললেন, "এগুলো সঠিক, সহজবোধ্য বাক্য। এতে বাড়তি-কমতি কিছুই নেই। বুদ্ধিমান তা জানে এবং অজ্ঞও তার স্বীকৃতি দেয়।"

---

১৫ আবুল আতহিয়া, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৬ আবুল আতহিয়া প্রাগুক্ত, পৃ.৭; আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১৭ আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

১৮ প্রাগুক্ত, ১০

ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ আসমাঈ বলেন[১৯]-

شعر أبي العتاهية كساحة الملوك يقع فيها الجوهر، والذهب، والتراب، والخزف، والنوى

"আবুল আতাহিয়ার কবিতা হচ্ছে-শাসকগোষ্ঠীর উন্মুক্ত দরবারের ন্যায়, যাতে মুনিমুক্তা, সোনা, মাটি, মৃৎপাত্র, শস্যদানা সবকিছুই সমর্পিত হয়।"

আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতার বিষয়বস্তু

কবি আবু নুয়াসের পাপাচারী কবি হিসেবে পরিচিতি রয়েছে। তাঁর কাব্যালোচনা এলেই সঙ্গতকারণে অশ্লীলতার আলোচনা এসে যায়। কবি প্রাথমিক জীবনে আরবী কবিতার অন্যতম উপাদান যথা মাদ্হ (স্তুতিমূলক কবিতা), খামরিয়্যাহ (মদ্যপান), غزل المذكر (সুদর্শন বালকদের প্রতি প্রণয়) ও غزل المؤنث (নারীদের প্রতি প্রণয়) ইত্যাদি কবিতা রচনা করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন হয়েছিলেন। তেমনি শেষ বয়সে এসে ইসলামী ভাবধারামূলক কবিতা যুহদিয়াত রচনা করে সমকালীনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর এসব কবিতার ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু তাঁকে একজন ঈমানদার, মুত্তাকি ও আল্লাহপ্রেমিক হিসেবে প্রমাণিত করে। যুহদিয়াত রচনায় তাঁর সৃজনশীল ব্যঞ্জনা, বর্ণনার সাবলীল ভঙ্গিমা ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্ট্য তাঁকে অন্যদের চেয়ে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। কবির ইসলামী ভাবাবেগে পূর্ণ ২৬৫টি পংক্তি বিশিষ্ট কবিতা তাঁর দিওয়ানের ষষ্ঠ অধ্যায়ে في الزهد শিরোনামে সন্নিবেশিত হয়েছে।[২০]

কবি আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতার বিষয়াবলী হলো- অতীত জীবনের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা, মহান আল্লাহর প্রতি অনুরাগ, আল্লাহ ভীতি, দুনিয়া অন্বেষণকারীদের পরিণাম, ভ্রান্তিময় ও প্রতারণাপূর্ণ দুনিয়া, মৃত্যু ও উহার স্বভাব, অপরাধের সাবলীল স্বীকৃতি, আখিরাতের সুখ-শান্তি, তাওবা, কানা'আত তথা অল্পেতুষ্টির সুফল, সর্বোপরি আল্লাহর কাছে এক নগন্য গুনাহগার বান্দার আকুতি প্রভৃতি বিষয় কাব্যিক শিল্পকলায় তিনি উপস্থাপন করেছেন।[২১]

---

১৯ দীওয়ানু আবুল আতাহিয়া, গারীদ আশ-শায়খ সম্পাদ (বৈরুত: মুআসসাতু আল-আ'লামী, ১৯৯৯খ্রি.), ভূমিকা, পৃ. ৬; আনিস আল-মাকদিসী, উমারাউ শি'রিল আরাবী ফিল আসরিল আব্বাসী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২৪-২৫।

২০ আবু নুয়াস, দীওয়ান (মিসর: আল-মাতবা'আতুল উমুমিয়্যাহ, ১৮৯৮খ্রি.), ১ম সং, পৃ. ১৯২-২০৫।

২১ ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধূরী, প্রাচীন আরবি কবিতা, ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০২।

কবি আবু নুয়াসের কবিতার বৈশিষ্ট্য

কবি আবু নুয়াসের ২৬৫টি পংক্তিবিশিষ্ট কবিতামালা তাঁর দিওয়ানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 'যুহদ' শিরোনামে সন্নিবেশিত হয়েছে। কবির যুহদিয়াত কবিতায় অতীত কৃতকর্মের অনুশোচনা, আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুরাগ, প্রবঞ্চনাপূর্ণ দুনিয়া, আখিরাতের সুখশান্তি, সর্বোপরি আল্লাহর সমীপে এক নগন্য গুনাহগার বান্দার আকুতি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। কবির যুহদিয়াত কবিতায় বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১। সহজ, সরল ও সাবলীল শব্দ ব্যবহার আবু নুয়াসের যুহদিয়াত বিষয়ক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুর্বোধ্য ও শাব্দিক জটিলতামুক্ত হওয়ায় সহজেই কবিতার ভাব উপলব্ধি করতে পারা যায়।

২। সমসাময়িক কথ্য ভাষার বাক-পদ্ধতি মাঝে মধ্যে ব্যবহার করলেও আবু নুয়াসের ভাষা ছিল মোটামোটি বিশুদ্ধ ও নির্ভুল।[২২]

২। 'যুহদ' রচনায় আবু নুয়াস কেবল শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ক্ষান্ত হন নি, বরং কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব রূপায়ন এবং হৃদয়ের গভীর অনুভূতি চিত্রায়নেও তিনি স্বীয় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

৩। কবি তাঁর কবিতায় ইলমুল বালাগাহ (অলংকারশাস্ত্র) ও ইলমুল আরুদ (ছন্দশাস্ত্র)-এর নিয়ম-কানুন পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ করেছেন।

৪। আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতার ছন্দ, ধ্বনি, আঙ্গিক বিচারমাত্রা, গীতিময়তা, সুর ও ঝংকার প্রভৃতি সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে।

৫। কবির যুহদিয়াত কবিতার প্রতিটি চরণেই যেন কুরআন ও হাদিসের মর্মবাণী প্রকাশ পেয়েছে।

৬। ভাবের অতিরঞ্জন, কল্পনাবিলাস এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আবু নুয়াস কখনো কবিতা রচনা করেননি। তাঁর যুহদিয়াত কবিতায়ও এ নীতি থেকে তিনি বিচ্যুত হননি।

৭। বিরাগমূলক কবিতা বা দোষপ্রকাশ মূলক কবিতা এবং কু-প্রবৃত্তি ত্যাগমূলক (Ascalic poem) রচনা।

---

২২ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

সমকালীন কবিদের মাঝে আবু নুয়াসের স্থান

আরবী সাহিত্যের আধুনিক সমালোচকগণ আবু নুয়াসকে আধুনিক আরবী কবিদের ভাবধারার (মুহদা'ছুন) প্রতিনিধি মনে করেন। তিনি আব্বাসী যুগের কবিদের অন্যতম রাহবার।[২৩] কবি বাশ্শার ইবনে বুরদের পর আবু নুয়াসই ক্লাসিকোত্তর কবিদের পথিকৃত। একজন স্বভাব কবি হিসেবে কবিতার প্রতটি শাখায় তিনি সদর্প বিচরণ করেছেন। একজন ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে ইমরুল কায়েসের যে অবস্থান ক্লাসিকোত্তর জগতে আবু নুয়াস সেই স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। পার্থক্য হল-ইমরুল কায়স প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার জন্য ক্রন্দন করেছেন আবু নুয়াস জরাজীর্ণ মদ্যশালার জন্য অশ্রু প্রবাহিত করেছেন।[২৪]

আরবী কাব্য সমালোচক জাহিয বলেন[২৫]:

ما رأيت رجلا اعلم من أبي نواس ولا أقصى لهجة، مع مجانبه الاستكراه

"চতুর্দিকে অসচ্ছ পরিবেশ, ঘৃণিত আবহাওয়া সত্ত্বেও আমি আবু নুয়াসের চেয়েও অধিকজ্ঞানী বিশুদ্ধভাষী কাউকে দেখিনি।"

আহমদ হাসান যায়্যাত বলেন[২৬]:

وكان ابو نواس مشهورا بالتنقيح

"মন্দ বস্তু থেকে ভালোকে আলাদা করার কাজে আবু নুয়াস ছিলেন অধিক প্রসিদ্ধ।

আহমদ হাসান যাইয়্যাত আরো বলেন[২৭]-"ভাষার লালিত্যে, চরণের চয়নে, ভাবের মাধুর্য্যে অধ্যায় রচনায় অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে আবু নুয়াস প্রাধান্য লাভ করেন। এমনকি হাসান বসরী (র) ও হাসান ইবনু সিরিন যখন তাঁর কবিতা শুনতেন তখন সময় নিয়ে অপেক্ষা করে তা শুনতেন। তিনি বাশ্শারের অনুসরণ করে তার উর্ধ্বে চলে যান।"

---

২৩ ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন), খ.২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

২৪ জর্জ 'আবদু মা'নুক, আবু নুয়াস ফী শি'রিহিল খামরী (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-লুবনানী, ১৯৮১খ্রি.), পৃ. ৪৩; ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাচীন আরবী কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮-৮৯।

২৫ জুরজী যায়দান, তারীখ, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

২৬ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।

কবি আবু নুয়াস সমসাময়িক কবিদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। ভাষার লালিত্যে, শব্দ চয়নে, ভাব ও মাধুর্য্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। ইবনুস শান্ত বলেন[২৮]:

اذا رأيت من أشعار الجاهلين فلامرئى القيس والاعشي، ومن الاسلامين فلجرير والفرزدق، ومن المحدثين فلابى نواس، فحسبك

"আমি জাহেলী যুগের কবিদের মাঝে ইমরুউল কায়স এবং আ'শাকে ইসলামী যুগের কবিদের মধ্যে জারির ও ফারাযদাককে এবং পরবর্তী যুগের কবিদের মাঝে আবু নুয়াসকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করি।"

মা'মার বিন মাছনা বলেন[২৯]:

كان أبو نواس للمحدثين كامرئى القيس للمتقدمين

প্রাচীনদের জন্যে ইমরুউল কায়স যা-আধুনিকদের জন্য আবু নুয়াসও সেই পর্যায়ের।

উবাদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বলেন:[৩০] "যে ব্যক্তি আরবী সাহিত্য সম্পর্কে পড়াশুনা করলো অথচ আবু নুয়াসের কবিতা পড়েনি তাহলে সে আরবী সাহিত্য সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জানলো। আর ইয়ামানের প্রসিদ্ধ কবি তিনজনই তারা হলেন-ইমরুল কায়স, হাস্‌সান বিন সাবিত এবং আবু নুয়াস।"

আবু আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের কবিতার সাদৃশ্য

কবি আবুল আতাহিয়া ও কবি আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতা পর্যালোচনা করলে কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবুল আতাহিয়া প্রাচীন নিয়ম-কানুনের বন্ধনমুক্ত হয়ে যুহদিয়াত কবিতা রচনা করেছেন। তিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কবিদের পদ্ধতির অনুসরণ কম করেছেন।[৩১] কবি আবুল আতাহিয়া অকৃত্রিমভাবে নিজ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর কবিতায় কৃত্রিমতার ছাপ খুবই কম দৃষ্টিগোচর হয়। পক্ষান্তরে কবি আবু নুয়াস অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। তিনি তাঁর কবিতায় বহুল প্রচলিত সহজ শব্দ ব্যবহার করেছেন; যেন পাঠক খুব সহজেই তাঁর কবিতার মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। ছন্দের চাহিদায় তিনি দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেননি।[৩২]

---

২৮ জি.এম. মেহেরুল্লাহ, আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য (ঢাকা: দারুল সালাম বাংলাদেশ, ২০১৪খ্রি.), সং.২, পৃ. ৮৩।

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৩০ কাযী মুনীর, আবু নুয়াস ওয়া তা'জরিবাতুহুশ শি'রিয়্যা (বাগদাদ: দার নাহদাহ, ১৯৭৭খ্রি.), পৃ. ৩০-৩২।

৩১ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩; ব্রুক্যালম্যান, তারীখুল আদাবিল আরাবী, খ.২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৩২ ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের যুহদ কবিতার বিষয়বস্তুর ধারা

পৃথিবী ধ্বংসশীল/নশ্বর

নশ্বর এ জগত সম্পর্কে উভয় কবির দৃষ্টিভঙ্গি স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। তাঁদের উভয়ের মতে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী স্থায়ী বসবাসের জন্য নয়। এখানে পূর্ণ শান্তি ও স্বচ্ছলতা পাওয়া যায় না। কবি আবুল আতাহিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন-

اف للدنيا فليست هي بدار ** إنما الراحة في دار القرار

أين الساعات ألا سرعة ** في بلي جسمي بليل ونهار

إنما الدنيا غرور كلها ** مثل لمع اللآل في الارض القفار

يا عباد الله كل زائل ** نحن نصب للمقادير الجوار

আক্ষেপ এই নশ্বর পৃথিবীর জন্য, এটি বাসগৃহের অযোগ্য, অবিনশ্বর আখিরাতই হলো শান্তিময় বাসস্থান। ঘড়ি-ঘন্টাতো শুধুই দ্রুত ধাবমান, দিবা-রাত্রি আমার দেহটাকে জীর্ণ-শীর্ণ করে চলেছে।

এ সম্পর্কে কবি আবু নুয়াস বলেন-

اري كل حى ها لكا وابن هالك ** وذاحسب في العالمين عريق

فقلل لقريب الدار انك ظاعن ** إلى منزل نائي المحل سحيق

“নিশ্চয়ই এ ধরণী শুধুই প্রবঞ্চনা, শূণ্য মরুর মরিচীকার ন্যায়, হে আল্লাহর বান্দারা, এসবই ধ্বংসশীল। আমরতো নির্দিষ্ট পরিমাণই আহরণ করবো। আমি পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণীকে এবং ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে ধ্বংসশীল ও ধ্বংসশীলদের সন্তান হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে বলে দাও, তুমি প্রস্থানকারী ও ক্ষণস্থায়ী। আর তুমি তো পথচারীর ন্যায় এমন একটি আবাসস্থলের দিকে প্রস্থানকারী যার অবস্থান বহু বহুদূরে।

উপরোক্ত আলোচনায় কবি আবুল আতাহিয়া উপমার মাধ্যমে পৃথিবীর ধ্বংসশীলতা প্রমাণ করেছেন। অপরদিকে কবি আবু নুয়াস সহজ ও সরল বাক্যের মাধ্যমে নশ্বর এ পৃথিবীর চরিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁরা উভয়ে কবিতার মাধ্যমে ধ্বংসশীল পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

পৃথিবী অস্থায়ী নিবাস

পৃথিবী স্বল্পকালীন জীবনের নিকেতন; যা প্রতিনিয়ত মানুষের সাথে তামাশা করে চলেছে। এটি সবসময় মানুষকে ধোঁকায় ফেলে। এ সম্পর্কে কবি আবুল আতাহিয়া বলেন-

أَلا نَحنُ في دارٍ قَليلٍ بَقائُها
سَريعٍ تَدانيها وَشيكٍ فَنائُها
تَزَوَّد مِنَ الدُنيا التُقى وَالنُهى فَقَد
تَنَكَّرَتِ الدُنيا وَحانَ انقِضاؤُها
غَداً تَخرَبُ الدُنيا وَيَذهَبُ أَهلُها
جَميعاً وَتُطوى أَرضُها وَسَماؤُها
تَرَقَّ مِنَ الدُنيا إِلى أَيِّ غايَةٍ
سَمَوتَ إِلَيها فَالمَنايا وَراؤُها

হায়, আমরা তো এমন এক গৃহের বাসিন্দা, যা ক্ষণস্থায়ী;
যা তার ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবমান।
এই ধরণী থেকে পাথেয় সঞ্চয় কর, কারণ এর ধ্বংস ও লয়ের সময় ঘনীভূত।
আগামীকালই এটি এবং এর অধিবাসীরা সবাই নিঃশেষ হয়ে যাবে;
আর নভোমণ্ডল ভূমণ্ডল সবই গুটিয়ে যাবে।
আত্মরক্ষার্থে তুমি এই ভবের মায়া ছেড়ে যে গন্তব্যেই যাওনা কেন,
যদি আকাশেও যাও, তবু মৃত্যু অবশ্যি পিছু নেবে।

উপরোক্ত কবিতায় কবি দুনিয়াকে ক্ষণিকালয় হিসেবে উল্লেখ করে চিরস্থায়ী আবাসের জন্য অতি শীঘ্রই পাথেয় অর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা, মানুষ জানেনা যে, তার আয়ুষ্কাল কতদিন হবে। প্রত্যেকের মৃত্যুই অপেক্ষমান যখন তা সামনে এসে উপস্থিত হবে তখন আর কেউ পাথেয় সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে না।

কবি আবু নুয়াসও তাঁর কবিতায় পৃথিবীর ক্ষণস্থায়িত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন:

كُلُّ ناعٍ فَسَيُنعى ** كُلُّ باكٍ فَسَيُبكى
كُلُّ مَذخورٍ سَيَفنى ** كُلُّ مَذكورٍ سَيُنسى
لَيسَ غَيرَ اللَهِ يَبقى ** مَن عَلا فَاللَهُ أَعلى

“প্রত্যেক মৃত্যু সংবাদ ঘোষণাকারী শীঘ্রই মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করবে, প্রত্যেক বিলাপকারী শীঘ্রই বিলাপ করবে;

শীঘ্রই সব সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবে, সব রোমাঞ্চকর স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে যাবে;

আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, কেননা আল্লাহই তো মহামহিম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।”

পৃথিবী প্রতারক

আবুল আতাহিয়া দুনিয়াকে প্রতারণার স্থল হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি দুনিয়াবাসীকে মুসাফির হিসেবে সম্বোধন করে বলেন:

أَراكَ لِدُنياكَ مُستَوطِناً *** أَلَم تَدرِ أَنَّكَ فيها غَريبُ

أَغَرَّكَ مِنها نَهارٌ يُضيءُ *** وَلَيلٌ يَجُنُّ وَشَمسٌ تَغيبُ

فَلا تَحسَبِ الدارَ دارَ الغُرورِ *** تَصفو لصاحبها أَو تَطيبُ

আমি তোমায় দেখছি, তুমি দুনিয়াকে স্থায়ী বাসস্থান বানিয়েছ, তুমি কি জাননা? এখানে তুমি একজন মুসাফির মাত্র। দুনিয়ার দিনের আলো, রাতের আঁধার এবং অস্তমিত সূর্য তোমাকে প্রবঞ্চিত করেছে।সুতরাং প্রবঞ্চনার ঘরকে তুমি ঘর ভেবোনা। এতে তোমার সত্ত্বাধিকার যেমন নেই, তেমনি আনন্দিত হবারও কিছু নেই।

উক্ত কবিতায় কবি দুনিয়াবাসীকে মুসাফির হিসেবে গণ্য করেন। সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়া দিনের আলো ও রাতের আঁধার সবকিছুই মানুষকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।

অপরদিকে কবি আবু নুয়াস দুনিয়াকে প্রতারণারস্থল হিসেবে উল্লেখ করে বলেন:

وَلا يَغُرَّنكَ دُنيا ** نَعيمُها عَنكَ نازِح

وَبُغضُها لَكَ زَينٌ ** وَحُبُّها لَكَ فاضِح

দুনিয়ার সুখ-সম্পদ যেন তোমাকে প্রতারিত না করে, কারণ এটি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে।পৃথিবীর হিংসা-দ্বেষ তোমার সৌন্দর্যের ভূষণ, আর এর ভালবাসা শুধুই অপমান।

এ কবিতায় কবি আবু নুয়াস দুনিয়াকে প্রতারক ও ক্ষণস্থায়ী হিসেবে অভিহিত করে বলেন যে, এটি কোন পরিপূর্ণ সুখ-শান্তির জায়গা নয়। পাশাপাশি কবি পরকালীন স্থায়ী নিবাসের অনুপম সুখ-শান্তি লাভের নিমিত্তে ক্ষমার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন।

উভয় কবিই তাঁদের কবিতায় দুনিয়াদার ব্যক্তিদের নিন্দাবাদ করেছেন। তাঁরা মানুষকে দুনিয়ার ধ্বংসলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং মরণোত্তরকালে পরিপূর্ণ নাজাতের জন্য সৎকাজের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

পার্থিব ভোগবাদিতা

ক্ষণস্থায়ী এ জীবন ভোগ-বিলাসের জন্য নয়। এটি পারকালীন অনন্ত জীবনের পাথেয় সংগ্রহের জন্য। যদিও মানুষ দুনিয়ার মোহ ছাড়তে পারে না। পার্থিব ভোগবাদিতা সম্পর্কে কবি আবুল আতাহিয়া বলেন-

يا سكن الحجرات ما ** لك غير قبرك مسكن

اليوم أنت مكاثر ** ومفاخر تتزين

وغداً تصير إلى القبور *** محنط ومكفن

কবি আবু নুয়াস বলেন:

وكم من سبيل لأهل الصبا ** سلكت سبيل غواياتها

فأى دواعي الهوى عفتها ** ولم تجر في طرق لذاتها

وكم المحارم لم تنتهك ** وأي الفضائح لم تاتها

أما يتفكر أحياؤها ** فيعتبرون بأمواتها

উপরোক্ত কবিতায় কবি আবুল আতাহিয়া পার্থিব ভোগবাদিতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেন, সুরম্য অট্টালিকায় বসবাসকারীর জন্যও কবর ব্যতীত বসবাসের স্থান নেই। যারা আজ সম্পদ ও গৌরবের পসরা সাজিয়েছে তারাই আগামী দিন কাফনের কাপড় পরে কবরে নীত হবে।

কবি আবু নুয়াস বলেন-ভোগবাদীরা ভোগ-বিলাসিতার জন্য অনেক পথ অবলম্বন করে থাকে, চাই তা হোক হালাল কিংবা হারাম। তারা মূলত: ভ্রষ্ট পথেরই অবলম্বনকারী। সুতরাং আমাদের পূর্ববর্তীগণ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

তাকওয়া বা খোদাভীতি

মহান আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হল-তাকওয়া বা খোদাভীতি। আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল-তাকওয়া। কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস

তাঁদের কবিতায় তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। কবি আবুল আতাহিয়া বলেন:

ألا إن تقوى الله أكرم نسبة ** تسامى بها عند الفخار كريم

ويا رب هب لي منك عزما على التقى ** أقيم به ما عشت حيث أقيم

উক্ত কবিতায় কবি বলেন, আল্লাহর নিকট মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ও নেসবতের মাপকাঠি হল-তাকওয়া। এজন্য তিনি মহান আল্লাহর নিকট তাক্বওয়ার উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকার জন্য মিনতি করেছেন।

কবি আবু নুয়াস তাকওয়া সম্পর্কে বলেন[৩৩]:

فعلي الله توكل ** وبتقواه تمسك

من اتقي الله فذالك الذي ** سيق اليه المتجر الرابح

شمر فما في الدين اغلوطة ** ورح لما انت له رائح

উপরোক্ত কবিতায় কবি তাকওয়াকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। কবির মতে, আল্লাহর দ্বীনে কোন বক্রতা নেই, সুতরাং সিরাতুল মুস্তাকিম অর্থাৎ সরল পথ অবলম্বন করাই মানুষের কর্তব্য। কেননা মানুষ সে পথেরই যাত্রী।

তাকওয়ার আলোচনায় উভয় কবি মানুষকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে স্বার্থক ও সুন্দর করার নিমিত্তে মুত্তাকী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

কবর সম্পর্কীয় উপমা

যুহদিয়াত কবিতার অন্যতম বিষয়বস্তু 'কবর' সম্পর্কীয় কবিতায় কবি আবুল আতাহিয়া বলেন:

مالمقابر لاتجيب ** إذا دعا هن الكثيب

حفر مسقفة عليهن ** الجنادل والكثيب

فيهن ولدان وأطفال ** وشبان وشيب

كم من اناس رأيناهم ** تفانوا فلم يبق منهم عريب

وصاروا الي حفرة تحتوي ** ويسلم فيها الحبيب الحبيب

---

৩৩ দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৮।

উপরোক্ত কবিতায় কবি আবুল আতাহিয়া কবর সম্পর্কে বলেন যে, এটি এমন একটি ছাদবিশিষ্ট গর্ত যেখানে সবাইকে গমন করতে হবে। যেখানে শিশু, কিশোর, আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সকল শ্রেণির মানুষই রয়েছে। কিন্তু কেউই সাড়া দিচ্ছে না- এটি ভয়াবহতার লক্ষণ। কবি বলেন, জগতে বহু মানুষইতো ছিল, এখন তারা নেই। তারা সবাই একটি নির্বাক গর্তের দিকে চলে গেছে। যে গর্তে এক বন্ধু অপর বন্ধুকে সোপর্দ করে থাকে।

পক্ষান্তরে কবি আবু নুয়াস কবরকে সর্বোত্তম উপদেশদানকারী হিসেবে অভিহিত করে বলেন:

وعظتك اجداث صمت ** نعتك أزمنة خفت

وتكلمت عن أوجه ** تبلي وعن صور سبت

وارتك قبرك في القبور ** وأنت حي لم تمت

الا تأتي القبور صباح يوم ** فتسمع ما تخبرك القبور

فان سكوتها حرك تنادي * كان بطون غائبها ظهور

উক্ত কবিতায় কবি আবু নুয়াস বলেন, কবরসমূহ আমাদের প্রতিনিয়ত উপদেশ দিচ্ছে। কেননা মৃত ব্যক্তির কবর থেকেই জীবিত ব্যক্তিরা উপদেশ লাভ করতে পারে। কবি কবর থেকে উপদেশ হাসিলের জন্য মাঝে মাঝে কবরের নিকট গমন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

উপরোক্ত কবিতায় কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস কবরের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা মানুষকে কবর জগতের অদৃশ্য বিষয়াদি হৃদয়ঙ্গমপূর্বক তা থেকে উপদেশ হাসিলের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

জন্ম-মৃত্যুর বাস্তবতা সম্পর্কিত কবিতা

যুহদিয়াত সম্পর্কিত কবিতায় কবি আবুল আতাহিয়া ও কবি আবু নুয়াসের বাণীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও মূল বক্তব্য একই। যেমন, কবি আবুল আতাহিয়া জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে বলেন[৩৪]:

لدوا للموت وابنوا اللخراب ** فكلكم يصير إلى تراب

لمن تبني الي تراب ** نفر كما خلقنا من تراب

---

৩৪ আবুল আতাহিয়া, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

অপরদিকে এ সম্পর্কে কবি আবু নুয়াস বলেন[৩৫]:

لدوا للموت وابنوا للخراب ** فكلهم يصير الي ذهاب

لمن نبني ونحن الي تراب ** نعود كما خلقنا من تراب

উপরোক্ত পংক্তিসমূহে কবি আবুল আতাহিয়া ও কবি আবু নুয়াস জন্ম-মৃত্যুর রূঢ় বাস্তবতা সম্পর্কে সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ ও কাব্যিক ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁরা বলেন, তোমরা মৃত্যুর জন্য জন্ম দাও এবং ধ্বংসের জন্য নির্মাণ কর। তোমরা প্রত্যেকেই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছো। মানবজাতিকে মাটি দিয়েই তৈরি করা হয়েছে; আবার মাটির সাথে মিশে যাওয়ার জন্য তারা সামনের দিকে এগিয়ে চলছে অথবা তারা সে মাটির দিকে প্রত্যাবর্তন করছে।

জীবন-মৃত্যু রহস্য

জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে কবি আবুল আতাহিয়া ও কবি আবু নুয়াস নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। কবি আবুল আতাহিয়া বলেন:

أَما مِنَ الموتِ لِحَيٍّ نَجا ** كُلُّ امرِئٍ آتٍ عَلَيهِ الفَنا

تَبارَكَ اللَهُ وَسُبحانَهُ ** لِكُلِّ شَيءٍ مُدَّةٌ وَانقِضا

মৃত্যুর পরের জীবন সম্বন্ধে কবি বলেন:

نزاع لذكر الموت ساعة ذكره ** ونغتر بالدينا نلهو ونلعب

ونحن بنو الدنيا خلقنا لغيرها ** وما كنت فيها فهو شيئ محبب

উপরোক্ত কবিতাসমূহ উভয় কবি মৃত্যুর পরিণতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। মৃত্যু শ্বাশত ও অমোঘ। মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি নয়। বরং মৃত্যুর পর আরেক জীবন রয়েছে। মৃত্যু হচ্ছে জাগতিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং আখিরাত জগতের প্রবেশদ্বার। পরকালের জীবন অনন্তকালের। কবিদ্বয় তাঁদের কবিতায় মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

---

৩৫ আবু নুয়াস, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

কিয়ামত

কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পর আবার প্রতিটি মানুষকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। আবুল আতাহিয়া কিয়ামত সম্বন্ধে বলেন:

لم يخلق الخلق إلا للفناء معا ** نفنى وتفنى أحاديث وأسماء

يا بعد من مات ممن كان يلطفه ** قامت قيامته والناس أحياء

يقصي الخليل أخاه عند ميتته ** وكل من مات أقصته الأخلاء

উপরোক্ত কবিতায় কবি বলেন, পৃথিবী নশ্বর এবং সৃষ্টিকূলকে কেবল ধ্বংসের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পৃথিবীর দয়া-মায়া সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে তার কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেলেও লোকেরা জীবিত থাকা সত্ত্বেও তা উপলব্ধি করতে পারছে না। মৃত্যু যবনিকা আপন বন্ধুকেও দূরে ঠেলে দেয়।

কিয়ামত সম্বন্ধে আবু নুয়াস বলেন:

وهذي القيامة قد أشرفت ** تريك مخاوف فزعاتها

وقد أقبلت بمواعدها ** وأهوالها فارع لوعاتها

وإني لفي بعض أشراطها ** وأياتها وعلاماتها

উপরোক্ত কবিতায় কবি কিয়ামতের ভয়াবহতা ও বিপদ উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি নিজেকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে অভিহিত করেছেন।

তাওবা

কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হলে অনুতপ্ত হয়ে সে কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নামই তাওবা। তাওবা সংক্রান্ত কবিতায় কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস মানুষকে পুন:পুন: তাওবা করার উৎসাহ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আবুল আতাহিয়া পূর্বের কৃতকর্মের অনুশোচনা করে বলেন:

يانفس توبي قبل أن ** لا تستطيعى أن تتوبى

واستغفرى لذنوبك ** الرحمان غفار الذنوب

بكت عيني على ذنبي ** وما لاقيت من كربي

فياذلي وياخجلي ** إذا ما قال لي ربي

أما استحييت تعصيني ** ولا تخشى من العتب

وتخفي الذنب من خلقي ** وتأبى في الهوى قربي

فتب مما جنيت عسى ** تعود إلى رضا الـرب

উক্ত কবিতায় কবি তাওবা করতে অক্ষম হওয়ার পূর্বেই নিজেকে অতীত কৃতকর্মের জন্য তাওবার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি মহান আল্লাহকে পরম করুণাময় ও সকল গুনাহের ক্ষমাকারী হিসেবেও উল্লেখ করেন। কবি নিজের উপর নিপতিত দুঃখ-কষ্ট ও পাপের জন্য অশ্রু ঝরিয়েছেন। আল্লাহর অবাধ্য হতে লজ্জা ও ভয় না পাওয়ায় নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন। কবি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ফিরে পেতে অতীত পাপসমূহ স্বীকার করে তাওবার আহ্বান জানিয়েছেন। আবু নুয়াস অতীত অনুশোচনায় বলেন:

يا ليت شعري كيف أنت إذا** وضع الكتاب صبيحة الحشر

ما حجتي فيما أتيت وما ** وما قولي لربي، بل وما عذري

ألا أكون قصدت رشدي أو ** أقبلت ما استدبرت من أمري

يا سوأتا مما اكتسبت، ويا ** أسفي على ما فات من عمري!

উপরোক্ত কবিতায় আবু নুয়াস হাশরের ময়দানের ভয়াবহতার কথা স্বীকার করে নিজের হিসাবের পাল্লার পরিণতির চিন্তায় বিভোর। নিজের পূর্বের কর্মের দিকে লক্ষ্য করে কবি নিজেকে অক্ষম হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং অতীত জীবনের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন।

ধৈর্য

মানব জীবনে সুখ-দুঃখ কোনটাই স্থায়ী নয়। সুতরাং বিপদে ধৈর্য ধারণ করা মুমিনের শ্রেষ্ঠ গুণ। আলোচ্য কবিতায় কবি আবুল আতাহিয়া তাই বলেছেন:[৩৬]

نعم الفراش الأرض فاقنع به ** وكن عن الشر قصير الخطا

ما أكرم الصبر وما أحسن ** الصدق وازينه بالفتي

উপরোক্ত কবিতায় আবুল আতাহিয়া ধৈর্যকে মাধুর্য্যের সাথে তুলনা করেছেন। আর সত্যকে অতি মনোরম বলেছেন এবং সত্য ও ধৈর্য এ দু'টি জিনিসকে তারুণ্যের শ্রেষ্ঠ ভূষণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

---

৩৬ আব্দুল হক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

পক্ষান্তরে কবি নুয়াস কালের তিক্ত ঘটনাবলীর ব্যাপারে ধৈর্যধারণের আহ্বান জানিয়ে বলেন[৩৭]:

إصبر لمر حوادث الدهر ** فلتحمدن مغبة الصبر

وامهد لنفسك قبل ميتتها ** واذخر ليوم تفاضل الذخر

উপরোক্ত কবিতায় কবি কালের তিক্ত ঘটনাবলীর ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ধৈর্যকে তিনি প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য সর্বোত্তম পাথেয় সঞ্চয় করার কথা বলেছেন।

মুনাজাত

কবি আবুল আতাহিয়া ও কবি আবু নুয়াস উভয়েই নিজেদের অতীত কর্মকাণ্ড ও পাপাচারিতায় অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন। কবি আবুল আতাহিয়া তাঁর মুনাজাত কবিতায় বলেন:

الهي لا تعذبني فإني ** مقر بالذي قد كان مني

ومالي حيلة إلا رجائي ** وعفوك ان عفوت وحسن ظني

وكم من زلة لي في البرايا ** وأنت علي ذو فضل ومن

إذا فكرت في ندمي عليها ** عضضت أنا ملي وقرعت سني

يظن الناس بي خيرا وإني ** لشر الناس إن لم تعف عني

উপরোক্ত কবিতায় কবি নিজের অতীত কৃতকর্মের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর শাস্তি থেকে পানাহ চেয়েছেন এবং আল্লাহর ক্ষমার প্রত্যাশা করেছেন। অতীত স্খলের জন্য লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে রেহাই পেতে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার আকাঙ্খী হয়েছেন। নিজেকে মানবকুলের নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করে আল্লাহর ক্ষমা ও মার্জনা প্রত্যাশী হয়ে সানুনয় নিবেদন পেশ করেছেন।

---

৩৭ আবু নুওয়াস, দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

অপরদিকে কবি আবু নুয়াস আল্লাহর প্রতি অনুতপ্ত হয়ে প্রার্থনা করেছেন:

إلهى لست للفردوس اهلا ** ولا وأقوى علي النار الجحيم
فهب لي توبة واغفر ذنوبي ** فإنك غافر الذنب العظيم
وعاملني معاملة الكريم ** وثبتنى علي النهج القويم
ذنوبي مثل أعداد الرمال ** فهب لي توبة يا ذا الجلال
وعمري ناقص في كل يوم ** وذنبي كيف احتمالي
الهي عبدك العاصي اتاك * * مقرا بالذنوب وقد دعاك
فان تغفرلي وأنت لذاك أهل ** وإن تردد فمن نرجو سواك

উপরোক্ত কবিতায় কবি নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। মহান আল্লাহর দরবারে তাওবা করার সুযোগ প্রত্যাশী হয়েছেন। মর্মস্পর্শী বাক্যের মাধ্যমে হৃদয়ের গহীন থেকে স্বীয় প্রভূর কাছে আকুতি ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। অকুণ্ঠচিত্তে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে দয়া ও ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

এভাবেই আব্বাসীয় যুগের প্রসিদ্ধ কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াস মানব জীবনের অমোঘ পরিণতির কথা মানুষকে করিয়ে দিয়েছেন। তারা মানুষকে মহান আল্লাহ, পরকাল ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের যুহদিয়াত কবিতার প্রতিটি চরণে কুরআন ও হাদীসের ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছে এবং আধ্যাত্মিকতার নিগুঢ় তত্ত্ব ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায় কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের যুহদিয়াতের সকল কবিতায় মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান, পরকালের প্রস্তুতি নেয়া, সৎকাজ করা, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ, খোদাভীতি ও পরকালীন পুণ্য সঞ্চয়ের প্রতি আহ্বান ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছেন। তাঁদের এ সকল কাব্য আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের অনন্য নজির। জীবনকে যারা যুহদ ও ত্যাগের আদর্শে মহিয়ান করেছেন এ ধরনের কবিতা তাদের হৃদয় ও আত্মার খোরাক যোগায় ও ক্ষুধা মিটায়। পরবর্তীতে অন্যান্য কবিগণ তাঁদের সাহিত্য সংকলনে আবুল আতাহিয়া ও আবু নুওয়াসের পর তাদের অনুকরণে যুহদ অধ্যায় সংযোজন করেছেন। ইসলামী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি প্রকাশ করে পরবর্তী যুগের অনেক কবিই যুহদ কবিতা রচনা করেছেন। এ সংকলনগুলোর যুহদ অধ্যায় পাঠকালে ভোগবাদী জীবনের আবিলতামুক্ত এক পবিত্র জীবনধারার অনন্য চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠে।

উপসংহার

আব্বাসীয় যুগে আরবী কবিতায় নতুন নতুন বিষয় ও শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়। নতুন সভ্যতা ও জীবনযাত্রার বস্তুর বিবরণমূলক কাব্যের বিষয় পরিধিকে বিস্তৃত করে তোলে। চিরাচরিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি জীবন ও জগতের প্রায় সকল উপজীব্য তার অন্তর্ভূক্ত হয়। সাহিত্যের গতানুগতিক বিষয়াদি নতুন পরিবেশ ও জীবনযাত্রা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নবসাজে সজ্জিত হয়। আব্বাসীয় যুগের কবিতার নতুন বিষয়বস্তু সমূহের মধ্যে দর্শন ও যুক্তিনির্ভর কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে সৃষ্টিজগত, জীবন-মৃত্যু, ইহকাল ও পরকাল, পাপ-পুণ্য, দেহ ও আত্মা এবং ঈমান-'আক্বিদা প্রভৃতি সম্বন্ধে কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। যুহদ কবিতাও এযুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ সময়কার চর্চিত কবিদের কাব্যধারার বিপরীতে 'যুহদ'(ধর্মানুরাগ ও দুনিয়া ত্যাগ)-এ আমলের কবিতায় বেশ গুরুত্ব লাভ করে।

যুহদিয়াত কাব্য মূলত দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ একদল কবির দুনিয়ার জিন্দেগি নিয়ে পর্যবেক্ষণ। যারা তাদের পর্যবেক্ষণকে কাব্যের তুলিতে ভাষার অপূর্ব রূপ প্রদান করেন। তাদের এ পর্যবেক্ষণ ইসলামী জীবনধারার সাথে মিলে এটি কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। নসীহতমূলক এসব কাব্য তৎকালীন যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনার একটি নিদর্শন। তদুপরি তখন অশ্লীলতা ও ধর্মদ্রোহিতার যে প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তার বিরুদ্ধে এসব কবিতা একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। সমাজে যখন অশ্লীলতা, পাপাচার ও অনৈতিকতার সয়লাব চলছিল এবং হাম্মাদ 'আজরাদ (মৃ. ১৬১হি.), ওয়ালিবা ইব্নুল হুবাব (মৃ. ১৭০হি.), মুতি' ইবন ইয়াস (মৃ. ১৬৬হি.), ইয়াহইয়া ইবন যিয়াদ-এর মত ভোগবাদী কবিগণ মানুষকে কবিতার মাধ্যমে বিলাসিতায় মত্ত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল ঠিক তখনই কবি আবুল আতাহিয়ার আবির্ভাব ঘটে। যুহদ তথা ত্যাগবাদী জীবনের অস্তিত্ব ইসলামী ও জাহেলী যুগেও ছিল এবং কাব্য জগতেও তার প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান ছিল কিন্তু আবুল আতাহিয়া এতে নবদিগন্তের সূচনা করেছিলেন। সাহিত্যাংঙ্গনে ত্যাগবাদী এই জীবন দর্শনের প্রাণপুরুষ ছিলেন কবি আবুল আতাহিয়া। ভোগবাদী কবিরা সাহিত্যে যে জোয়ার এনেছিল। এর বিপরীতে তিনি ভোগের কুৎসিত রূপ তুলে ধরে তা বর্জনের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন বার বার।

অপরদিকে আবু নুয়াস আব্বাসী যুগের একজন সব্যসাচী কবি। বহুমাত্রিক কবি হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি রয়েছে। কবি আবু নুওয়াস একজন অশ্লীল কবি হিসেবে সুবিদিত। প্রাথমিক জীবনে কবি ভোগবাদী জীবনধারার কর্ণধার ছিলেন। তাঁর অশ্লীল কাব্য মানুষের কামনা ও প্রবৃত্তির প্রতি ইন্ধন যোগাতো। আবু নুয়াসের অত্রিমাত্রায় মদ্যাসক্তি ও শরীয়ত-নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি শৈথিল্য ছিল। কবিতায় লাগামহীন চরিত্রহীনতা, পাপাচারিতা, শরাবপানে বুঁদ হওয়া, বালক প্রেমের প্রবর্তন ইত্যাদি অশ্লীল ও উলঙ্গ সাহিত্যের আমদানি তাঁর হাতেই হয়েছিল। তবে জীবন সায়াহ্নে এসে কবি অতীত জীবনের ভুল বুঝতে পারেন। কবি হৃত জীবনের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কবির রচিত যুহদিয়াত কবিতা রচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শেষ বয়সে তাওবা করেছেন এবং প্রবল ধর্মানুরাগী হয়েছেন। তাঁর রচিত যুহদিয়্যাত কবিতায় অতীত জীবনের অনুশোচনা, আল্লাহর প্রতি অনুরাগ, দুনিয়ার প্রতারণা ও আখিরাত সম্বন্ধে এক নগন্য গুনাহগার বান্দার করুণ আকুতি মর্মস্পর্শী ভাষায় পরিব্যক্ত হয়েছে। আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-তার প্রতিটি চরণে কুরআন ও হাদীসের ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভটিতে কবি আবুল আতাহিয়া ও আবু নুয়াসের যুহদিয়াত কবিতা ও কবিতার বিষয়বস্তু পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া কবিদ্বয়ের জীবন ও কাব্যদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে এসব কবিতা পাঠকালে ভোগবাদী জীবনের কলুষতা ও আবিলতামুক্ত এক পবিত্র জীবন ধারার চিত্র পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। তাঁদের রচিত যুহদিয়াত কবিতার আবেদন যুগ থেকে যুগান্তর এবং কাল থেকে কালান্তর অটুট থাকবে। পরিশেষে বলা যায় যে, কবিদ্বয়ের যুহদিয়াত কবিতা থেকে মানব হৃদয় আত্মার খোরাক পাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী-বাংলা গ্রন্থাবলীঃ

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. আব্দুল্লাহ ইবন কুতাইবা, *আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৬খ্রি.)।

৩. আনওয়ার আর-রিফা'ঈ, *আল-ইসলাম ফী হাদারাতিহি ওয়া নুযুমিহি* (বৈরূত : দারুল ফিকরি মা'আসির, ৩য় সং, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.)।

৪. আবদুল মুনঈম আল-খাফাজী, *আল্ হায়াতু আল্-আদাবিয়্যা ফী আসরি সাদরিল আল-ইসলাম* (বৈরুত: ১৯৮৪ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ।

৫. আবদুল কাদির বিন ওমর আল-বাগদাদী, *খাজানাতুল আরাব* (মিসর: হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল কুত্তাব, ১৯৭৯ খ্রি.), খ. ১।

৬. আবূ যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবীল খাত্তাব আল-কুরাশী, *জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব* (বৈরুত: দারু সাদির, তা.বি.)।

৭. আবু নুয়াস আল-হাসান ইবন হানী, *দীওয়ানু আবী নুওয়াস*, আহমদ আবদুল মজিদ আল-গাযালী সম্পাদিত (বৈরুত: তা.বি.)।

৮. আবু নুয়াস, *দীওয়ান* (মিসর: আল-মাতবা'আতুল উমুমিয়্যাহ, ১৮৯৮খ্রি.), ১ম সং।

৯. আবু নুয়াস, *দীওয়ান*, আহমদ আবদুল মজিদ সম্পাদিত (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮২ খ্রি.)।

১০. আবু সা'ঈদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সং. ১৪১৮হি./১৯৯৭ খ্রি.)।

১১. আবু হাফ্ফান 'আবদুল্লাহ বিন আহমদ মাহযুমী, *আখবার আবি নুওয়াস* (মিসর: মাকতাবাতু মিসর, তা.বি.)।

১২. আবু তাম্মাম, *দীওয়ান আল-হামাসাহ* (মিসর: মাতবা'আহ আল-তাওফিক, ১৩২২হি.), খ. ১।

১৩. আবুল আতাহিয়া, *দীওয়ান*, গারীদ আশ-শায়খ সম্পাদনা (বৈরুত: মু'আসসাতু আল-আ'মালী, ১৯৯৯খ্রি.)।

১৪. আবুল আতাহিয়া, *দীওয়ান* (বৈরুত: দারু বৈরুত, ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.)।

১৫. আবুল আতাহিয়া, *দীওয়ানু আবুল আতাহিয়া*, সম্পাদনায়, মাজীদ তারাদ (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-'আরবী, ২০০৪খ্রি.)।

১৬. আবুল আব্বাস 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন মু'তায, *তাবাকাতুশ্ শু'আরা* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), ৪র্থ সংস্করণ।

১৭. আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয্ যামান* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাহ: ১৯৪৮খ্রি.), সং. ১, খ. ১।

১৮. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, *আল-আগানী* (কায়রো : ১৩৪৫হি.)।

১৯. আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, *আল-আগানী* (বৈরুত: মুওয়াসসাসাহ মামলাকাহ রিসালাহ, তা.বি.), খ. ১১।

২০. আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, *আল-আগানী*, অধ্যাপক সামীর জাবির সম্পা. (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬খ্রি.), ১ম সং, খ. ১০।

২১. আবুল কাসিম মুহাম্মদ কারক, *শাখসীয়্যাতু আদাবীয়্যাহ মিনাল মাশরিক ওয়াল মাগরিব* (বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৬ খৃ.)।

২২. আবুল 'আলা আল-মা'আররী, *আল-আলযামু মিন লুযূমি মা-লা-ইয়ালযাম* (মিসর: মাতবা'আতু আল-জামহুর, ১৩২৩হি.)।

২৩. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪/খ্রি.), খ. ১০।

২৪. ইবনে কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান্ নিহাইয়াহ* (দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ , বৈরুত প্রথম সংস্করণ ১৪০৫ হি.), খ. ১৩।

২৫. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০ খ্রি.), ১ম সং।

২৬. আবুল ফিদা, *কিতাবুল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার* (বৈরুত: তা.বি.), খ. ১।

২৭. আব্বাস ইউসুফ আল-হাদ্দাদ, *ইবনুল ফারিদ আল-আরাবী* (কুয়েত: ২০০০খ্রি.)।

২৮. আয-জাওযানী, *শারহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'য়ি* (বৈরুত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৯১খ্রি.)।

২৯. *আল-ইসলাম ওয়াল হাদারাত আল-'আরাবিয়্যাহ* (মিসর: মাত্বা'আতু দারিল কুতুবিল মিসরিইয়াহ, ১৩৫৮ হি./১৯৩৬ খৃ.), খ. ১।

৩০. আল-মাস'উদী, *মরুজুয্-যাহাব* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল-'আসাবিয়্যাহ, ১ম সং. ১৪২৫হি./২০০৫ খ্রি.), খ.৪।

৩১. আল-মাসউদী, *মুরুজুয্-যাহাব* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ৬।

৩২. আল-মাসউদী, *কিতাবুল তানবীহ ওয়াল আশরাফ* (বৈরূত: মাকতাবাতু খাইয়্যাত, ১৯৬৫ খৃ.), খ৩।

৩৩. আল্লামা সুলাইমান নদভী, *সাহাবা চরিত,* অনুবাদক, আখতার ফারুক, খ.১, (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৯৮৬)।

৩৪. আলী (রা.), *দিওয়ান-ই-আলী (রা.)* (ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০২ খ্রি.), খ. ১।

৩৫. আশরাফ আলী, *আল-আদাবুল 'আরাবী* (সৌদিআরব: ১৯৯০ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

৩৬. আহমদ আল-'ইস্কান্দারী ও মোস্তফা 'আনানী, *আল-ওয়াসীত ফিল আদাবিল 'আরবী ওয়া তারীখিহী* (বৈরুত: দারু ইহইয়াইল উলুম, ১৯৯৪খ্রি.), ১৮শ সং।

৩৭. আহমদ হাসান যাইয়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী* (বৈরুত: দার আল-সাক্বাফা, তা.বি.)।

৩৮. আহমদ হাসান যাইয়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী,* উর্দু অনুবাদ, আবদুর রহমান তারি সুরতী (লাহোর: ১৯৬১খ্রি.)।

৩৯. আহমদ হাসান যায়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৯৫খ্রি.)।

৪০. আনিস আল-মাকদিসী, *উমারা'উ আশশি'র আল-আরাবী ফিল আসরিল আব্বাসী* (বৈরুত: দারুল ইলম লিল-মালায়িন, ১৯৭৯খ্রি.), ১২তম সংস্করণ।

৪১. আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৫খ্রি.)।

৪২. ইউসুফ কান্দলভী, *হায়াতুস সাহাবা* (লাহোর: ইশারায়ে নাশরিয়্যাত-ই-ইসলামী, তা.বি.), খ. ৩।

৪৩. ইব্ন আবী হাতিম, *আল-জারহ্ ওয়াত্-তা'দিল,* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ.২।

৪৪. ইব্ন রাশিক, *আল-'উমদাহ* (তা.বি.), খ. ১।

৪৫. ইবনে খালদুন, *আল মুকাদ্দিমা* (বৈরুত: দারুল কলম, লেবানন ১৯৮১খ্রি.)।

৪৬. ইবনে সাদ, তাবাকাত (বৈরুত: ১৩৭৭/১৯৫৭), খ.৩।

৪৭. ইব্রাহীম খাঁ, *আরবজাতির ইতিকথা* (ঢাকা : বুক ভিলা, ১৯৭০ খ্রি.)।

৪৮. ইবন রশিক, *উমদা ফি মাহাসিন আশশির ওয়া আদাবিহি ওয়া নাকদিহি,* মহিউদ্দিন আবদুল হামিদ সম্পাদিত (বাইরুত: দারুর রশাদ আল-হাদিসাহ, ১৯৩৪ খ্রি.)।

৪৯. ইবন কুতাইবা, *কিতাবুশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা* (লাইডেন: ই.জে.ব্রিল. ১৯০২ খ্রি.)।

৫০. ইবন কুতায়বা, *আশশির ওয়াশ শুয়ারা* (বৈরুত: দারুছ ছাকাফা, ১৯৬৪ খ্রি.)।

৫১. ইবন খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমাহ্* (বৈরুত: দারুল কলম, ৪র্থ সং. ১৯৮১), খ.১।

৫২. ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান* (বৈরুত: দারুস সাকাফাহ, তা.বি.)।

৫৩. ইবন সাল্লাম, *ত্বাবাকাতুশ শু'আরা* (বৈরুত: ১৯৮০ খ্রি.), খ. ১।

৫৪. ইবন হাজার আসকালানী, *তাহযীবুত তাহযীব* (বৈরূত: দারুল-ফিকর, ১ম সং. ১৪১৬/১৯৯৫খ্রি.), খ.৯।

৫৫. ইবনু রশীক আল-কায়রাওয়ানী, *কিতাবুল উমদা* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯০৭ খ্রি.), খ. ১।

৫৬. ইবনু হিশাম, *আল-সিরাতুন নববিয়্যা* (কায়রো: ১৯৮৭খ্রি.), খ. ১।

৫৭. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফীল তারিখ* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮৭খ্রি.), খ. ২।

৫৮. ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত তারীখ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরাবি, ১৯৮৩/১৪০৩), খ.৫।

৫৯. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, *সহিহ মুসলিম* (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮খ্রি.), ১ম প্রকাশ।

৬০. ইমাম গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.), খ. ৩।

৬১. ইবনুল কাইয়্যিম, *ইলমূল মুয়াক্কিঈন* (মিসর: তা.বি.), খ.১।

৬২. ইয়াকুবী, *আত্-তারীখুল ইয়াকুবী* (বৈরুত: দারুস ছাদের, ১৯৬০খ্রি.), খ. ২।

৬৩. ইমাম রাগিব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত* (মিসর: ১৯৬১খ্রি.)।

৬৪. উমর ইবনুল ফারিদ, *দীওয়ান* (বৈরুত: আল-মাকতাবুল জামি'আ আল-মাতবা'আতুল আরাবিয়া, ১৮৯৯খ্রি.), ১৫শ সংস্করণ।

৬৫. উমর ফররুখ, *তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী* (বৈরুত: দারু আল-ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৯ খ্রি.), খ.২, ৩য় সংস্করণ।

৬৬. উমার রিযা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন* (বৈরূত: মু'আস্সাতুর-রিসালাহ, ১ম সং. ১৪১৪হি./১৯৯৩খ্রি.), খ.২।

৬৭. কামিল সালমান আল-জাবুরী, *মু'জামুশ শু'আরা* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪হি./২০০৩খ্রি.), খ.৪।

৬৮. কে.আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা: আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ খ্রি.)।

৬৯. কার্ল ব্রকেলম্যান, *তারীখ আল-আদব আল-আরবী*, আবদুল হালীম আল-নাজ্জার সম্পাদিত, (কায়রো, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ২।

৭০. জাবী জাযাহ আলি ফাহমী, *হুসনুস সাহাবা* (কায়রো: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৩১৪ হি.)।

৭১. জামাল বিন মুহাম্মাদ আস্‌সাইয়েদ, *ইবনুল কাইয়্যিম আল্‌-জাওযিয়াহ ওয়া জুহুদুহু ফী খিদমাতিস্‌ সুন্নাহ* (তা.বি.) , খণ্ড ১।

৭২. জাওহারী, *আস-সিহাহ*, তাহকিক: আহমদ আবদুল গফুর আত্তার (বৈরুত: দারুল মালাঈন, ১৯৭৯খ্রি.), ৪র্থ সংস্করণ, খ. ২।

৭৩. জালাল উদ্দিন আস্‌-সুয়ূতী, *তারিখুল খুলাফা* (দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতুত্‌ থানূভী, ১৯৯৬ খ্রি.)।

৭৪. জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ বলখী, *আইনুল ইলম* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.)।

৭৫. জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৫ খ্রি.), খ. ২।

৭৬. জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ* (কায়রো: দারুল হিলাল, তা.বি.), খ. ২।

৭৭. জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবি আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ* (বৈরুত: মাকতাবাতুল বাহুওয়াদ দিরাসাত ফী দার আল-ফিকর ১৪১৬হি./১৯৯৬খ্রি.), খ. ১।

৭৮. জুরজী যায়দান, তারিখু আত্‌-তামাদ্দুনিল ইসলামী (মু'আস্‌সাতু দারিল হিলাল, ১৯৬৮ খ্রি.)।

৭৯. জুরজী যায়দান, *তারীখ আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যা* (কায়রো: দারুল হিলাল, তা.বি.), খ. ১।

৮০. জি.এম. মেহেরুল্লাহ, *আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য* (ঢাকা: ২০১৪ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

৮১. ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪৩৯হি./২০০৮ খ্রি.)।

৮২. ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা ইতিহাস ও সংকলন* (চট্টগ্রাম: আহমদিয়া প্রকাশনী, ২০১৯), ২য় সংস্করণ।

৮৩. ড. আবদুল হালিম নদভী, *আরবী আসলী তারীখ* (দিল্লি: তা.বি.), খ. ১।

৮৪. ড. আবদুল জলীল, *আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

৮৫. ড. আলী মুহাম্মদ হাসান ও যাকী আলী সুওয়ায়লাম, *আল-আবদু ওয়া তারীখুহু ফিল-'আসরায়ন: আল-উমাভী ওয়াল-আব্বাসী* (কায়রো: জমহুরিয়্যাতু মিসর আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৯০খ্রি.)।

৮৬. ড. আহমদ আমীন, *ফাজরুল ইসলাম* (মিশর: মাকতাবাহ আল-নাহদাহ, ১৯৭৫ খ্রি.)।

৮৭. ড. আহমাদ আমীন, *দুহা আল-ইসলাম* (কায়রো: মাকতাবাতু নাহদ্বাহ্ আল-মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪ খ্রি.), খ. ১।

৮৮. ড. আহমদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, মুহাম্মদ আবূ তাহের মেসবাহ কর্তৃক অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১-৩।

৮৯. ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস* (চট্টগ্রাম: আল-আকিব পাবলিকেশন্স, ২০১৬খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

৯০. ড. ইনামুল হক, *মধ্যপ্রাচ্য: অতীত ও বর্তমান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি ১৯৯৪ খৃ.)।

৯১. ড. ইউসুফ খালিফ, *তারীখুশ শি'র ফিল 'আসরিল আব্বাসী* (কায়রো: দারুস সাকাফাহ, ১৯৮১খ্রি.)।

৯২. ড. ইয়াহইয়া আল-শামী, *শারহুল মু'আল্লাকাতিল 'আশার* (বৈরুত: দারুল ফিকর আল-'আরাবী, ১৯৯৪খ্রি.)।

৯৩. ড. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ, *ইমাম ইবন মাজাহ হাদিস চর্চায় তাঁর অবদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৯হি./২০০৮ খ্রি.)।

৯৪. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, *মুফাসসির পরিচিতি ও তাফসীর পর্যালোচনা* (রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিচার্স, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.)।

৯৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল আযীয আল-মু'য়াফী, *হারকাত আল্ তাজদীদ ফীল আল-শি'র আল-'আব্বাসী* (কায়রো: কুল্লিয়াহ দার আল্-'উলুম, তা.বি.)।

৯৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা* (ঢাকা: বি.আই.সি. ১৯৮৭খ্রি.), খ. ১।

৯৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল হামীদ আল-রিফায়ী, *দিরাসাতু ফী আল-'আসর আল-উমাভী* (কায়রো: ১৯৯৩ খ্রি.)।

৯৮. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (রাজশাহী: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রি.), ১ম সংস্করণ।

৯৯. ড. ওমর ইবনে হাসান, *আল ওয়াদ'উ ফিল হাদীস* (বৈরুত: মাকতাবাতু গায্যালী, ১৯৮১খ্রি.), খ.১।

Dhaka University Institutional Repository

১০০. ড. ওমর ফাররুখ, *তারীখু আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৬ খ্রি.), ২য় খণ্ড।

১০১. ড. শুকরী ফায়সাল, *আবুল 'আতাহিয়া: আশআরুহু ওয়া আখবারুহু* (দিমাশক: দারুল মা'আল্লাহ, তা.বি)।

১০২. ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৬শ সং. ২০০৯খ্রি.)।

১০৩. ড. শাওকী দ্বায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী: আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফিশ শি'রিল আরাবী* (কায়রো: দারুল মা'আরেফ, ১৯৬০ খ্রি.), স. ১০।

১০৪. ড. শাওকী দ্বায়ফ, *তারীখুল আদাব আল-আরাবী আল-আসরুল আব্বাসী আল-আওওয়াল* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৬খ্রি.), ১০ম সংস্করণ।

১০৫. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, *তারিখুল ইসলাম* (বৈরুত: দারুল জিল, ১৩শ সং ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), খ. ৪।

১০৬. ড. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন,* (বৈরুত : দারু ইহ্য়াইল 'উলুম ১৪০৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ.২।

১০৭. ড. ত্বহা হুসায়ন, *হাদীসুল আরবি'আ* (মিশর: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), খ. ২।

১০৮. *দীওয়ানু কাব ইবন যুহায়র*, ড. মুহাম্মদ য়ূসুফ নাজাম সম্পা., (বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯৫খ্রি.), ১ম সং।

১০৯. নুর মুহাম্মদ আজমী, *মেশকাত শরীফ* (ঢাকা: ইমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৮খ্রি.), ৫ম মুদ্রণ, খ.৯, পৃ. ২৪৫।

১১০. প্রফেসর মো: হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস* (আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, জানু. ১৯৮৬।

১১১. ফকীহ আবুল-লায়েস সমরকন্দী, অনুবাদ, মাওলানা আবদুস শহীদ আনছারী, *তাম্বীহুল গাফেলীন* (ঢাকা: ফয়জুল্লাহ প্রকাশনী, তা.বি.)।

১১২. ফার্দিনান্দ তোতাল, *আল-মুনজিদ ফিল আলাম* (বৈরুত: দারুল মাশরিক, ১৯৮৮খ্রি.), ১৬তম সং।

১১৩. বুতরুস আল-বুস্তানী, *'উদাবা'উল আরাব ফি জাহিলিয়্যাহ ওয়া সাদরিল ইসলাম* (বৈরুত: দারু নাযীর, 'আব্বূদ ১৯৮৯খ্রি.)।

১১৪. মূসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.), ১ম প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

১১৫. মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ আল-খাতীব আত-তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি.), সং.৩, খ. ৩।

১১৬. মুহাম্মদ 'আলী থানুভী, *কাশ্‌শাফু ইসতিলাহিল-ফুনূন* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮হি./১৯৯৮খ্রি.), ১ম সং, খ. ১।

১১৭. মফীজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৭ খ্রি.)।

১১৮. মাওলানা আকবর শাহ নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম* (দিল্লি: তাজ কোম্পানি, ১৯৯২খ্রি.), খ. ২।

১১৯. মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নো'মানী, *ইসলাম ক্যায়া হায়*, অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ মাহদী হাসান (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৬ খ্রি.)।

১২০. মাওলানা নিজাম উদ্দিন, *শারদী দীওয়ানে মুতানাব্বী* (দেওবন্দ: কুতুবখানা হুসায়নিয়া, তা.বি.)।

১২১. মাহমুদ সামী পাশা আল-বারূদী, *আল-মুখতারাত* (মিসর: আল-জারিদাহ প্রকাশনী, ১৩২৯হি.), খ.৪,

১২২. মুক্তাদা হাসান আযহারী, অনুবাদ, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (রাজশাহী: মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ২।

১২৩. মুফতী আমীমুল ইহসান, *আত তা'রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ* (করাচী: আস সাদাত পাবলিশার্স, তা.বি.)।

১২৪. মুফতী আমীমুল ইহসান, *আত তা'রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ* (ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮১হি./১৯৬১খ্রি.)।

১২৫. মুখতার আলী ইবন মুহাম্মদ আলী, *আত-তাওহীদাত* (দেওবন্দ: কুতুবখানা এমদাদিয়া, তা.বি.।

১২৬. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯ খ্রি.), ৪র্থ সং।

১২৭. মুহাম্মদ আব্দুল মুনঈম খাফাজী, *আল-হায়াতুল আদাবিয়্যা ফিল 'আসরিল আব্বাসী* (ইস্কানদারিয়্যা, দারুল ওফা, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১।

১২৮. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর আর-রাযী, *মুখতার আস-সিহাহ* (বৈরুত: ১৯৮৭খ্রি.)।

১২৯. মুহাম্মদ ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ*, কিতাবুয যুহদ।

১৩০. মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত্-তিরমিযি, *জামি'উত তিরমিযী* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজর, ১৪২৪হি./২০০৪খ্রি.), ১ম সং।

Dhaka University Institutional Repository

১৩১. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *সপ্ত ঝলন্ত গীতিকা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১৩ খ্রি.), ২য় সং।

১৩২. মো. আবুল কাশেম ভূঞা, সাহাবী (রা) কার্বচর্চা (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭খ্রি.)।

১৩৩. শাওকী দ্বায়ফ, *আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফিন্ নাছরিল আরাবী* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

১৩৪. শায়খ মুহাম্মাদ খুদরী বেগ, *মুহাদ্বারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ 'আদ্-দাওলাতুল 'আব্বাসিয়্যাহ্'* (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ্, তা.বি.)।

১৩৫. শিবলি নুমানী, *আল মামুন* (লাহোর : শেখ মোবারক আলি তাজের কুতুব, তা.বি)।

১৩৬. শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবন আবদ রাব্বিহ, *আল-'ইকদ আল-ফারীদ* (মিশর: ১৩৫৩হি./১৯৩৫ খ্রি.), খ. ৫।

১৩৭. শিহাব উদ্দিন আহমদ ইবন রাব্বিহ, *আল-ইকদুল ফারিদ* (মিসর: দারু মুস্তফা, তা.বি.), খ. ৩।

১৩৮. সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১খ্রি.), ২য় সং।

১৩৯. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

১৪০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-আদাব ওয়ান নুছূছ লিছ ছাফফিছ ছানী* (সৌদিআরব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮১খ্রি.)।

১৪১. সাইয়্যেদ হাসান আলী নদভী, *তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত* (লক্ষ্ণৌ: মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, ২০০০ইং) খ. ৫।

১৪২. হাফেয আবু বকর আহমদ বিন আলী আল-খতিব আল-বাগদাদী, *তারিখু বাগদাদ* (কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৩১ খ্রি.)।

১৪৩. হান্না আল-ফাখুরী, *আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯৫খ্রি.), খ. ১।

১৪৪. হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরি, তা.বি.)।

১৪৫. হাসান খামীস, *আল-আদাবু ওয়ান-নুসূখ* (সৌদি আরব : ১৪১০ হি./১৯৮৯খৃ.)।

১৪৬. য়ুসুফ খালীফ, *তারীখুশ শি'র ফিল 'আসরিল 'আব্বাসী* (কায়রো: দারুস সাকাফাহ, ১৯৮১ খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি গ্রন্থাবলী

১৪৭. C.F. Manzoor Ahmad Hanifi, *Short History of The Arabic Literature,* (Lahore : SH. Muhammad Ashraf, 1964).

১৪৮. Dr. M. Ahmed, *An Introduction to Islamic culture and Philosophy*, Part-II, (Dacca : Mullick Brothers, 1963).

১৪৯. Francesco Gabrieli, *The Arabs* (America : Green Wood Press, 1963).

১৫০. G.E. Von Grunebaum, *Classical Islam A History, Katherine watson*, trans. (London : George Allen and Uncien Ltd).

১৫১. Huda Al-Alam, *The Religions of the World* (London: Minorsky, 1973).

১৫২. Ignaze Goldzihers, *A short History of Arabic Literature* (Hyderabad : The Islamic Culture Board, 1958.

১৫৩. Masudul Hasan, *History of Islam* [Classical Period 571-1258 C.E] (Dehli: 1995), Vol.-1.

১৫৪. P.K. Hitti, *History of the Arabs* (London: 1951).

১৫৫. Philip F. Kennedy, *Abu Nuwas A Genius of Poetry* (England: Oneworld Publications, 2005).

১৫৬. Prof. Rafique Uddin Ahmad, *Islamic History and Culture* (Dacca: 1964).

১৫৭. R.L. Gulick, *Muhammad the Educater* (Institute of Islamic Culture, Lahore, 1961).

১৫৮. Reuber Levy, *The Social Structure of Islam* (Cambridge : Cambridge University Press, 1962).

১৫৯. S.M Imamuddin, *A Political History of Muslim*, Vol. II (Dacca : Nazmah & Sons, 1963).

১৬০. S.M. Immamuddin, *A political History of the Muslims* (Dhaka: Najmah sons, 1970), Part-1.

১৬১. Sayed Ameer Ali, *A Short History of the saracens* (London: Mecmillan Co. Ltd. 1899).

১৬২. Sayeed Abdul Hai, *Muslim Philosophy* (Dhaka : Islamic Foundation of Bangladesh, 1982).

১৬৩. Sayyid Fayyaz Mahmud, *A Short History of Islam* (Pakistan: Oxford University Press, 1960).

১৬৪. W. Monotgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology*.

১৬৫. William Muir, *The Caliphate* (London: Oxford University Press), 1891).

 Dhaka University Institutional Repository

অভিধান, বিশ্বকোষ ও অন্যান্যঃ

১৬৬. ইবরাহিম আনিস (সম্পাদনা), *আল-মু'জামুল ওয়াসিত* (দিল্লি: দারুল ইশায়াত আল-ইসলামিয়া, তা.বি.)।

১৬৭. ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব* (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৩খ্রি.), সংশোধিত সংস্করণ, খ. ৫।

১৬৮. ইবনে মানযুর আল-আফরিকী, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: মু'আস্‌সাতুত্‌-তারীখিল-'আরাবী, ১৪১৩হি./১৯৯৩খ্রি.), স.২।

১৬৯. ড. মুহাম্মদ রাওয়াশ ও ড. হামিদ সাদিক, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (পাকিস্তান: ইদারাতুল-কুর'আন, তা.বি.)।

১৭০. মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল্‌-আযহারী, *বাংলা একাডেমী আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.), খ.২, ২য় পুনমুদ্রণ।

১৭১. সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, ১ম প্রকাশ।

১৭২. ড. ফজলুর রহমান, *আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.)।

১৭৩. মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ফিরোজাবাদী, *আল কামুসুল মুহীত* (বৈরুত: দারুল এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), খ.১, ১ম সংস্করণ।

১৭৪. মাজদী অহবু, *মু'জামু মুসতালাহাতিল আদব* (ইংরেজি, ফারসী-আরবী) (বৈরুত: মাকতাবাতু লুবনান, তা.বি.)।

১৭৫. Theomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (New Delhi: Cosmo Publications, 1978).

১৭৬. *Bangla-English Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, 2007.).

১৭৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫খ্রি.), খ. ২, ২য় সংস্করণ।

১৭৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪০৭/১৯৮৭খ্রি.), খ. ৩।

১৭৯. *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫খ্রি.), খ. ১৬ (ভাগ-১)।

১৮০. *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮ খ্রি.), খ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা, জার্নাল ও সাময়িকীঃ

১৮১. *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা ১৩৩৪বাং, ফাল্গুন ১মবর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

১৮২. *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খ-৫, সংখা-৭, জুলাই ২০১১-জুন-২০১২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই-২০১৩ খ্রি.।

১৮৩. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০০৫খ্রি.

১৮৪. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৫০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, যিলকদ-মুহাররম, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১০খ্রি.

১৮৫. দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ, বর্ষ-১, সংখ্যা ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭।

ওয়েব সাইট

১৮৬. *Encyclopaedia of Islam*, 2nd Editon, Leiden.

১৮৭. *Encyclopedia Britannica*, Vol-4, (London :William Benton Publisher, First Published, 1968).

১৮৮. *Encyclopedia of Social Science*, Vol-13 (New York: The Macmillan Company, 1963).

১৮৯. *The Encyclopedia of Islam,* Vol. 1 (London: Seerah Foundation, 1981).

১৯০. *The Encyclopedia of Islam*, Vol. V. (Leiden, E.J. Brill, 1986).

১৯১. *www.wikipedia.org*

১৯২. *www.islamweb.net.*

১৯৩. *www.qafilah.com*/ar/رثاء-الطير-والحيوان/.

Dhaka University Institutional Repository

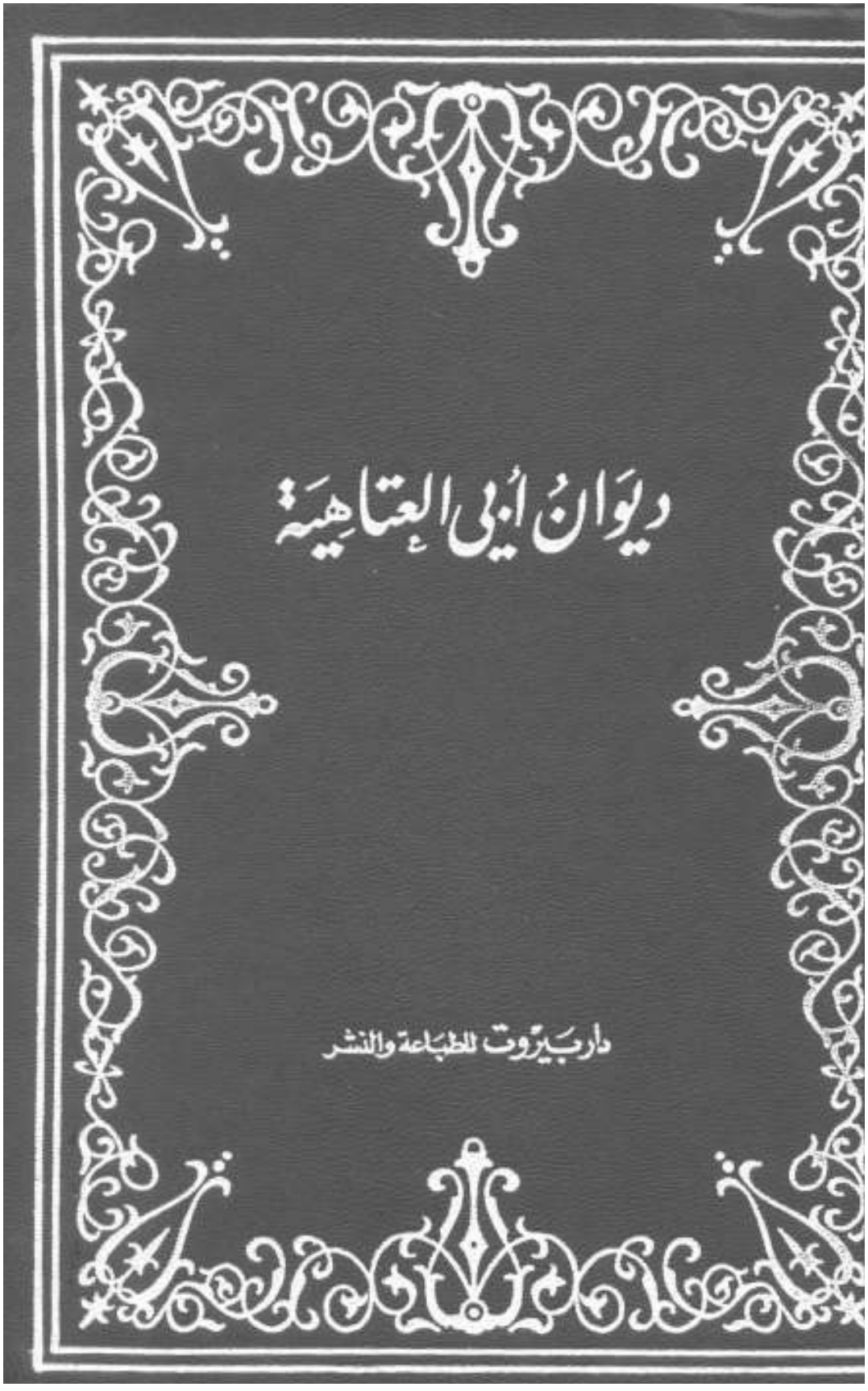

কবি আবুল আতাহিয়ার দীওয়ানের প্রচ্ছদ

Dhaka University Institutional Repository

الهمزة

الخير والشر عادات وأهواء

الخَيرُ والشّرُّ عاداتٌ وأهوَاءُ ، وقد يكونُ منَ الأحبابِ أعْداءُ
للحُكمِ شاهدُ صِدقٍ مَن تَعمدَهُ وللحَليمِ عَنِ العَوْراتِ إغضاءُ
كلٌّ لهُ سَعيُهُ ، والسّعيُ مختلِفٌ، وكل نَفسٍ لها في سَعيِها شاءُ[1]
لكُلّ داءٍ دواءٌ عندَ عالمِهِ ، مَن لم يكُنْ عالماً لم يدرِ ما الدّاءُ
الحمدُ للهِ يَقضي ما يَشاءُ ، ولا يُقضَى عليهِ ،وما للخلقِ ما شاءُوا
لم يُخْلَقِ الخَلْقُ إلاّ للفَنَاءِ معاً؛ تَفْنَى وتَبقَى أحاديثٌ وأسماءُ
يا بُعدَ مَن ماتَ ممّن كان يُلطِفُهُ قامَتْ قِيامَتُهُ ، والنّاسُ أحياءُ[2]
يُقْصِي الخَليلُ أخاهُ عِندَ ميتَتِهِ وكلُّ مَنْ ماتَ أقْصَتْهُ الأخِلاّءُ
لم تَبكِ نَفْسُكَ أيّامَ الحَياةِ لِما تخشَى ، وأنتَ على الأمواتِ بكّاءُ
أستَغفِرُ اللهَ من ذَنبي ومن سَرَفي إنّي، وإنْ كنتُ مَستوراً، لخَطّاءُ

---

١ الشاء : جمع شيئة على غير قياس أي إرادة وميل .
٢ يلطفه : يبره ويكرمه .

কবি আবুল আতাহিয়ার দীওয়ানের ভেতরের পৃষ্ঠা

 Dhaka University Institutional Repository

لم تقتَحمْ بي دواعي النّفسِ مَعصيةً   إلاّ وبَيْني وبَينَ النّورِ ظَلْماءُ
كم رائعٍ في رِياضِ العيشِ تَتبَعُه   منهنّ داهيةٌ ، تَرْتَجُّ ، دَهياءُ
وللحَوادِثِ ساعاتٌ مُصَرَّفَةٌ ،   فيهنّ للحَينِ إدْناءٌ وإقْصاءُ[1]
كلٌّ يُنَقَّلُ في ضِيقٍ ، وفي سَعَةٍ   وللزّمانِ بهِ شَدٌّ وإرْخاءُ

لا تعشق الدنيا

لعَمْرُكَ ، ما الدّنيا بدارِ بَقَاءِ ؛   كَفَاكَ بدارِ المَوْتِ دارَ فَنَاءِ
فلا تَعشَقِ الدّنْيا ، أخيَّ ، فإنّما   يُرَى عاشِقُ الدّنْيا بجُهْدِ بَلاءِ
حَلاوَتُها مَمزُوجَةٌ بمَرارَةٍ ؛   وراحتُها مَمْزُوجَةٌ بعَنَاءِ
فَلا تَمشِ يَوْماً في ثِيابِ مَخيلَةٍ   فإنّكَ من طينٍ ،خُلقتَ ، وماءِ[2]
لَقَلّ امرُؤٌ تَلقاهُ للهِ شاكِراً ؛   وقَلّ امرُؤٌ يَرْضَى لَهُ بقَضَاءِ
وللهِ نَعْمَاءٌ عَلَينا عَظيمَةٌ ،   وللهِ إحسانٌ وفَضْلُ عَطاءِ
وما الدّهرُ يوْماً واحداً في اختلافهِ ؛   وما كُلّ أيّامِ الفتى بسَوَاءِ
وما هوَ إلاّ يَوْمُ بُؤسٍ وشدّةٍ ،   ويَوْمُ سُرُورٍ ، مَرّةً ، ورَخاءِ[3]

---

١ الحين : الهلاك .
٢ المخيلة : الكبرياء .
٣ الرخاء : سعة العيش .

مكتبة الدكتور
ابراهيم راشد
الرقم /

ديوان

أبي نواس

الحسن بن هانئ

«ولد سنة ١٣٦ هـ ، وقيل ١٤٠ هـ «وتوفي سنة ١٩٥ هـ ، وقيل ١٩٦ هـ ، وقيل ١٩٧ هـ»

حققه . وضبطه . وشرحه

أحمد عبد المجيد الغزالي

الناشر دار الكتاب العربي
بيروت - لبنان

কবি আবু নুয়াসের দীওয়ান

Dhaka University Institutional Repository

المـــوت..

للمـــوتُ منّا قريبٌ   وليسَ عنّا بنـــازِحْ(١)
في كلّ يومٍ نعيٌّ   تصيحُ منـه الصـوائحْ
تُشجَى القلوبُ، وتبكِي   مـولولاتُ النوائحْ(٢)
حـتّى متى أنت تلهُو   في غفـلةٍ، وتُمازِحْ؟!
والمـوتُ في كلّ يومٍ   في زندِ عيشكَ قادِحْ(٣)
فاعمـلْ ليومٍ عَبُوسٍ   من شدّةِ الهولِ كالحْ(٤)
ولا يغرّنْكَ دنيـــا   نعيمُها عنـك نازِحْ
وبغضُهـا لك زينٌ   وحبُّها لك فاضـحْ!

غرور الأمل

سهوتُ، وغرّني أمَـلِي   وقد قصّرْتُ في عَمَـلِي(٥)
ومنزلةٍ خُلقتُ لهـــا   جعلتُ لغـيرِها شُـغُلِي
يظلُّ الدّهـــرُ يطلُبُنِي   وينحـونِي على عجَـلِ(٦)
فأيّامِي تقـــرّبُنِي   وتدْنيني إلى أجـــلِي

---

(١) النازح : البعيد .
(٢) النوائح : النائحات الباكيات
(٣) الزند : الحديدة التى تستنبط النار منها .
(٤) كالح : عابس .
(٥) سهوت : غفلت .
(٦) ينحونى : يقصدنى .

٦١٤

কবি আবু নুয়াসের দীওয়ানের ভেতরের পৃষ্ঠা